আর একদিন

গোপাল হালদার

॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা বারো ॥

প্রথম মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৫৮

সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্স্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

কবিকিশোর

সুকান্ত ভট্টাচার্যের

উদ্দেশ্যে

লেখক

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১

লেখকের কথা

প্রথম সংস্করণ

'একদা' ও 'অন্যদিনের' মত এ গ্রন্থও লেখা আরম্ভ হইয়াছিল আলীপুরের প্রেসিডেন্‌সি জেলে। তখন ১৯৪৯-এর মে মাস। কিন্তু লেখা শেষ হইয়াছিল ১৯৪৯-এর আগস্ট মাসে, পাটনায়।

যাঁহারা 'একদা' ও 'অন্যদিন' পড়িয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন— 'আর একদিন' সে কাহিনীরই শেষ স্তবক; এবং অন্য গ্রন্থ দুইখানির মতই ইহাও স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

একটি বিশেষ দিনকে অবলম্বন করিয়া এই কাহিনীও উদ্‌ঘাটিত। সেই দিনটি কাল্পনিক না হইলেও যাঁহারা সেই দিনের সাক্ষী তাঁহারা জানেন, এই গ্রন্থের চরিত্র ও ঘটনা সবই অনুরূপ; তাঁহাদের কাহারও সহিত, সেদিনের কিছুর সহিত, ইহার সম্পর্ক নাই। এই অর্থে ছাড়া, মানুষ ও ঘটনা সবই সত্য—যতটা সত্য তাহা গল্পে-উপন্যাসে।

মুদ্রণের ভুল-ত্রুটির জন্য লেখকও দায়ী, শুধু মুদ্রালয় নয়। পাঠক তাহা মার্জনা করিবেন। ইতি।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫১।

লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ

ইচ্ছা ছিল 'আর একদিনের' দ্বিতীয় সংস্করণে আমূল পরিবর্তন করি। কিন্তু মনে হইল—সংস্করণে সংস্করণে আমূল পরিবর্তন করা অপেক্ষা নূতন করিয়া বরং আবার একখানা বই লেখাই যুক্তিসঙ্গত। তাহাতে পাঠকের প্রতি সুবিচার করা হয়, নিজের প্রতিও সুবিচার করার চেষ্টা হইতে পারে। অতএব আমূল পরিবর্তন করিলাম না, যথেষ্ট পরিশোধন করিলাম। ইতি।

২৯শে নবেম্বর, ১৯৫৫।

লেখক

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কথা-সাহিত্য ঃ

একদা। অন্যদিন। আর একদিন।
পঞ্চাশের পথ। উনপঞ্চাশী। তের শ' পঞ্চাশ
ভূমিকা। নবগঙ্গা। জোয়ারের বেলা।
ভাঙন। স্রোতের দীপ। উজান গঙ্গা।
ধূলিকণা (কথা-সংগ্রহ)

প্রবন্ধ-সাহিত্য ঃ

আড্ডা। সংস্কৃতির রূপান্তর। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা।
বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি। স্বপ্ন ও সত্য।
বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ। এ যুগের যুদ্ধ।

এক

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়া সবুট পদধ্বনি আগাইয়া আসিল।

অমিতবাবু—অমিতবাবু—

ঘুমের ঘন পর্দাটা ধরিয়া কে যেন টানাটানি করিতেছিল, এবার বুঝি নখাঘাতে তাহা ছিঁড়িয়া গেল। শয্যায় উঠিয়া বসিতে বসিতে অমিত বলিল,—কে?

খোলা দুয়ার হইতে টর্চের আলো আসিয়া শয্যায় পড়িতেছিল।

থানা থেকে আসছি আমরা।

বিস্মৃত একটা বাস্তব। অপ্রত্যাশিত এই আবির্ভাব। মন তখনো তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তথাপি অভ্যাসমত শিয়রের নিকটস্থ সুইচটা টিপিয়া দিতে দিতে অমিত আবার বলিল,—কে?

পরমুহূর্তেই আলোকিত গৃহের দ্বারে তাহার অস্পষ্ট ধারণা ও সেই অর্ধগৃহীত তথ্য এক রূঢ় জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিল: রাইফেলধারী একজোড়া গুর্খা পুলিস; দুইজন পুলিস কর্মচারী—একজন খাকি-পরা থানার দারোগা, অন্যজন মুফ্‌তিতে; শার্টের উপরে কোট পরা যুবক, গোয়েন্দা সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর।

উন্মোচিত আবার রাইফেলের রাজত্ব? ঝুটা হইয়া যাইতেছে কি সাত-চল্লিশের স্বপ্ন? অমিতের মন আপনাকেই আপনি জিজ্ঞাসা করে।

নমস্কার, স্যর। —ঘরের মধ্যে পদার্পণ করিতে করিতে বহু-পরিচিত শিষ্টাচারের সঙ্গে বলিল গোয়েন্দা বিভাগের যুবকটি।—সার্চ করতে হবে একবার—

সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা আসিয়া দাঁড়াইল যুবকের পার্শ্বে ও পিছনে।—আমাদের সার্চ করে নিন। এই পিস্তলটা আছে; আর জামা, পকেট দেখবেন নিশ্চয়ই—

প্রয়োজন নেই।

প্রিয়দর্শন যুবক। স্বাস্থ্য আছে, রূপ আছে, বুদ্ধিও সম্ভবত আছে। গোয়েন্দা পুলিসের কাজ করে। হয়তো আজ কুণ্ঠামুক্ত—স্বাধীন দেশের 'দুষ্কৃতি-বিমর্শ বিভাগের' কর্মচারী। যুবক বলিল,—আসতে পারি তো?—আপনি তো একা, ব্যাচেলর—

জানা কথাটাই সে সুনিশ্চিত করিয়া লইবে—নিজের সংশয় আছে বলিয়া নয়. নিজের বুদ্ধি ও কালচার আছে তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য। অমিত বুঝিল, তাই হাসিল, বলিল,—হ্যাঁ, আমি একাই।

আর জিজ্ঞাসা করিল নিজেকে: তুমি একা, অমিত? একা তুমি? ... ইন্দ্রাণী, সবিতা—অথবা অনু, মনু...তাহারা কেহ তোমার নয়? কোনো জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে জীবনের নব-রস আস্বাদন করিয়া লও নাই তুমি, কিন্তু তাই বলিয়া একা কি তুমি? যে-তুমি আগামী দিনের মানবসন্ততির সঙ্গে তোমার সত্তার সান্নিধ্য তোমার কর্ম ও চেতনার মধ্য দিয়া অনুভব করো আজও,—উপলব্ধি করো তোমার দেহের রক্তধারায়, তোমার বাহুর পেশীতে ভবিষ্যৎ মানুষের সে আলিঙ্গন-আভাস—সেই তুমি একা?

আপনার বোন্ অনু—মানে, মিসেস রায় ও মিস্টার রায়, অর্থাৎ ইয়ে শ্রীঅনুজা রায় ও শ্রীশ্যামল রায়—তাড়াতাড়ি নাম দুটিতে স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিভাষা-সম্মত মর্যাদা 'শ্রী' যোগ করিয়া একটু আত্মপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইল স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক। তারপর বলিল,—তাঁরা কোন ঘরে থাকেন?

মুহূর্তমধ্যে অমিত সতর্ক হইয়া উঠিল। কাহাকে চাহে ইহারা? অনুকে ও শ্যামলকে? 'সার্চ'ও নয় শুধু তবে।

কোথায় তাঁরা?

অমিত বলিল, তাঁরা কেউ এখানে নেই।

চকিত, সন্দিগ্ধ, শাণিত হইয়া উঠিল অমনি যুবকের আত্মতৃপ্ত দৃষ্টি—নেই কেমন? নিশ্চয়ই আছেন—আমরা জানি।

অমিতের সন্দেহ রহিল না।—এ স্পেক্টর ইজ্ হন্টিং দিল্লী! সে হাসিল।

একটু ভুল জানেন। আগে থাকতেন—এখন নেই।

কোনটা তাঁদের ঘর?

পাশের ঘরে ছিলেন।

ঘরটা দেখতে হচ্ছে। আসুন,—বলিয়া অমিতকে যুবক ডাকিল।

একজন রাইফেলধারী অমিতের ঘরে পাহারা রহিল। অন্যেরা তাড়াতাড়ি পার্শ্বের ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল। দুয়ার বন্ধ। বাহির হইতে তালা দেওয়া।

অমিত ডাকিল,—সাধু?

ফ্ল্যাটের প্যাসেজের ছায়া হইতে উত্তর হইল,—বাবু।

চাবিটা দে।

ঘুমের চোখে প্রথম ফ্ল্যাটের দুয়ার খুলিয়া দিয়া সাধুচরণ এতক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার ভীতপদে সে অগ্রসর হইয়া আসিল; কম্পিত হস্তে তালা খুলিয়া দিল। ঘর অন্ধকার। তথাপি বুঝা যায় ঘরে কেহ নাই। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের যুবক কিন্তু গৃহদ্বারে ইতস্তত করিতে লাগিল; ঝুঁকিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল ঘরের মধ্যে। তখনি কাহার হাতের টর্চও জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলো ঘরের খানিকটা অংশকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল, অস্বাভাবিক করিয়া তুলিল ঘরটাকে।

চেয়ার, টেবিল, তাক-ভরা বই, আর তোরঙ্গ, স্যুটকেশ, ছোট তক্তাপোষ, বিছানাপত্র—ঘরে মানুষের ব্যবহার্য সবই আছে। মানুষ এই ঘরে থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ এ মুহূর্তে নাই, তাহাও নিঃসন্দেহ।

অমিত উত্তেজনাহীন হস্তে আলোর সুইচ টিপিয়া দিল।

একটু বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ হইল যুবক গোয়েন্দা কর্মচারী। পরক্ষণেই অমিতের দিকে তাকাইয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে গেল,—কেউ নেই, না?

দেখতে পাচ্ছেন।

কিন্তু এ ঘরেই থাকেন তাঁরা। আপনার বোন অনুজা দেবী আর তাঁর স্বামী শ্যামলবাবু। আমাদের সেরূপই খবর। আর দেখছিও—ওই রয়েছে মেয়েদের কাপড়চোপড়, পুরুষেরও জুতোজামা।

বলেছি, থাকতেন। জিনিসপত্র সব নিয়ে যাননি এখনো।

ততক্ষণে বাড়িটা দেখিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ভদ্রলোক। তাহার গতিতে একটা ব্যস্ততা; কিছুতেই চেষ্টা করিয়াও সে তাহা গোপন করিতে পারে না। অথচ গোপন করা তাহার প্রয়োজন। তাহা শোভনও বটে। কিন্তু গোপনতা সেজন্য প্রয়োজন নয়। বেশি ব্যস্ততা দেখাইলে, 'শিকার' যদি বা এখনো শিকারীদের আবির্ভাব না জানিয়া এই বাড়িতে কোথাও রাত্রিশেষের নিদ্রায় নিশ্চিন্ত থাকিয়া থাকে এখনি তাহাদের শব্দ পাইয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া পালাইবে ;—গোয়েন্দা ভাষায় 'চিড়িয়া' ভাগিয়া যাইবে। গোয়েন্দা কর্মচারীটি সঙ্গেকার সিপাহীকে ফ্ল্যাটের ওদিককার দুয়ার খুলিয়া ফেলিতে বলিল।

পিছনে বারান্দা আছে না? বারান্দা দিয়ে কোথাও যাওয়া যায় নাকি? —সন্দিগ্ধ ব্যস্ত কণ্ঠস্বর তাহার।

অমিত স্মিতহাস্যে বলিল—আপনারাই দেখুন না তা? কিন্তু আমাকে যদি দরকার না থাকে তাহলে আমি যাই। ঘুমোইগে।

না, না; আপনি সঙ্গে থাকুন। এখ্খুনি সার্চ শুরু করে দোব। বারান্দা আর ছাদ-টাদগুলো একবার দেখে আসছি তার আগে।—'এনটায়ার প্রেমিসেজ' সার্চের হুকুম রয়েছে কিনা।

ফ্ল্যাটের বাড়ি। বড় না হউক ছোট ছোট গুটি পনেরো ফ্ল্যাট বাড়িটার। বলা যায় কিছু—কোথাও পালাইয়া আছে কিনা অনু বা শ্যামল?

বারান্দা হইতে অমিত দেখিল রাত্রিশেষের পথেও চারিদিকে পাহারা। ফটকে জন দুই রাইফেলধারী গুর্খা আর জন দুই লাঠিধারী পুলিস ও জমাদার। পূর্ণিমা রাত্রির চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়া অস্ত যাইতেছে। ভোরের আলো এখনো আগাইতে পারে নাই।

এদিক-সেদিক দেখিয়া পুলিসের দল ফিরিয়া আসিয়া আবার অমিতের ফ্ল্যাটের দ্বারে দাঁড়াইল।

—অন্য ফ্ল্যাটের লোকদের আর তা হলে বিরক্ত না করলাম, কি বলেন

অমিতবাবু? আপনাদের ফ্ল্যাটের তো কেউ নেই—সেসব ফ্ল্যাটে?

খুঁজে দেখতে পারেন।

না, না; আপনার কথাই যথেষ্ট। তবে আমাদের উপর অর্ডার ওইরকমই কিনা, 'সমস্ত বাড়িটা সার্চ করো'। লোককে আমরা বিরক্ত করতে চাই না, অমিতবাবু। বিশ্বাস করবেন এ কথাটা, আপনি পুরনো লোক। তখনো করতাম না, এখনো না। আর এখন তো সেদিনই নেই,—আর-এক দিন—আমাদের নিজেদেরই গবর্নমেণ্ট।

তল্লাশীর সাক্ষীদের ফ্ল্যাটের দুয়ার হইতে লইয়া থানার দারোগা ঘরে প্রবেশ করিল।

'আর-এক দিন' সন্দেহ নাই;—অমিতের ওষ্ঠাধর হাসিতে কুঞ্চিত হইল। অনেকটা নিজের মনেই বলিল,—আপনাদেরই গবর্নমেণ্ট বটে!

কেন? আপনার নয় নাকি?—সচকিত কণ্ঠস্বর যুবকটির। তারপর—আপনারাই তো সংগ্রাম করে এনেছেন স্বাধীনতা।—পরিহাসের একটু রেশ পুলিসী ওষ্ঠে ও চক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু মুখে অটুট গোয়েন্দা-গাম্ভীর্য।—আমাদের অবশ্য সৌভাগ্য,—স্বাধীন গবর্নমেণ্টকে সার্ভ করতে পারছি। দেখেছেন তো, এখন ভুজঙ্গ সেন জাতীয় পতাকা তুললেন আমাদেরই অপিসে পনেরোই আগস্ট,—

...জাতীয় পতাকা আর শ্রীভুজঙ্গ সেন আর পনেরোই আগস্ট—

কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শেষ হইতে পারিল না। অমিতের গম্ভীর কণ্ঠ তাহাকে থামাইয়া দিল।—সে বুঝেছি—এখন আর-এক দিন—আর-এক পালা—কিন্তু আপনারা এখানে কী চান আজ বলুন তো?

ভদ্রলোক একবার নীরব হইল। তারপর বলিল—কাজের মানুষের কাজের কথা এইবার,—সার্চ ওয়ারেণ্ট দেখবেন না? এই যে—সার্চ করতে হবে ফর্ আর্মস্, এক্স্‌প্লোসিভস্।

ফর্ আর্মস্, এক্স্‌প্লোসিভস্?

কাগজ হইতে মুখ তুলিল না অমিত, কিন্তু তাহার চক্ষু নিষ্পলক হইয়া

রহিল। বাঙলায় ছাপা ওয়ারেন্টের মধ্যে কার্বন কাগজের দাগে দাগে ইংরেজী অক্ষরগুলি সত্যই ক্রমে ভূতপ্রেতের মতো নাচিতে লাগিল। তারপর—

…অরুণ সুন্দর দীর্ঘ গৌরবর্ণ এক যুবকের মুখ :—এই গৃহে, ওই আসনেই অমিত সুবীরকে দেখিয়াছে কতদিন। মাদুরের উপর ওখানটিতে বসিয়াছিল—এই সেদিনও। দীর্ঘ দেহ, নব কিশলয়ের সুচিক্কণতা তাহার গৌর তনু-সুন্দর দেহে, দীর্ঘ ভ্রূ-যুগলের নিচে চঞ্চল চক্ষু, উন্নত নাসা, পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধর।

গান বাঁধিবার, গান গাহিবার নেশাতেই সুবীর অমিতদের সঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছিল। বিধবা মায়ের সন্তান হিসাবে সে অনেক কষ্টে পাশ করিয়াছে। তারপর দিনের বেলা কোন্ বাঙালী যুদ্ধ-কণ্ট্রাকটারের আপিসে কেরানিগিরি করিয়া রাত্রিতে আই. কম্ পড়িয়া তখন সে উঠিয়া গিয়াছিল বি. কমের কোঠায়। কিন্তু বাড়িতে আছে বিধবা মাতা, অনূঢ়া ভগ্নী ও যক্ষ্মা-সন্দিগ্ধ রুগ্ন অনুজ। আর তাই যুদ্ধের কঠোর দিনে তাহাদের সংসার-খরচ কুলায় না। মুনিবের সঙ্গে মাগ্গী ভাতার দাবি-দ্বন্দ্বে তাহার যে চেতনা ফুটিয়া উঠিতেছিল গান বাঁধিবার ও গান গাহিবার নেশায় সে তাহার সেই ক্ষোভকে চাপা দিত। আর গানের আনন্দে ভুলিয়া যাইত তাহার বিধবা মা, অনূঢ়া বোন আর পীড়িত ভ্রাতাকে। কিন্তু একেবারে ভুলিতেও পারিত না। তাই দশটি বন্ধুর সঙ্গে সুবীরও আসিয়া বসিত কখনো সেই কেরানি ইউনিয়নে, কখনো তাহাদের ক্লাবে। কখনো 'পাঠচক্রে' অমিতবাবুর কথা শুনিত, কখনো তাহাদেরই আসরে অমিতবাবুদের নাট্যাভিনয়, গীতোৎসব দেখিত। তাহাই দেখিতে দেখিতে ও শুনিতে শুনিতে নিজেও গান বাঁধিবার আগ্রহে এক-একবার সে চঞ্চল হইয়া পড়িত; এবং গান গাহিতে গাহিতে নতুন কালের গানের টানে মাতিয়া উঠিত—এমন গান সে গাহিবে যে গানে আর মানুষ ভুলিয়া যায় না তা[illegible] বিধবা মা[illegible]নূঢ়া বোনকে, অচিকিৎসিত ভাইকে। এমন গান তাহাকে র[illegible] করিতে হ[illegible] 'হরিপদ কেরানি' যাহাতে জানে সে

হরিপদ কেরানিই, সে 'আকবর বাদশাহ্' নয়।·· কে আকবর শাহ্? সে? স্থবীর বন্দ্যোপাধ্যায়? জীবনের অমৃতভাণ্ড তো জন্মের পূর্ব হইতেই তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে সমাজ আর রাষ্ট্রপতিরা। তাহার বিধবা মাতা তাই চল্লিশের তীরে না পৌঁছিতেই শীর্ণ-বিশীর্ণা,—শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিগতদীপ্তি, বিলুপ্ত সমস্ত জীবনাভা। তাহার চৌদ্দ বৎসরের অনূঢ়া ভগ্নী শিক্ষাবঞ্চিতা, —পাড়ার দশটি ক্ষুধার্ত দৃষ্টির আর সমাজের সর্বাঙ্গীণ গঞ্জনার তলায় সে তরুণী আপনার অন্তরে আপনি নিষ্পিষ্টা, আবার আপনার দেহমনে নব-যৌবনের পীড়নে-তাড়নায় একই কালে সংকুচিতা আর দুঃসাহসিনী, কুণ্ঠিতা আর চপলা প্রগল্‌ভা। বারো বৎসরের তাহার কনিষ্ঠ ভাইটি···অভাবের সংসারে তাহার কচি মুখখানি তার নবাঙ্কুরিত স্বপ্ন লইয়া দাদার-দেওয়া বইএর মধ্যে হইতে খুঁজিয়া ফিরে আপনার শয্যাশ্রয়ী আয়ুহীন দিনগুলির সান্ত্বনা।—এই কি আকবর বাদশাহ্? থাক্, আকবর বাদশাহ্! জীবনের নির্মম সত্য ভুলিয়া স্থবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবিতে পারে কি জীবনের অমৃতপাত্রে তাহার ও তাহার মুনিব ইণ্ডিয়ান্ প্রোডাক্‌শ্যানের কর্তা যুদ্ধ-কণ্ট্রাক্টার মিস্টার গাঙ্গুলীরই সমান অধিকার? হরিপদ কেরানি আর আকবর বাদশাহ্ কোনো খানে কোনো কারণে এক? আর্ট কি এক রঙীন মিথ্যার মায়ালোক? যে-মিথ্যা এমন করিয়া মানুষকে প্রতারণা করে—ছলনা করে স্থবীর কেরানিকে আর হরিপদ কেরানিকে,—শুধু মানুষকে আপনার কথা ভুলাইয়া রাখে—তাহা যদি গান হয়, কবিতা হয়, নাটক হয়, চিত্রকলা হয়, বিশ্বসৌন্দর্যের যে-কোনো বাহন হয়, তাহা হইলে,— —হাঁ, সত্য কথাই বলেন অমিতবাবু,—'সে গান, সে কবিতা, সে নাটক, সে চিত্রকলা, সে শিল্পবস্তুতে আর মজুর বস্তির মদের দোকানে বা তাড়ির দোকানে কী তফাত'?

না, না, আমাদের শিল্পকলা আপনাকে ভুলবা[illegible] নয়—দুঃখদৈন্যকে ভুলবার জন্যও নয়। না, আর্ট [illegible] আফিম [illegible]তাড়ি নয়। [illegible] বরং সত্যকে মনে করিয়ে দেবে,—মনে ক[illegible] দেবে [illegible]নের সত্যকে—দুঃখকে

দৈন্যকে,—আর মনে করিয়ে দেবে জীবনের অপ্রতুল সম্ভাবনাকেও,—মনে করিয়ে দেবে আপনাকে আপনার কাছে,—মনে করিয়ে দেবে মানুষকে মানুষ বলে—আর জাগিয়ে দেবে মানুষের এই মহান্ আত্মোপলব্ধি—"man makes himself"—

অমিতের সঙ্গে সেই পরিচয়ের দিনটি সুবীরের ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল, মুছিয়াও যাইত একদিন অমিতের এই সব কথা তাহার মন হইতে—দুজনার অনেক-অনেক দিনের স্বচ্ছন্দ পরিচয়ের মধ্য দিয়া। অমিতেরও মনে থাকিত না বেলেঘাটার কোন-একটি আসরে একদিন এই সুন্দর সুচিক্কণ-দেহ তরুণ আপনার প্রত্যয়ভরা যৌবন-দৃষ্টি লইয়া অমিতকে বলিয়াছিল,—'সত্য কথাই বলেছেন, আর্ট আফিম নয়। কিন্তু একথাই আমাদের ভুলিয়ে রাখেন আর্টবাদীরা।' অমিতও ভুলিয়া যাইত বেলেঘাটার সেই স্বল্পালোকিত ঘর, সেই জন ত্রিশ কেরানি ও মধ্যবিত্ত সাহিত্যাকাঙ্ক্ষী যুবকের আসর, আর সেই দীপ্তশ্রী যুবকের এই প্রথম কথা কয়টি। কিন্তু অমিতকে তাহা ভুলিতে দিল না—সেই রক্তমাখা তরুণ দেহ— বারুদের গন্ধ, বন্দুকের শব্দ, আততায়ীদের অট্টহাস্য!

কিছু দাবি আদায় করিয়া সুবীরেরা সেদিন জয়ী হইয়াছিল। তাই জলসার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু অমিত ঠিক সময়ে গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। যখন পৌঁছিল তখন সুবীরের রক্তপ্লুত প্রাণহীন দেহ ধূলায় লুটাইতেছে।

শেষবার সুবীর অমিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ওইখানটিতে বসিয়াছিল। সুবীর আর আসিয়া ওইখানটিতে বসিবে না। অসুরা খোঁজ করিয়াছে তাহার মায়ের, তাহার বোনের, ভাইয়ের। কিন্তু কি তাহার মূল্য? —তাহারই মেজের মাদুরে যেখানে কত দিন সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বসিয়াছে —ঠিক সেইখানটিতে আজ পুলিস পার্টি দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখাইতেছে তাহার পরোয়ানা। 'আর্মস্ এণ্ড এক্স্প্লোসিভস্'এর এই ধুয়া তোলা কি সেই উদ্দেশ্যেই?

হুকুমের কাগজটা ফিরাইয়া দিয়া অমিত বলিল,—এই বুঝি বেলেঘাটার হত্যার সাফাই, না?—কণ্ঠস্বর শান্ত, হাসিতে অন্তরের ঘৃণা যথাসম্ভব সঙ্গোপিত।—অমিত বলিল, দেখুন তা হলে স্টেনগান ব্রেনগান, কি পান এ ঘরে।—

না, না,—গোয়েন্দা যুবক হাসিল।—আপনার কাছে ওসবের খোঁজে আমরা আসিনি। তবে ঘরগুলো দেখতে হবে একবার।

কী দেখবেন, দেখুন।

বইভরা শেলফ, আলমিরা, টেবিলের উপরকার বোঝাইকরা বই, সাময়িক পত্র, ঘরের কোণে জমা-করা অজস্র কাগজপত্রের দিকে তাকাইয়া গোয়েন্দা যুবক ভাবিত হইয়া পড়িল। থানার দারোগা বিপন্ন নিরুপায় বোধ করিল—সবই দেখিতে হইবে নাকি?

গোয়েন্দা অফিসার অমিতকে বলিল,—আপনার তো সবই বই;—ঘর-বোঝাই বই।

বই কে বললে? এক্‌স্‌প্লোসিভ্‌স্‌। কর্তাদের মতে বই তো বোমা।

ঠিকই বলেছেন—উৎফুল্ল হইল কর্মচারীটি।—বইই তো বোমা। কিন্তু তাতে আমাদের কি? আমরা জানি,—বই বোমা নয়, বই-ই। আপনাকে বলতে কি,—পারলে এক-আধটুকু আমরাও ওসব পড়ি, আনন্দও পাই। পুলিস হয়েছি, কলেজের বিদ্যা পুড়িয়ে খেয়েছি অনেক কাল। তা বলে বইপত্রও পড়ব না, আনন্দ পাব না, একেবারে মুকুখু হয়ে থাকব—এমন কি পাপ করেছি? অত বড় চাকরিও করি না যে, পড়াশুনো না করলেও চলবে।

অমিত কুতূহলী হইল। বেশ মজা তো! মানুষটার একটা মজার দিক উঁকি দিতে শুরু করিয়াছে তাহার কথার মধ্য দিয়া।

কাচের ভিতর দিয়া আলমিরাগুলির অভ্যন্তরস্থ বাঁধানো বইয়ের নাম কিছু কিছু পড়িবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া চলে গোয়েন্দা যুবক,—'সোভিয়েট শর্ট স্টোরির' সংগ্রহটা কিন্তু আমিও কিনেছি। আমি ঠিক নয়, আমার স্ত্রী—তিনি অণার গ্রাজুয়েট—

শুধু নিজের নয়, স্ত্রীরও সংস্কৃতির পরিচয় দিবার সুযোগ সে উপেক্ষা করিবে না। এবার অমিত মনে মনে কৌতুক বোধ করিতেছিল—মানুষের কত তুচ্ছ লোভই না আছে। 'আমি কাল্‌চারওয়ালা—আমার স্ত্রী কাল্‌চারওয়ালী'—
—এই দুর্বলতা সহজবোধ্য। ঔদ্ধত্য বা ইতরতা নাই ইহাতে।—অমিত তাহার প্রয়াস বুঝিতে পারিতেছিল ; তাই একটু আশান্বিতও হইতেছিল—লোকটা তল্লাশীর নামে বই-পত্র তছনছ করিবে না : অন্তত ঘর-দুয়ার লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিয়া যাইবে না। তোরঙ্গগুলি নিশ্চয় দেখিবে,—বইপত্রে তাহা বোঝাই। দেখুক। বেশি বাড়াবাড়ি না করিলেই হইল।

অমিত জানাইল,—একটা স্যুটকেসে আছে জামাকাপড় ; আর অন্য বাক্স-পেঁটরায় বই-ই আছে। আপনার স্ত্রী হয়তো পেলে খুশী হতেন, কিন্তু আপনি যখন পাচ্ছেন তখন আমার থেকে এসব নিশ্চয়ই 'সীজ' করবেন।

সহাস্য গর্বে উত্তর হইল,—একবার খুলে দেখি। আপনাকে নামাতে হবে না কিছু, উপর থেকে দেখলেই হবে। শুধু দেখা, বুঝলেন না? নইলেই তো দোষ হবে—'ডিউটি' পালন করা হয়নি।

অমিত লক্ষ্য করিতে লাগিল—ততক্ষণ বিছানাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল থানার দারোগা ও পুলিসে—কিছু নাই।

সত্যই বাক্স উপর-উপর দেখিয়াই যুবকটি প্রায় নিরস্ত হইল। অবশ্য পেঁটরার কোণগুলিতে তবু হাতড়াইয়া দেখিল--কিছু হাতে ঠেকে কিনা, পিস্তল বা বোমা।

টেবিলের উপর ছোটবড় নানা সাময়িকপত্র, বই। এখান হইতে ওখান হইতে দুই-এক সংখ্যা বই, দুই-একখানা চিঠি, দুই-একটি মাসিকপত্র যুবক টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। দেখিয়া আবার রাখিয়া দিল তাহা। ইচ্ছা করিয়া অযত্নে রাখিল না, কিন্তু যেখানে ছিল তেমনটিও রাখিল না। অমিত অস্বচ্ছন্দ বোধ করিল, তাহা পূর্বেকার মতো সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। একবার সতর্ক দৃষ্টিতে সে দেখিল

টেবিলের সামনেকার ছোট নীল খামখানা গোয়েন্দা যুবকটি হাতে লইয়াছে। অমিত কেমন অস্বস্তি বোধ করিল। গতকল্যকার এই পত্রখানা ইহাদের হাতে পড়িবে—কে জানিত? কিন্তু একবার চোখ বুলাইয়াই যুবক সে পত্রখণ্ড খামে বন্ধ করিল—বুঝিল ব্যক্তিগত চিঠি। একটা শোভনতা-বোধ সত্যই আছে তবে লোকটির। দেরাজের চিঠিপত্র একমুঠা তুলিয়া লইয়া সে বসিল, উণ্টাইয়া পাণ্টাইয়া আবার তাহা মুঠা ভরিয়া দেরাজে রাখিয়া দিল।

অমিত হাতমুখ ধুইয়া আসিল।

যুবক বলিল, দিল্লী যাচ্ছেন দেখছি।

অন্যান্য চিঠির সঙ্গে নীল খামটা দেরাজে রাখিয়া দিতে দিতে অমিত বলিল, হাঁ। একটা সাহিত্য-সভা আছে দোলের ছুটিতে। তাড়াতাড়ি শেষ হলে হয় এখন আপনাদের এই তল্লাশীর পর্ব।

তল্লাশী আর কতক্ষণ? কিন্তু—কি একটা কথা বলিতে বলিতে অনুচ্চারিত রহিয়া গেল। যে অনুমান অমিত প্রথম মুহূর্তেই করিতেছিল সে অনুমান তাহার নিজের নিকটে এই উত্তরে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অমিত বলিল, 'কিন্তু' কি?—তল্লাশীর পরেও কিছু আছে নাকি? কি ব্যাপার—বলুন না? তৈরী হয়ে নিই।

একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—

সাধারণ কথার মতোই কথা কয়টি যুবক বলিল। ঠিক যেমন সাধারণ কণ্ঠে অমিতকে বলিয়াছিল আঠারো বৎসর পূর্বে এমনি এক প্রভাতে এমনি আর এক গোয়েন্দা কর্মচারী। বলিয়াছিল তাহারও পূর্বে আরও কতজনকে, তারপরে আবার কতজনকে কতবার কত গোয়েন্দা অফিসার। কতখানে তাহারা বলিয়াছে এই কথা কয়টি এত বৎসর;—বলিল আবার আজও—সেই নির্লিপ্ত মার্জিত মামুলী কণ্ঠে সেই অতিসাধারণ কথা কয়টি। সেদিনকার সেই গোয়েন্দা অফিসার ছিল প্রৌঢ়, সমুন্নতদেহ, গম্ভীরপ্রকৃতি। এদিনকার এই কর্মচারীটি যুবক, সুদর্শন, আলাপে উৎসুকও—তাহার স্ত্রী সোভিয়েট শর্ট স্টোরিজও পড়েন। দুই যুগের দুই বয়সের দুই জীবনের দুই চরিত্রের দুই

মানুষ। কিন্তু দুই যুগের পারের সেই দুই বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর এই গোয়েন্দা-বিভাগের একই সূত্র উচ্চারণ করিতে কেমন অভিন্ন হইয়া যায়!—যেন তাহা দুইটি মানুষের স্বর নয়, উক্তি নয়—কোন একটা অ-মানবীয় যন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ধ্বনিমাত্র। দুইটি সুদূর বিভিন্ন কালের কোনো বৈচিত্র্যের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মাঝখানে এতগুলি বৎসর যেন ইতিহাসে অস্তিত্ব-হীন; সমস্ত যুগটা অস্বীকৃত এই অপরিবর্তনীয় সূত্রাবৃত্তিতে—'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে'—

'আর-একদিন' আজ?......থাকুক জাতীয় পতাকা আর 'পনেরোই আগস্ট'। অপরিবর্তিত আছে—সেই ব্রিটিশী গোয়েন্দার পাঠ 'একবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে!'

তাই বলুন—বলিয়া হাস্যমুখর কণ্ঠে উঠিয়া দাঁড়াইল অমিত। ডাকিল—সাধু, চা কর। রুটি-টুটি কি আছে ছাখ। স্নানও সেরে নিই তা হলে—সারা দিনে আজ আর নাওয়া-খাওয়ার আশা তো নেই।

না, না,—ব্যস্তভাবে যুবক বলিল,—আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন।

হা, হা, হা,—অমিতের হাসি এবার চাপা রহিল না, উচ্ছৃত হইয়া উঠিল। সেই পরিচিত বুলি! এমনি শুনিয়াছিল ঠিক এই কথাও অমিত,—এমনি নিয়ম বাঁধা এই শব্দ কয়টি। এমনি নিয়ম-বাঁধা আগ্রহের আতিশয্য ছিল সেই প্রৌঢ়-কণ্ঠে—আঠারো বৎসর আগেকার সেই লর্ড সিংহ রোডের গোয়েন্দা সাব ইন্‌স্পেক্টারের মুখে;—সেদিন 'জাতীয় পতাকা' ছিল না —ছিল না তখনো "পনেরোই আগস্ট।' আচরণে সেই নিয়ম-বাঁধা ইতরতার মতো কথার এই নিয়ম-বাঁধা ভদ্রতা, নিয়ম-বাঁধা নিস্পৃহতার মতো নিয়ম-বাঁধা আগ্রহ—এই আঠারো বৎসরেও তাহা তেমনি আছে। নিয়ম-বাঁধা সেই নিষ্প্রয়োজনীয় তুচ্ছ মিথ্যা কথাটিও বদলায় নাই। ইতিহাস উল্টাইয়া গেল চোখের সম্মুখে, কত হিটলার মুসোলিনী তোজো তলাইয়া গেল; ভাঙিয়া গেল ভারতবর্ষ আর বাঙলা দেশ—কিন্তু বদলায় নাই বাঙলা-দেশের গোয়েন্দা ইতিহাস, বদলায় নাই অমিত, তোমাদের ভাগ্য,—বদলায় নাই তাই সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দাদের এই

অর্থহীন সামান্য মিথ্যাভাষণের অভ্যাসটুকু পর্যন্ত।

—এই কথা কয়টাও ছাড়তে পারলেন না আপনারা—এত বৎসরে? এই মিথ্যা কথাটুকুও?

যুবক অপ্রতিভ হইল।—আমরা আর কতটুকু জানি বলুন? আমাদের যতটুকু ইন্‌স্ট্রাকশন থাকে ততটুকুই মাত্র বলতে পারি।

বেশ তো, ততটুকুই বলুন না? বলুন, গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। কেমন, ঠিক তো?

হ্যাঁ। তবে আমাদের বলা হয় না তো কাকে কর্তৃপক্ষ ছাড়বে, কাকে ধরে রাখবে।

তা হলে না বললেই পারেন—'আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন'। আজ সমস্ত দিনে যে আর নাওয়া-খাওয়া হবে না, একথাটা অন্তত আমরা বুঝি।

না, না, ওসব ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

হবে?—হাসিল অমিত—বেশ হোক্। কিন্তু গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট আছে, তা বলুন না।—না, তা নেই?

জানেনই তো, ওয়ারেণ্ট এখন আর লাগে না।

ওঃ!—অমিত হাসিল। হাঁ, ওয়ারেণ্টের বালাইও নাই।

আপনি জানতে চান, দেখাতে পারি—পকেট হইতে গোয়েন্দা যুবক কাগজ বাহির করিল। টাইপকরা কাগজে গ্রেপ্তারি নামের তালিকা—দেখি, বলিয়া প্রসন্ন হাস্যে যুবককে প্রীত প্রফুল্ল করিয়া নিজের নামটা অমিত দেখিয়া লইল। দেখিয়া লইল চকিতে অন্য আরো দুই একটি নাম—সৈয়দ আলি, দিলীপ দত্ত, শ্যামল রায়……তবু কিন্তু দুইপাতা-জোড়া নামের তালিকার প্রায় কোনো নামই দেখিতে পাইল না।

শ্যামলকে অমিত সংবাদটা কি করিয়া দিবে?—দ্রুত বিদ্যুৎগতিতে এই চিন্তা অমিতের মস্তিষ্কে খেলিতে লাগিল। অমিত বলিল,—কত নাম আছে তালিকায়? শ' খানেক হবে, না? 'না' বলছেন কেন, নইলে আমাকে পর্যন্ত আপনাদের খোঁজ পড়েছে।

অমিত সত্য কথাই বলিল। সে ভাবিতে পারে নাই—আজ, এই ১৯৪৮ সালে—পৃথিবীর কোনো বিরাট প্রয়াসের উদ্যোক্তা বলিয়া গণ্য হইবার মতো তাহার কোনো শক্তি আছে, যোগ্যতা আছে, আছে দেহবল ও উদ্যম। বয়সের অনিবার্য নিয়মেই সে আজ বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তা ও ভাবনার রাজ্যের অধিবাসী হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের যে-দুর্বার প্রাণচঞ্চল অস্থিরতা পৃথিবীর পথে পথে শত কর্মের, শত উদ্যমের মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াও নিঃশেষ হইতে চাহিত না,—বিশ বৎসর ধরিয়া যাহা গ্রামে নগরে সহস্র মিছিলে সভায় আপনাকে পরম আনন্দে সমুৎসারিত করিয়া দিয়াছে—যুদ্ধান্তের জন-জাগরণের মধ্যে যে আপনার জীবনস্বপ্নকে মূর্ত করিতে চাহিয়াছিল, আর শেষে বিমূঢ় বেদনায় দেখিয়াছে জাতীয় বিভ্রান্তি, দেশ-বিভাগ;—যৌবন-শেষে পরিণত জীবনসাধনার পথে সেই অমিত একটু একটু করিয়া উদ্যমের সঙ্গে চিন্তার, কার্যের সঙ্গে কল্পনার, আবেগের সঙ্গে আত্মবিচারের মিলন ঘটাইতে ঘটাইতে চলিয়াছে। তাই যৌবনান্তে আজ সে আপনারই অজ্ঞাতে আপনার জীবন-চাঞ্চল্যকেও যেন একটা ছন্দোনিয়মের মধ্যে গ্রথিত করিয়া লইয়াছে। যৌবনের প্রাণ-প্রাচুর্য স্থিরতর হইয়াছে এবার পরিণত জীবন-দৃষ্টিতে, নিশ্চিততর আস্থায়—ইতিহাসের মহালগ্ন আর দূরে নাই, এই যুগের রূপশালায় অমিত আর তাই শুধু কর্মোন্মাদ রূপকার নাই; সে আজ অনেকাংশে রূপমুগ্ধ জীবনশিল্পীও, চোখে তাহার নিখিল মানুষের জন্য মমতার মায়াকাজল আর মনে কৌতুকবোধের সরসতা;—দেহে ক্রমস্ফুট ক্লান্তির সঙ্গে ক্রমস্পষ্ট তাহার আয়ুর ক্ষীয়মাণতা, মনে একটা বিদায়ের শান্ত অপেক্ষা—'এবার মোরে বিদায় দেহ ভাই—সবারে আমি প্রণাম করে যাই।'

তবু ইতিহাসের এই উজান স্রোতে এই ছেঁড়াপাল, ভাঙাহাল তাহার জীবনতরীকেও খুঁজিয়া পাইল কিরূপে ইহারা এখনো একালের যৌবনের অগ্রে অগ্রে, সকল ঝটিকার মুখে [illegible]নি অগ্রগামী?—অথচ ভাবিতেই পারে নাই একথা অমিত।

'চাঞ্চল্য কোথায় আমার ডানায়?' নিজেকে যে এতদিন কেবলি জোর

করিয়া সাহস দিয়াছি—সহস্র মানুষের জীবনে আজ জোয়ার নামিয়াছে—আকাশের তারায়-তারায় নব-জাতকের আশ্বাসবাণী—'ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।'—'পাখা বন্ধ করিও না ঝড়ের পাখি। চলো ঝড়ের মুখে।' সেই ভাঙা-হাল ছেড়া-পাল যাত্রী অমিত, ধন্য আমি তবে, সহযাত্রী আমি এখনো দুঃসাহসী যৌবন-যাত্রীদের, অনু ও শ্যামলের, ক্ষেতের মানুষের আর কারখানার মানুষের। কে জানত ইতিহাসের এই অভিযানে আজও অগ্রগামীদেরই সঙ্গে আমার স্থান? আমার পর্যন্ত খোঁজ পড়েছে আজ। আমি অমিত, I have been ever a fighter……… কালও ভেবেছি—one fight more.

'বাকি আছে শুধু আর এক অতিথি আসিবার, তারি সাথে শেষ চেনা'—আজ জানলাম অশেষ আমার চেনা, অশেষ আমার যাত্রাও!

গোয়েন্দা যুবক বলিল,—আপনারখোঁজ পড়বে না, অমিতবাবু? আপনার কেন, কার যে না পড়ছে তা জানি না। রাত্রি নটা থেকে কাল আফিসে তৈরী হয়ে এসে বসেছি।—কিন্তু বলিতে বলিতে কি তাহার মনে পড়িল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—বসুন, শ্যামলবাবুর ঘরটা শেষ করি।—তারপর নিরাসক্ত অমায়িক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—ওঁরা গিয়েছেন কোথায়?

অমিত নিঃসংশয় হইয়াছিল। বলিল,—অনু আর শ্যামল গিয়েছে শ্যামলের মায়ের কাছে পাকিস্তানে।

কথাটা মিথ্যা। কিন্তু এইরূপ সময়ে সত্য বলিবার মত মূঢ়তা অমিতের কোনো কালে ছিল না।

অনুর ঘরে তল্লাশী আরম্ভ হইল। সর্তক দৃষ্টিতে জিনিসপত্র যাচাই চলিল।

ভোরের পাখি ডাকিতে শুরু করিয়াছে অনেকক্ষণ। আলো জাগিয়া উঠিতেছে বাহিরের সড়কে। পূর্ণিমা, রাত্রির চন্দ্র নিষ্প্রভ হইয়াছিল, কখন অস্ত গিয়াছে। এ বাড়ির ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটেও জাগ্রত মানুষের গুঞ্জন শোনা যায়—'পুলিস আসিল কাহার ফ্ল্যাটে'?—ওপারের ফুটপাতে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে

প্রতিবেশী ও পথচারীরা দেখিতেছে এপারের বাড়ির ফটকে রাইফেলধারী পুলিসের সজ্জা। সকৌতূহল, বিমূঢ় এক সশঙ্ক দৃষ্টি এদিকে-সেদিকে চারি-দিকে মানুষের চোখে। সেই পুলিস-রাজ আর বন্দুক-রাজ আজও কি তাহা হইলে অব্যাহত?

কত ছোট টুকরা টুকরা চিঠি,—কি তার অর্থ, কি তার ইঙ্গিত, কে জানে। কত সামান্য তুচ্ছ কাগজপত্র—অনু ও শ্যামলের শতদিনের সহস্র কাজের নিদর্শন; দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা বিচার, নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক ও বিশ্লেষণ;—এগুলির কি সার্থকতা আজ আছে? ভুলত্রুটির, সত্যমিথ্যার সাক্ষ্যমাত্র। অথচ ইহাদের লইয়াই কাল আপনারই অগোচরে নবজন্মের তোরণে গিয়া পৌঁছায়······

পাকিস্তানে ওঁরা কতদিন থাকবেন?—নিরাসক্ত গোয়েন্দা কণ্ঠের প্রশ্নে অমিত আবার চমকিত হইল।

নিরাসক্ত কণ্ঠেই অমিতেরও উত্তর ফুটিল,—শ্যামল পাকিস্তানেই থাকছে। অনুও সেখানে চাকরি পাচ্ছে। তবে এখানকার স্কুলের চাকরিটা সে এখনো ছাড়েনি, ছুটি নিয়েছে।

অমিত লক্ষ্য করিল, শ্যামলের মায়ের ঠিকানা পুরানো চিঠি-পত্র হইতে পুলিস সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইতেছে। কে বলে সাধারণ আপ্যায়ন-অভিলাষী কালচার-অভিমানী যুবক সে—স্ত্রী যাহার আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট্? সে সুচতুর গোয়েন্দা কর্মচারী।

আপনার ভাই মনুজবাবু দিল্লীতেই আছেন বুঝি? তাঁর কাছে যাচ্ছিলেন?

অমিত সতর্ক হইল। সহজস্বরে বলিল,—হাঁ, আজই তুফান মেলে আমার যাবার কথা—কাল স্টেশনে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কথাটা [illegible]। অমিত দেখিতেও পাইতেছে—অনেকের [illegible] মনুর গর্বিত [illegible] দৃষ্টি [illegible] প্রতীক্ষায়। পল্লীর সন্ধ্যালোকের বসন্ত বাতাসে মনুর [illegible] চোখেমুখে আসিয়া পড়িয়াছে, মনের উপরে আনন্দের প্রীতির [illegible] কিন্তু [illegible] কোথায় গাড়িতে? তারপর চিন্তিত

নিরাশ দৃষ্টি লইয়া মনু ফিরিয়া যাইবে—তাহার দাদা আর তাহাকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে না ; স্বীকার করে না মনুকে পৃথিবীর দশজনের অপেক্ষা অমিতের নিকটতর বলিয়া, আপনার ভাই বলিয়া। সে স্বীকৃতি অনুই বরং আদায় করিতে পারিয়াছে ; অমিতের জীবনের ধারার সঙ্গে নিজের জীবনের ধারাকে মিশাইয়া দিয়া অনু দাদাকে আপনার যথার্থ সহোদররূপে লাভ করিয়াছে—লাভ করিয়াছে শ্যামলকে স্বামীরূপে। কিন্তু মনু দাদাকে লাভ করে নাই—মনু কাহাকেও লাভ করিতে পারিল না। মনু সেই অপরাধে নিজকে অভিযুক্ত করে ; অমিতের অনুর জীবনের ধারা হইতে তাহার জীবনের ধারা পৃথক। সে মানুষকে লইয়া ইতিহাস গড়িতে পারে না, সে ইতিহাস মাটির তলায় খুঁজিয়া পাইতে চায়। এ সত্য মনে করাইয়া দিবার জন্যই বুঝি এইবারও অমিত আসিল না ; মনুকে কথা দিয়াও অমিত তাহা রাখিল না। এই বসন্তপূর্ণিমার উৎসব-সভায় দিল্লীর এতগুলি ভদ্রলোকের আহ্বানেও দাদা অসিলেন না।—ম্লান-হাস্যে এইরূপই ভাবিতে ভাবিতে মনু কাল ফিরিয়া যাইবে দিল্লী স্টেশন হইতে। সকলের সহস্র অনুযোগ ও প্রশ্নের মধ্যে সে স্টেশন হইতে বাহির হইবে অপরাধীর মত—কথা দিয়াও কথা রাখিল না অমিত। দুঃখিত ব্যথিত অপমানিত মনে কাল মনু ফিরিয়া যাইবে।···কিন্তু ভুল, মনু, ভুল ! অমিতের প্রাণের সঙ্গে তাহার প্রাণ গাঁথা ; কর্মের না হউক মর্মের বন্ধনে। মনু না হইলে কে দিতে পারিত অমিতকে তাহার গ্রাসাচ্ছাদন ? অমিতের সাথী মনু জন্মাবধি আর মৃত্যু পর্যন্ত।—শুনিতে পাইবে কি মনু কাল দিল্লী স্টেশনে তাহার দাদার এই মুহূর্তের এই অস্ফুট গুঞ্জন ?···

সাধু চা আনিল। সঙ্গে খান দুই টোস্টও। অভ্যস্ত প্রথায় অমিত বলিয়া ফেলিল,—এক পেয়ালা ? আর করিস নি ?

কি[illegible] সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরে যেন একটা [illegible] নিতে পাইল : সে কি অমিত ? এ তুমি কি করি[illegible] ?

ভদ্রলোকের এই ভদ্রতা ?···

সাধু বলিতেছিল,—আরও দু পেয়ালা আনছি।

হাতের কাগজের গুচ্ছ রাখিয়া দিয়া গোয়েন্দা যুবক বলিয়া উঠিল,—না, না আমাদের দরকার নেই। আপনি খান, অমিতবাবু, খেয়ে নিন; জানেনই তো কখন ছাড়া পাবেন ঠিক নেই।

অমনি থানার পুলিস-কর্মচারীও সঙ্কুচিত কণ্ঠে বলিল,—আমি চা খাই না। বুঝা গেল, কথাটা সত্য নয়, ভয়ের ও ভদ্রতার কথা মাত্র। এই পক্ষেও ভদ্রলোকের ভদ্রতা। দ্বন্দ্বখণ্ডিত চিত্তে শুষ্ককণ্ঠে অমিত বলিতে চাহিল, খান, করেছে। কিন্তু আত্মদ্বন্দ্বে আরও খণ্ডিত হইয়া পড়িল সেই সঙ্গে সঙ্গে।... ইহারই নাম ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার। কিন্তু 'মানুষের সঙ্গে মানুষের মত' ব্যবহার কি ইহা? কোথায়, ময়লা পোশাকের, ছোট উর্দির ওই ছোট মানুষের সঙ্গে তো অমিত আপ্যায়ন করিল না?

অমিত সাধুকে বলিল,—সিপাহিজীকে দিয়েছিস? আগে ওঁদের দে।

বলিতে বলিতে একবারের মত অমিত আপনার মনে সুস্থ বোধ করিল—মানুষকে সে অস্বীকার করে নাই। মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করা, ইহাই তো সত্যকার ভদ্রতা। অন্তত ইহাই অমিতের ধর্ম। অমিত যেন আপনার মধ্যে স্বস্তি পাইল। মানুষকে মানুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, হউক সে মানুষ এই গুর্খা সিপাহীর মত আপনার অজ্ঞানতায় আপন শত্রুর হাতিয়ার—আপনার অচেতনতায় আপনার শত্রু। তবু সে মানুষ—তবু সে মানুষ।

হাম্?—বিস্মিত গুর্খা সিপাহীর কণ্ঠে অবিশ্বাসের প্রশ্ন,—হাম্ পিয়েঙ্গে?

অমিত বলিল, পিজিয়ে!

গুর্খা সিপাহি একবার বিমূঢ় দৃষ্টিতে ইন্স্পেক্টারের দিকে তাকাইল। পিলাও—মুখ না তুলিয়া ইন্স্পেক্টার বলিল।

সন্দেহ ফুটিয়া উঠিল গুর্খার দৃষ্টিতে। একটা চক্রান্ত আছে কোথাও ইহার মধ্যে। লেখাপড়া-ওয়ালা বাবুলোগদের মতলবই হইল তাহার মত সরকারের গরীব সিপাহিদের বিপদে ফেলা।

নেহি।—গম্ভীর কঠিন ভাবলেশহীন মুখ।—হাম্ ডিউটিমে হ্যায়।—সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের উপরে গুর্খা হাতও যেন শক্ত কঠিন হইয়া উঠিল।

…এই হাত, এই মুখ এমনি ভাবলেশহীন কঠোরতায় এখনি তুলিয়া ধরিবে ওই রাইফেল অমিতের বুক লক্ষ্য করিয়া—যদি সেরূপ হুকুম করে উহার আপনার শ্রেণীশত্রু। মানুষের হাত—ওই সাধারণ মানুষের রক্তমাংসের মত—কাঁপিবে না একবারও মানুষের বন্ধু--সাধারণ মানুষের কোন মমতাময় বন্ধুকে নিহত করিতে। অ্যাণ্ড হোয়াট্ ম্যান্ হ্যাজ মেড্ অফ্ ম্যান্! মানুষকেই মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে মানুষ।

অমিত বলিল,—তুই খেয়েছিস, সাধু? নে, খেয়ে নে।

নিজের পেয়ালা হাতে তুলিয়া লইল অমিত।

…ভদ্রতা-অভদ্রতার দৈনন্দিন এইরূপ ছোট জিজ্ঞাসার তুচ্ছ দ্বন্দ্বের ধূলি-ধোঁয়ার মধ্যে আমি শেষ পর্যন্ত হারাইয়া ফেলিব নাকি আসল সত্যের ঠিকানাও? চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলিব—উইণ্ড্ মিলের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইব?…

কৌতুকের হাসি উঁকি দিল এইবার অমিতের মনের কোণে—তোমরা হ্যামলেট, না, ডন কুইকসো, অমিত? সর্বদেশের সর্বকালের প্রিন্স অফ ডেনমার্ক, না, পৃথিবীর স্বকালচ্যুত শ্রেষ্ঠ নাইট-এরাণ্ট?—হয়তো দুই-ই;—এ কালের পরিহাস—আবার আগামী দিনের আশ্বাসও।…

চায়ে চুমুক দিল অমিত। ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা দিল। পৃথিবীর প্যারাডক্স তাহার কৌতুকবোধ এবার জাগাইয়া তুলিতেছে—একই কালে তুমি—অমিত, কালের পরিহাস ও কালের আশ্বাস।

তল্লাশী শেষ হইয়াছে। এখন তালিকা তৈয়ারি হইবে। একজন হিন্দুস্তানী পানওয়ালা, একজন পাড়ার নিষ্কর্মা যুবক, আর অপরিচিত তেমনি একটি সাধারণ পথিক—তালিকায় স্বাক্ষর করিবার জন্য হাজির হইয়া আসিল। হোলির আবিরে ও রঙে তাহারা রঞ্জিত, কতকটা হোলির নিশি-শেষের শ্রান্তিতেও তাহাদের দেহ অচল। সকৌতুকে অমিত দেখিল।…আশ্চর্য

এইসব তল্লাশীর সাক্ষী সংগ্রহ ইহাদের। ঠিক কোথা হইতে প্রত্যেক সময়েই তল্লাশীর জন্য জুটিয়া যায় এমনি পানওয়ালা, এমনি অপদার্থ মানুষ আর এমনি অপরিচিত পথিক। বিশ বৎসর পূর্বেও জুটিত, আজও জোটে। তখনো যেন সে পাড়ায় আর অন্য মানুষ বাস করিত না, আর আজও যেন এ বাড়ির অন্য ফ্লাটে আর কোনো মানুষ নাই।

আমি তা হলে স্নান সেরে নিই।—অমিত উঠিল।

ছোট একটা সুটকেশে কিছু কাপড়-জামা সজ্জিতই রহিয়াছে, হোল্ড-অলেও মোটামুটি প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র গোছানো আছে—আজ মধ্যাহ্নেই দিল্লী যাইবার কথা ছিল।

...খবরটা পাইবে কি করিয়া আজ শ্যামল? কি করিয়া পাইবে তাহা অনু? শ্যামল এখন দানাপুরে, না মোগলসরাইতে? রেলওয়ে শ্রমিকের কোন্ কেন্দ্রে সে এখন? ধরা পড়িবে কি সেখানে? সারা দেশ জুড়িয়া আজ হানা দিতেছে সরকার। কোথায়ই বা অনু? আসানসোলে না গিরিডিতে? শ্রমিক মেয়েদের জীবনের তথ্য সংগ্রহ করিতে গিয়া—কোথায় পৌঁছিয়াছে সে এখন? খনিতে, না, রেল-কলোনিতে? হোলির সময় বলিয়া যদি অনুরা শ্রমিকপল্লীতে, খনিতে বা রেল কোয়ার্টার্সে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে হয়তো অনু এখনও বারাণসীতে তাহার শাশুড়ীর কাছে আছে। হয়তো শ্যামলও এখনো লাইনে বাহির হইয়া পড়ে নাই। তাহা হইলে সম্ভবত পুলিস আর তাহাদের একজনারও খোঁজ পাইবে না। সময় পাইলে শ্যামল নিশ্চয় পালাইবে। কিন্তু অনু কি করিবে? সেও পালাইবে? পালাইয়া থাকিতে পারিবে অনু?—বড় দুঃখের, বড় কষ্টের যে সেই পলাতক জীবন—অমিতের অভিজ্ঞতায় তাহা একটা কঠোর পর্ব। অশনে বসনে বিষম [illegible] ব্যাহত সে জীবন; খাঁচায়-পোরা মানুষের অবরুদ্ধ সী[illegible]। নিস্তব্ধ গতিবিধি, নিঃশব্দ হাসি, নিশ্চল প্রতীক্ষা; আর [illegible]নরাত্রি সর্ব অবস্থায় একটা ক্ষান্তিহীন সতর্ক পাহারা; যেন 'স্নায়ুযুদ্ধের' একটা অন্তহীন একটানা অধ্যায়। অথচ

তাহাতে স্নায়ু সংগ্রামের তীব্রতা নাই, তীক্ষ্ণতা নাই, আর নাই পৌরুষের পরীক্ষা। আছে শুধু আপনার অচপল স্থৈর্যের পরীক্ষা। বিশেষ করিয়া তাহাদের, যাহাদের জীবন এখনও সরস গতিময়; যৌবনের অফুরন্ত আশা আর সাহসে যাঁহারা অস্থিরগতিচঞ্চল; কর্মচঞ্চল দিনরাত্রির মধ্যে পৃথিবীকে যাহারা আকণ্ঠ পান করিতে চায়—যাহারা অনুর মত। না, না, অনু না পালাইল। একই সঙ্গে মমতা ও কর্তব্য নির্দেশের গাম্ভীর্যে অমিতের মন ভরিয়া উঠিয়াছে; পিতৃহীনা অনুর অমিতই দাদা, বন্ধু।

অনুকে শ্যামলকে কি ভাবে জানানো যায় এই সংবাদ যে, পুলিস তাহাদের খুঁজিতেছে। কে পারিবে এ সংবাদ তাহাদের কাছে পৌছাইয়া দিতে? কে দিবে তাহাদের এসময়ে আশ্রয়?

স্নানঘরের দ্বার খুলিতেই দণ্ডায়মান গুর্খা সিপাহি তাহার চোখে পড়িল। আর চোখে পড়িল সেই গুর্খার চোখের আশ্বস্ত দৃষ্টি—স্নানঘর হইতে অমিত তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করে নাই। অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—চিড়িয়া নেহি ভাগা।

এক মুহূর্তের জন্য সেই গুর্খার মুখেও সলজ্জ হাসি ফুটিল। আর রাইফেল, উর্দি, নোকরি-নিমক, বাস্তব ও ভাবলোকের সমস্ত বন্ধনের মধ্য হইতে যেন ফুটিয়া উঠিল সেই দার্জিলিং-কালিম্পংএর চাবাগানের কর্মক্লান্ত মানুষ।

অমিত গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল,—সাধু আর এক পেয়ালা চা দিবি? হ্যাঁ, একটু ভালো করে কর—কি জানি আবার তোর হাতে চা কবে খাব? খাব যে তারই বা নিশ্চয়তা কি?

ভদ্রতার রীতি-নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল,—না, অমিত বাবু, কি আর হবে? হয়তো ক ঘণ্টা বসে থাকতে হবে, বড় বড় সাহেবকর্তারা কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

অমিত হাসিল, হয়তো ক' ঘণ্টা, হয়তো বা [illegible]লে বড়জোর বাকি জীবনটুকু—

ভদ্রতার নিয়মে গোয়েন্দা কর্মচারী বুঝাইতে চাহিল—তাহা নয়!

অমিত সুটকেশ ভরিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল।…কয় ঘণ্টা না কয় বৎসর? ঠিক কি তাহার? ইতিহাস মুখর হইয়া উঠিয়াছে ইতিমধ্যেই। এদিকে পারমিটের দালালিতে আজ তোমরা 'স্বদেশীরা' মারোয়াড়ীর বাড়া।…

দশ বৎসর পূর্বে জেলের অভ্যন্তরে বসিয়া সেদিন ভুজঙ্গ সেন অমিতকে বলিয়াছিল, অমিত বাবু, এ দেশটাকে আমরা রুশিয়া বানাতে দেব না। আপনাদের সর্বহারাদের না হয় হারাবার মত কিছু নেই—শৃঙ্খল ছাড়া। আমাদের 'স্বদেশীদের' কিন্তু হারাবার মত মহৎ সম্পদ আছে: এই ভারতবর্ষ, তার অধ্যাত্ম সভ্যতা, আর আমাদের ত্রিশ বৎসরের এই তপস্যা।

সেদিনও অমিত জানিত ভুজঙ্গ সেনের কথাটা মিথ্যা। ভুজঙ্গ সেন হারাইতে রাজী নয় তাহার উপদলীয় নেতৃত্ব, তাহার আপন ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ভদ্রশ্রেণীর সুবিধা-সুযোগ।

বার্সিলোনার পতন হয়েছে—বটে?—তর্ক চলিতেছিল। বন্দী অমিত সঙ্গী বন্ধুদের তর্ক শুনিতেছে। সাধারণত ভুজঙ্গ সেন এইসব যুবকদের দিকে তাকান না, ভ্রমণ করেন নিজের নিয়মে। অবশ্য কোন কথা তাঁহার কান এড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া—তিনি ভুজঙ্গ সেন—ইহাদের কথাবার্তা তাঁহার কানে যায়, তাহা স্বীকার করিবেন নাকি? জাতীয় জীবনের বৃহত্তম সমস্যা তাঁহার ধ্যানের বিষয়, 'ছোকরাদের' কথাবার্তা নয়। কিন্তু এই কথাটা বলিল কে? তাঁহারই দলের দক্ষিণা না? ভুজঙ্গ সেন দাঁড়াইলেন।

'পতনটা' কাকে বলে দক্ষিণা? বার্সিলোনার পতন হয়েছে, না, উদ্ধার হয়েছে?

দক্ষিণা ভীতভাবে 'দাদাকে' বলিল, ওঁরাই বলছিলেন শব্দটা—আমি অবশ্য মানি না 'পতন'।

দক্ষিণার প্রতিপক্ষীয় তার্কিক ছেলেটি বলিল, কেন রিপাব্লিকান্ গবর্নমেণ্টের হাতে ছিল বার্সিলোনা—জনমতের দ্বারা তারা নির্বাচিত গবর্নমেণ্ট—

অমিত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু ভুজঙ্গ সেন উত্তর দিবার জন্য দাঁড়াইলেন না। এইসব ছেলে-ছোকরার সঙ্গে কথা বলা তাঁহার পক্ষে অসম্মানজনক। যত বিড়ি-সিগারেটের দোকানদারদের গবর্নমেণ্ট না হয় এখন 'ডেটিন্যু' করিতেছে! তাই বলিয়া ভুজঙ্গ সেনও তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিবে নাকি!

জনমত!—দক্ষিণাকে ভুজঙ্গ সেন বলিলেন,—'যেন জনতার মত আছে! মত দিবার যোগ্যতা জন্মায় যেন দুটো হাত থাকলেই।...'

অমিত মানিতে পারে ভুজঙ্গ সেন ইতিহাস বুঝিতেন না। ১৯১৫এর কোন একটি দিনে তথাপি যুবক ভুজঙ্গ কি পারিতেন না ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করিয়া গাহিয়া যাইতে জীবনের জয়গান? পারিতেন। অমিতও জানে পারিতেন। —তখন ভুজঙ্গ সেনের যৌবনের উন্মাদনা তাহাকে প্রধাবিত করিয়াছে দেশের এক কোণ হইতে অন্য কোণে,—শহরে, গ্রামে, বনে-বাদাড়ে। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর রূপে তখন ভুজঙ্গ আগুন লইয়া খেলিতে এক নিমিষের জন্যও দ্বিধা করেন নাই।

কিন্তু ভুজঙ্গ সেনের কোনো শ্রদ্ধা নাই প্রাণ-চঞ্চল যুবক-শক্তির প্রতি, জনশক্তির প্রতি;—'ভেড়ার পালের তুলনায় মেষপালকের সংখ্যা কমই হয়।' ভুজঙ্গ সেন সাধারণ মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে জানেন না। আসলে মানুষকেই তিনি অস্বীকার করেন।

অমিত মনে মনে মানেঃ অস্বীকার করিতে হইলে এই মানুষকেই ঘৃণা করিতে হয়, মানুষকে যে অস্বীকার করে। আর মানুষকে যে অস্বীকার করে সে কি ভালোবাসিতে পারে তাহার দেশকে? 'মানুষের অধিকারে' যাহার বিশ্বাস নাই,—ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ পর্যন্তও পৌছে নাই যাহার চিন্তা,—সে কেমন করিয়া চাহিবে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র?...

অমিতের মনের কোণে ঘৃণা সঞ্চারিত হইবার পূর্বেই তাহার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল—কেমনতর মানুষ ভুজঙ্গ সেন! 'বাস্চাই সান্কো?'

আবার অমিতের হাসি পাইল। আর পরক্ষণেই তাহা ক্লিষ্ট হাসিতে

পরিণত হইতে চলিল।…'ভুজঙ্গ সেন জাতীয় পতাকা তুলেছেন আমাদের অফিসে পনরই আগস্ট।' ওই গোয়েন্দা-শালায় অন্য কেহ কি পতাকা তুলিতে পারিত না? এই গোয়েন্দা-চক্রটাই কি ভুজঙ্গ সেনের 'ভারতের অধ্যাত্ম সত্যে'র সাধন-পীঠ?

অমিত দুঃখে লজ্জায় আবার হাসিল—'অধ্যাত্ম সাধনার' আর শেষ নাই; ভুজঙ্গ সেন বিধান-পরিষদে নুন-তেলের পারমিট লইয়া কেনা-বেচা করেন, পশ্চিম বাঙলার লাটপ্রাসাদে হয় কীর্তন গান;—আর বাহিরে চলে লাঠি ও গুলি।

সকৌতুক হাস্যে অমিতের চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—স্বাধীন দেশকে সার্ভ করতে আর কতক্ষণ লাগাবেন?

যুবক একটু অপ্রতিভ হইল। পরে বলিল—আপনার জন্যই তো দেরি করছিলাম। জিনিসপত্র নিয়েছেন সব?

আমার জিনিসপত্র গুছানো হয়ে গিয়েছে। এক-আধখানা বই এবার নিয়ে নোব, যদি নিতান্ত পড়তে সাধ যায় কখনো।

অমিত বইএর শেলফের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

আর কতদিন হয়তো ইহাদের সঙ্গে দেখাও হইবে না। দৃষ্টি বিনিময়ও হইবে না—একটিবার দিনান্তে।—অমিতের মনের মধ্যে একটা বেদনা ও কৌতুক উঁকি দিল: এতদিন এতরাত্রি তোমরা আমারই প্রতীক্ষায় বুক বাড়াইয়া ছিলে—আমি ফিরিয়া তাকাইতেও পারি নাই। আর আজ? তোমরা কে দিবে অমিতকে তাহার কর্মহীন দিনরাত্রিতে বেলাশেষের সাহচর্য?…

…সমুদ্র আর শেক্সপীয়র: নির্বাসিত আত্মার পক্ষে চিরন্তন এই দুই আত্মীয়, বলিয়াছেন ভিক্তর হুগো। সতের বৎসর পূর্বে অমিতও তাহা অনুভব করিয়াছে। বন্দিশালার চতুর্দিকে নিশ্চল নিস্তব্ধ পাহাড় প্রহরীর মত দণ্ডায়মান; কিংবা চতুর্দিকে ছিল মরুভূমির প্রসারিত প্রান্তর;—সমুদ্র ছিল না, কিন্তু ছিল সেখানে শেক্সপীয়র। বন্দিশালায় বহু বহু মানুষের চিন্তা ও

ভাবনায় শত আঁখি উঠিত। বারে বারে অমিত তখন এই পুরাতন গ্রন্থখানির পাতা খুলিয়া বসিয়াছে আর সাক্ষাৎ পাইয়াছে সমুদ্রের;—মানব-সমুদ্রের, জীবনের অপার বিস্ময়ের; মানুষের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের। জীবনের যে অর্থ দিন-রজনীর ঘটনার সংঘাতে সে গুলাইয়া ফেলে, তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠে মহাকবির সৃষ্টিলোকে। ইতিহাসের বিরাট বাণী যেন উহার নিটোল শব্দমালায় মূর্ত।

…দশবৎসর পূর্বে ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে এই কথা অমিতের মনে হইয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় মহাভারত লইয়া তখন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ-বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। কন্যা সবিতা তাঁহার গবেষণার সহায়। একক নির্বাসিত নিঃসঙ্গ জীবন যদি তাঁহাকে যাপন করিতে হইত, আর একখানি গ্রন্থমাত্র গ্রহণ করিবার অধিকারই শুধু তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে কোন্ গ্রন্থ গ্রহণ করিতেন তিনি? গ্রহণ করিতেন মহাভারত। যে ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের পিতার মতই ঊনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী হিসাবে শেক্সপীয়র মিলটন লইয়া আজীবন মাতিয়া ছিলেন তিনি পরিণত জীবনে মহাভারতেই দেখিলেন মানবতার পরিচয়।—অথচ অমিত গ্রহণ করিত—গ্রহণ করিবে—শেক্সপীয়র,—যে অমিত বিংশ শতকের বাঙালী যুবকরূপে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাঠ করিয়াছে মার্কস-এঙ্গেল্‌স্‌-এর পাতায়, লেনিনের স্তালিনের বিচারে কর্মে। পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় সেদিন সস্নেহে হাসিয়াছিলেন, দুইজনেরই চিন্তার ও কার্যের অসংগতি তাঁহাকে কৌতুকদান করিয়াছিল। ব্রজেন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, উপায় নেই অমিত। জাবন এমনি অসঙ্গতিতেই ভরা। তোমরা তাতে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ। কিন্তু আমরা হই না! আমাদের চোখ পৃথিবীর পুরাতন রূপে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে।

পিতার কথা শুনিয়া সবিতাও সলজ্জ চোখে হাসিয়াছিল।…

…সেই শেক্সপীয়রই তবে আজও হোক অমিতের সাথী। অসংগতি আছে নাকি ইহাতে? থাকুক।

অমিত শেক্সপীয়রের রচনা-খণ্ড তুলিয়া লইল।

দুয়ার-জানালা বন্ধ হইল। ফ্ল্যাটের বাহিরে আসিতেই গোয়েন্দা যুবক বলিল,—দাঁড়ান। তালা-চাবিটা জমাদারের কাছে রয়েছে, ফ্ল্যাটটা 'শীল' করতে হবে।

'শীল' করতে হবে?—অমিত বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।—কেন?

ওরূপই হুকুম। আপনার এ ফ্ল্যাটে এ পাড়ার কমিউনিস্ট পার্টির সভা হত।

কে বললে?

আমাদের তাই রিপোর্ট। শ্যামলবাবু এ শাখার সেক্রেটারি। তাই ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ করে দিয়ে যাবার হুকুম আছে।

অমিত এবার ক্ষুব্ধ হইল,—হলই বা সভা কমিউনিস্ট পার্টির।—তারপর আবার বলিল,—কোন্ আইনে আপনারা বাড়ি তালাবন্ধ করছেন? শ্যামলই বা কি বেআইনী কাজ করেছে? একটা আইনসংগত পার্টির যদিবা কোনো বৈঠক এখানে বসত, তা অপরাধ হবে কি করে? আমার ফ্ল্যাট বন্ধ করবার কোন্ কারণ আছে তাতে? পার্টি বন্ধ নয়, আর ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ হবে?

যুবক বলিয়া ফেলিল, পার্টিও বন্ধ হচ্ছে—

কে বললে? অমিত চকিত বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল।

যুবক আর উত্তর দিল না, বলিল,—আমাদের তো এসব হাইপোলিসির ব্যাপার জানবার কথা নয়। আদেশমত কাজই করি মাত্র। আপনি বরং আপিসে সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করবেন।

হোক সে কালচার-লোভী যুবক, স্ত্রী যাহার আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট, সে গোয়েন্দা কর্মচারীও। বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিবে নাকি? এক মুহূর্তে অমিত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—স্বাধীন ভারতে কি রাজনৈতিক পার্টি ও মতামত গড়িবার স্বাধীনতাও থাকিবে না? এ স্পেক্টার ইজ্ হন্টিং দি ওয়ার্ল্ড!

শীলমোহর হইয়া গেল। সাধু তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া অমিত নামিয়া চলিল। সম্মুখে পশ্চাতে পুলিস, ফটকে পুলিস দাঁড়াইয়া। পুলিসের খোলা বড় ট্রাক্ অমিতের অপেক্ষায় প্রস্তুত। প্রতিবেশীরা অনেকেই জাগিয়াছে। নিজ নিজ বাড়ি ও ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি হইতে

দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে অমিতবাবু আবার গ্রেপ্তার হইয়া চলিলেন। সকলের উদ্দেশে অমিত হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। মনে মনে বলিল—'সবারে আমি প্রণাম করে যাই'।

সাধু বলিল, আমি কোথায় যাব, দাদাবাবু?

কোথায় যাবি?—অমিত কি বলিবে? সাধুর কোনরূপে খবরটা অনু ও শ্যামলকে পৌছাইয়া দেওয়া চাই।—

সাধুই বলিল, কালিঘাটের দিদির বাড়ি যাব?

এক মুহূর্তে অমিতের মন সচকিত হইল। সাধু ঠিক স্থানেই অনুমান করিয়াছে। অমিত তাহা জানিয়াও নিজের মনের কাছেই এতক্ষণ স্বীকার করিতে পারিতেছিল না। সবিতা ছাড়া এই সময় হয়তো আর কাহারও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। অন্তত আর কাহারো কাছে সাহায্য চাওয়া যায় না। অমিতের বন্ধুবান্ধবের অভাব নাই, সে সৌভাগ্য সে অপ্রতুলভাবেই লাভ করিয়াছে। তাহাদের নিকটে এদিকে সাহায্য চাহিতে অমিত প্রস্তুত নয়। সত্য সত্যই কার্যকরী কোন সাহায্য দিতেও তাহারা জানে না। সবিতাই কি তাহা পারিবে?

পুলিস লরি স্টার্ট দিতেছে। অমিত বলিল,—আচ্ছা, তাঁকে বলিস দাদাবাবু ও দিদিমণিকে যেন খবরটা যে করে হয় আজই দেয়।

স্পষ্ট হল কি কথাটা? কথাটা বুঝবে কি সবিতা? সবিতা বড় 'ভালো মানুষ'। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' তাহার জীবন। না, শুধু ভালো মানুষ নয়। সবিতা আত্মপ্রকাশে কুণ্ঠিত, আর তাই সবিতা 'ভালোমানুষ'। অর্থাৎ মানুষ হইতে সে পারিল না। আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও অনুকে শ্যামলকে তাই সে এখন সাহায্য করিতে পারিবে কি না কে জানে? তবু সে-ই অবস্থাটা বুঝিতে পারিবে। আর বুঝিতে পারিত নিঃসন্দেহে—ইন্দ্রাণী। কিন্তু অনেক দূরে আজ ইন্দ্রাণী—অনেক দূরে সে—হাঁ, অনেক দূরে। অবশ্য তাহার নীল খাম এখনও অমিতের টেবিলের উপরে—আর সেই কয় ছত্রও অমিত কেন, নিশ্চয় পৃথিবীর যে কোন মানুষকে

স্পষ্ট আত্মসচেতন ভাবে জানাইয়া দিবে সে ইন্দ্রাণী। সে কোনো দিন দূরে নয়, বিশ বৎসরেও সে অবিস্মৃত স্মৃতি। জীবন-যাত্রার শত পরিবর্তনেও সে অপরিবর্তনীয়া। না; অনেক দূরে তবু সেই ইন্দ্রাণী, অনেক দূরে। কাল সন্ধ্যায় এই অনুচ্চারিত সত্য স্বীকার করিয়াছে দুই জনাই তাহারা,—সে ইন্দ্রাণী, তার একার; আর অমিত কারও একার নয়,—অনেকের, অনেক—অনেক মানুষের—

পুলিসবেষ্টিত হইয়া অমিত কালো 'ভ্যানে' সমাসীন। মনে মনে বলিল: 'যাত্রা হল শুরু'। কোথায়? কিছুই ঠিক নাই। এই সকাল বেলাকার ধৌত মসৃণ রৌদ্রস্নাত কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীটের উপর দিয়া যাত্রা শুরু হইল আবার; বীডন স্ট্রীট শেষ হইল। চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর প্রশস্ত রাজপথ দিয়া যাত্রা শুরু হইল আর-একদিনের।...আর-এক দিনের যাত্রা শুরু হইল তোমার···চৈত্রের এমন সুন্দর প্রভাতে এই পথে আর ফিরিয়া আসিবে কি, অমিত? এই অমিত এমন করিয়া দেখিবে এই বাড়িঘর—এই যাত্রী মানুষের মুখ, নবজাগ্রত কলিকাতার সুন্দর স্বচ্ছন্দ ছবি? কলিকাতার পথ, কতদিনের সহচর, কত মিছিল জলুসের সাক্ষী সে, কত জনতার নব-জীবনের জন্মস্থল। শত পরিচয়েও যেন তাহার রূপ পুরাতন হয় না। শতবার দেখিয়াও যেন এ দেখার শেষ নাই।

কলিকাতার পথ, কলিকাতার মানুষ,----এই পৃথিবীর আশ্চর্য যুগের আশ্চর্য মানুষ—তোমরা আমাকে পরমাশ্চর্যের পাথেয় জোগাইয়াছ—তোমাদের সকলকে আমার প্রণাম। আমি অমিত, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এই পথ ও আকাশকে সাক্ষী করিয়া আমার অন্তরের প্রণাম রাখিতেছি: তোমরা আমাকে ধন্য করিয়াছ—আমাকে আজও গ্রহণ করিয়াছ এ যুগের মানব-অভিযানের সঙ্গীরূপে, করিয়াছ আমাকে আগামী কালে আস্থাশীল, ভাবীকালের আভাস, 'of the singing to-morrows'। গীতিময়, উৎসবময়, আনন্দময় সেই আর এক-দিনের সূচনা আজ দেশে দেশে,—পৃথিবীর সর্বত্র।

কিন্তু থামিল কেন গাড়ি? কোথায় থামিল? জোড়াসাঁকোর থানা

হইতে কাহারা আসিতেছে ?

আরে এ কে ?

'অমিত বাবু! অমি দা'!

নানাখান হইতে ছাঁকিয়া ইহাদের থানায় জড়ো করিয়াছিল, 'ব্ল্যাক মেরিয়া' তুলিয়া লইতেছে।

'স্বরথ ভট্টাচার্য' : চব্বিশ পরগনার কৃষক সভার…বছর পঁচিশের যুবক,… কর্মী ছেলে, ফর্সা রং রৌদ্রেও ময়লা হয় নাই…সাত বৎসর ধরিয়া নিশ্বাস ফেলেন নাই…যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী…তারপর তেভাগা।…গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে হাজার কাজ লইয়া ছুটিয়াছেন স্বরথ…দুই একটা মামলায় গোড়ার দিকে এক আধবার গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন…জেলও একেবারে অচেনা নয়। কোর্টে সর্বত্র তাঁহাকে লোকে জানে—হাজার ব্যাপার লইয়া বুদ্ধিমান্ স্বরথ ভট্টাচার্য লাগিয়াই থাকেন। কাজ করিতে জানেন, সর্বক্ষণ হাসিয়া কথা বলিতে জানেন, সব চেয়ে বেশি জানেন এই কথা—সহজে কাজ করা যায় না, ধৈর্য চাই। তাই হাসি তাঁহার মুখ হইতে মিলাইয়া যায় না…

কিন্তু মিলাইয়া যায় মুহূর্তের মধ্যে স্বরথ ভট্টাচার্য। 'হাজরাদা' যে! এখানে আসিলেন কি করিয়া?…গ্রামের মানুষ, দক্ষিণের চাষী।

'মহেশ দাস'…বছর ত্রিশের যুবক। কাহার পাল্লায় পড়িয়া ঝুঁকিয়াছিলেন স্বদেশীতে…তারপর অমিত দেখিয়াছে তাঁহাকে সেবার—জেলেই। দেখিয়াছে কতবার চব্বিশ পরগনার গাঁয়ের কৃষক দলে, গ্রামের নানাকাজে। গাঁয়ের স্কুলটাকে হাইস্কুল করার জন্য মহেশ দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করিতে কাল শহরে আসিয়াছিলেন বুঝি? বেশ, আপাতত চলুন জেলে… এদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তো।

কথাটা বলিতে না বলিতে মিলাইয়া গেল। পিছনে ওই কে!

'সৈয়দ আলী'!…একটা হর্ষধ্বনি জাগিল। অমিতও সম্বর্ধনা করিয়া বলিল, 'তাস নিয়েছেন তো? সিগারেট, পান, জর্দা?'

না, পান-জর্দা যথেষ্ট না লইয়া সৈয়দ আলী জেলেও যাইবেন না। 'তিনি না এলে আমরা পান পাব কোথায়? সৈয়দ আলীকে না পেলে আমরা গল্প করব কার সঙ্গে? জেলটা চিনিয়ে দেবে কে? কয়েদিরা মানবে কেন আমাদের?' এতদিনকার জেলের অভিজ্ঞতা সৈয়দ সাহেবের—সেই ১৯২২ থেকে? ১৯৩০এও;—হাঁ, পালাটা একটু দীর্ঘ হইয়াছিল সেবার, সাত বৎসর। ১৯৪০এও আবার; কয়দিন মাত্র। এখন ১৯৪৮এও এবার স্বাধীন ভারতে।

পাকিস্তানে গেলেই পারতেন?

সে কি আমার দেশ? সে তো আপনাদের 'বাঙালদের' দেশ! আমরা চব্বিশ পরগনার মানুষ—সৈয়দ আলী ভয়ানক ক্ষুব্ধ। স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা পুরুষানুক্রমে সংগ্রাম করিয়াছেন। তিতু মিঞার সঙ্গে ছিল তাঁহাদের আত্মীয়তা, যোগাযোগ। সরকার কেন, কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহারা হাত পাতিতে জানেন না।···আলাপী, আয়েসি, লেখাপড়াজানা, সুশিক্ষিত আরবী উর্দুতে, দোরস্ত ইংরাজী বাংলায়, সৈয়দ সাহেব না চাহিলেন লীগের ছায়া মাড়াইতে, না চাহিলেন "কংগ্রেসী মুসলমান" হইতে। হইলেই, হইতে পারিতেন ঢাকায় বা করাচীতে লীগের মন্ত্রী, হইতে পারিতেন কংগ্রেসী মুসলিম—দিল্লীর উজীর ওমরাহদের খাশমুন্‌সি। বাধা কিছুই ছিল না। বিদ্যাবুদ্ধি, পারিবারিক প্রভাব-প্রতিপত্তি,—ছিল সবই। কিন্তু বাধা হইয়াছে নিজের প্রকৃতি—'আঃ, এ কি হয় নাকি? একটা আন্দোলন করছি, সংগ্রাম চালাতে হবে···হয় না।' সংগ্রাম চালাইতে হইবে, তিতু মিঞার দিন হইতে তাহাই তাঁহারা জানিয়াছেন। তাই হইল না অন্য কিছুই করা:—আরামপ্রিয়, আলাপপ্রিয়, আড্ডাবাজ, অমায়িক, সৈয়দ আলীর রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে ছাড়া বাহিরেও বেশি দিন থাকা হয় না। শরীরটা তাই আর সুস্থ নাই; পঞ্চাশে পৌঁছিয়াছেন বই কি। কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ সুপুরুষকে দেখিয়া সকলকে তবু আপনা হইতেই সম্ভ্রম করিতে হয়; কথা বলিতেও ইচ্ছা হয়, আর তারপর তিনি মুখ খুলিলেই জমিয়া যায় আত্মীয়তা।

'বিনোদ ভট্টাচার্য'···আর প্রয়োজন নাই দেখিবার। ইতিহাসের পাতায় ইহাঁরা পদার্পণ করিয়াছেন। ভুজঙ্গ সেনদের বন্ধু ছিলেন তাঁহারা সেদিন, সহকর্মী ছিলেন একালের মন্ত্রিবর্গের···জেল, সংগ্রাম, সংগঠন···আবার জেল, আবার সংগঠন, মৃত্যুর যজ্ঞ। ত্রিশের শেষ যুগ স্বদেশীর···কালাপানি, আর কালা গরদ···ইহাদের এই রক্ত-অভিষিক্ত পথ বাহিয়াই স্বদেশীরথ পৌছিয়াছে লালদীঘিতে আর কালাবাজারের চক্রে। কিন্তু বিনোদ ভট্টাচার্য আবার জেলে ফিরিতেছেন—নতুন ইতিহাসের নতুন পাতা খুলিতেছে ওদিকে। এদিকে তাঁহার পূর্ববন্ধুরা খুলুন পুরস্কার তালিকা—কালোবাজারের পাকা খাতায়।

এ কে? 'মথুরা বাকৃচি?···ইতিহাসের যাত্রাপথের প্রায় চল্লিশ বৎসরের সাক্ষী···কারো চোখে পড়িবেন না এই সামান্য মানুষ—কেহ এড়াইবে না তাঁহার অসামান্য দৃষ্টি। কোন আগে, সেই স্বদেশীর প্রথম পর্বে প্রথম কৈশোরে তাঁহার যাত্রা হয় শুরু···তারপর আলোতে অন্ধকারে, গোপনে গোপনে পথ-চলা···পদে পদে দুঃখের কণ্টকজ্বালা, পদে পদে অবিশ্বাসীর সর্পদংশন, পদে পদে সংগঠনের নতুন স্থাপনা। জেল হইতে জেলে তাঁহার পথ চলে, দেশ হইতে বিদেশে,—কালাপানির পারে, মরুভূমির ছায়ায়। চোখে পড়িল তখন ইতিহাসের নূতন বাঁক, নূতন মোড়। স্বদেশীর পথ মিলিল আসিয়া ইতিহাসের নূতন পথে। আবার যাত্রা। নিঃশব্দ, নিরলস, নিরভিমান, আশ্চয মানুষের আশ্চর্য সংকল্প ফুরায় না।···চলে চলে, চলে···ক্ষীণহাসি, বাক্যকুণ্ঠ মানুষ যেন সকলের দৃষ্টিকে এড়াইয়া গিয়াই এখনো উঠিয়া বসিলেন জেলের গাড়িতে।

জ্যোতির্ময় সেন · 'জ্যোতির্ময়'—জেল আর আন্দোলনের মধ্য দিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তাহার নিঃশেষিত। মণীশের বন্ধু সে, সুধীনের আত্মীয়—মিনতিকে লইয়া ঘর বাঁধিতে গিয়াও যে ঘর বাঁধে নাই। ছুটিয়াছে পথে পথে, কৃষকদের গ্রামে গ্রামে। বারে বারে গড়িতে গিয়াছে পথ পূর্ব-বাঙলার মুসলমান চাষীদের লইয়া, বারে বারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে তাহা মুসলিম লীগ। তবু এতদিন জ্যোতির্ময় ব্যর্থতা বোধ করে নাই···আর আজ

বাঙলী জাতির ঘর ভাঙিয়া যাইতে সেই জ্যোতির্ময় আকুল ঘরের চিন্তায়। মিনতির অসুখ; এখানে চিকিৎসা করানো চাই। কেমন করিয়া হইবে? পাকিস্তানে ফিরিতে পারে না তাই জ্যোতির্ময় সেন। মিনতির আপত্তি যে। মিনতি ছাড়িয়া দিবে না...কি হইবে এখন মিনতির? চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করিবে জোতির্ময় সেনই বা আজ জেলের অভ্যন্তরে বসিয়া?

'বেণু ঘোষ', 'সূর্যনাথ', 'শঙ্কর দয়াল', দেখিয়া, সম্ভাষণ করিয়াও যেন অমিত তাহাদের সম্ভাষণ করিল না। কি করিবে মিনতি এখন?......কি করিবে? চমক ভাঙিল—'কান্তি?' হাঁ, কান্তিই! শ্যামলের বন্ধু কান্তি।

কান্তিলাল চতুর্বেদী—প্রিয়দর্শন যুবক।

প্রাণবান্ যুবক-প্রকৃতি আপনার বিদ্যা ও বুদ্ধি লইয়া যেন তৃপ্ত হইতে পারে না। কাব্য পড়ে, তর্ক করে, ছাত্রদের রাজনীতির সভায় চমক ধরাইয়া যায় বিদ্যুতের মত। তারপর আলোকের মত ছড়াইয়া পড়ে। নাচিয়া বেড়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বারি-বিস্তারে...হাতে কাগজ, মুখে কথা, চটকলে-রেলওয়েতে ডকে···নাই কোথায় সে? এখানে, ওখানে সেখানে, কোথায় নাই কান্তি?···আর সর্বত্র দাবি 'কান্তি কো চাহি'।—বলিতে হইলে চাই, লিখিতে হইলে চাই, অন্য ইউনিয়নকে বুঝাইতে হইলে চাই, অমুকখানে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইলে চাই। কান্তিকে চাই নাচিতে হইলে, কান্তিকে চাই গল্প করিতে হইলে। কান্তিকে চাই চা বানাইতে—পেয়ালা ভাঙিতে। কান্তিকে চাই দাবা খেলিতে—খেলার তর্ক করিতে, কান্তিকে চাই পড়িতে—পড়ার থেকে বেশি কথা বলিতে। মোটকথা কান্তিকে চাই সকলের। আর কান্তিরও তাই সময় হয় না—আম্বালায় তাহার মাকে দেখিবার, আহমদাবাদে তাহার ভাইকে দেখিবার, নৈনিতালে তাহার নতুন বৌদিকে দেখিবার। সময় পাইল কই দুই বৎসরের মধ্যে কান্তি?···কিন্তু এবার তাঁহারা আসিতে পারিবেন ইচ্ছা করিলে এখানে—কান্তি আছে জেলেই, দেখা হইবে।···

অমিতের [illegible] হয় সে একা নয়—

সকল সং[illegible] করিয়েছি আজ অনুভব

আমার আপন মাঝে এ বিশ্বের সত্তার উৎসব—
শুধু জানি শুরু তার যেথায় আমার এককের
শেষ হলো ওঠাপড়া, বারতা পেল সে সমগ্রের।···

ফটক খুলিয়া গেল। সেই পুরাতন বাড়িটা। এখন ঝিমন্ত যেন। অযত্নের চিহ্ন উহার সর্বত্র পরিস্ফুট। সে জৌলুষ ও চমক নাই। অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে অমিত দেখিল ঘরে আরও অনেকে আসিয়াছে—কে-কে? ঘরের অভ্যন্তরে প্রভাতের আলোক তত স্পষ্ট নয়। কিন্তু দিলীপ, অজয় ও আরও বহুকণ্ঠের অভিনন্দন সমুত্থিত হইতেছে তাহাদের উদ্দেশ্যে।

—'অমি মামা!'

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে দ্বার-প্রান্তে। বিস্মিত চমকিত ওষ্ঠে ফুটিয়া উঠিল একটি নাম: 'মঞ্জু!'

দুই

সকাল বেলাকার এক ঝলক আলো আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে—মঞ্জু : গোয়েন্দা আপিসের প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে একটি প্রাণ-চঞ্চল তরুণী।

পরিচিত অনেক কণ্ঠ সমস্বরে অমিতকে সম্বর্ধনা জানাইতেছে—আসুন, আসুন, আসুন। প্রত্যেকটি মুখ ও কণ্ঠস্বরকে চিনিয়া লইবার মত অমিতের সময় হইল না। সমবেত আনন্দধ্বনির মধ্য হইতে একটি কণ্ঠ স্বতোচ্ছসিত প্রাণ ছন্দে অমিতের কানের উপরে ঝরণা-ধারার মত ছুটিয়া আসিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে: 'অমি মামা! অমি মামা!'···

আয়তচক্ষু, উৎফুল্লাধর একটি স্বচ্ছন্দ সজীব কণ্ঠ বিশ বৎসরের পার হইতে ডাক দিল অমিতকে, 'অমিদা!'

সুর-কে অমিতের ভুলিবার সাধ্য নাই।—কাহাকেই বা ভুলিতে পারে অমিত?—

সেই শেষ দেখা হাসপাতালে·· জীবনের এপারে দাঁড়াইয়া যেন জীবনের ওপারের মানুষ। সেই মুখ চোখ কণ্ঠ চক্ষু; তবু সে সুর নয়—চুপ করিয়া যে সুর শুনিতে বসিত অমিতদের সেদিনের তর্ক ও গল্প, 'বলাকার' কবিতা পাঠ। হাসপাতালে যাহাকে শেষ দেখিল অমিত সে যেন তখন সেই সুর নয়, সুর-র ভগ্নাংশ;—অথবা ভগ্নস্তূপ। জীবন-ইতিহাসের ভগ্নস্তূপকে তবু পুনরাবিষ্কার করিতে পারে নাকি একটি নিমেষে অমিত, ইতিহাসের যে ছাত্র···আর জীবন-রসের যে রসিক?···

বহু আত্মীয়-বন্ধুর মত সুরও প্রত্যাশা করিত অমিত বড় হইবে; গুণী মানী হইবে অমিত, সমাজের গুণী মানীদের আসরে আপনার বিধাতৃ-নির্দিষ্ট স্থান সগৌরবে গ্রহণ করিবে। তাহার বিদ্যার খ্যাতির সঙ্গে আসিবে যশ, আসিবে সম্পদ, আসিবে সৌভাগ্য। আর সেই সম্মান-সম্পদের বরমাল্য

গলায় লইয়া অমিত এতদিনে আপনার গৃহে সমাজে পরিণত জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠায় শোভা পাইবে: আত্মীয়দের আশ্রয়, বন্ধুদের আনন্দ, অনুজদের আশা। কোথায় গেল সে অমিত আজ?

সুর-র সে অমিদা যে হারাইয়া গিয়াছে,—জীবনের মহামহোৎসবে সে যে কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়া গিয়াছে,—দশ বৎসর পূর্বেই সুর-র সে বিষয়ে আর কোনো সংশয় ছিল না। দশ বৎসর কেন? বিশ বৎসর পূর্বেই কি সুর জানিত না—অমিত,—সুর-র 'অমিদা'—তাহার আত্মীয়-বর্গের এই পর্যায়ের আশাস্থল—আপনার চিন্তা ও অধ্যয়নের শান্ত, সমাহিত আশ্রয় ছাড়িয়া জীবনের নির্দয় কঠিন ঝঞ্ঝা-বিধূনিত ভয়ঙ্কর পথেই যাত্রা করিয়াছে। তাহার পিছনে পড়িয়া যাইতেছে পিতার স্বপ্ন, মাতার আশা—অমি তাঁহাদের গৃহকে সমুজ্জ্বল করিবে। সুর-র মত স্নেহমুগ্ধ আত্মীয়দের নিষ্ফল অনুযোগ,—'তুমি পি-আর-এস্ হচ্ছ না কেন, দাদা?' ক্রম-ক্ষীয়মাণ অমিতের আপনার অফুরন্ত কৌতূহলের, উজ্জীবিত ঔৎসুক্যের যত প্রশ্ন, যত তথ্য ও যত অজ্ঞাতপূর্ব উত্তর—সপ্তম হইতে নবম শতকের ভারতের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিবে না? ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জাগৃতি কি শুধুই একটা বাবু-বিলাস ও কেরানি-কুশলতা, না, নবযুগের পূর্বাভাস? ভারতীয় ইতিহাসের প্রাগ্-আর্য বনিয়াদ কোথায় আছে লুক্কায়িত—সিন্ধুর উপত্যকায়? না, নর্মদা-তাপ্তির মর্মর-মণ্ডিত তীর-কন্দরে?—অমিতের আত্মীয়-বর্গের আশা, আপনার বিদ্যা-বিমুগ্ধ অন্তরের নিভৃত স্বপ্ন তখনি পিছনে পড়িয়া যাইতেছে, শুকাইয়া যাইতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ বৎসর পূর্বে সেই কথা কি সুর বুঝিতে পারে নাই?

নবজাত মঞ্জুর চোখের উপরে চোখ রাখিয়া সুর নিজের মনে-মনে বলিয়াছে, 'মণি আমার, তোমার নাম রাখবে অমিদা'; অমিদা ছাড়া কেউ রাখতে পারবে না তোমার নাম। কে বা আর রাখতে জানে নাম?' কিন্তু অমিতের উত্তর আসে না,—কথাটা অমিত ভুলিয়া গিয়াছিল। সুর বুঝিতে পারিত অমিত আর সুর-র অমিদা নাই, থাকিবে না। তাহার

কন্যার নাম বাছিয়া দিতেও এখন অমিত ভুলিয়া যায়! স্থর বুঝিয়াছিল, তাই স্থর-র সমস্ত সহাস্য ঔৎসুক্য ও সমস্ত সনির্বন্ধ অনুযোগের মধ্যে অমিত দেখিতে পাইত একটি ব্যথিত, ঈষৎ কুণ্ঠিত মনের স্পর্শও! অমিতের কর্মমুখর দিনরাত্রির মধ্যে কোনো স্থান নাই কি তাহার আত্মীয়-বন্ধুর, তাহার এই আত্মীয়া ভগিনীর স্নেহ-সমৃদ্ধ আশা ও স্বপ্নের? স্বামি-সন্তান-পরিবৃত স্থর-র সাধারণ জীবনের সাধারণ কথার ও সহজ ঘটনার কি সেখানে প্রবেশ নাই —অমিতের জীবন-পরিধিতে?

না, স্থর জানিত ইহাও সত্য নয়, অমিদা স্থরকে অবজ্ঞা করে নাই। কিন্তু সে অমিত, শুধু স্থর-র অমিদা নয়, আরো অনেকের সে; এমনি মানুষ যে সে।

বিশ বৎসর কেন, পঁচিশ বৎসর পূর্বেও ইহা স্থর বুঝিয়াছিল। তখনো ত স্থর প্রায় বালিকাই। প্রথম কৈশোরের নূতন দীপ্তি আসিয়াছে তাহার চেতনায়, জীবনে, চলায় বলায়, চোখে মুখে, দেহে মনে সর্বত্র একটা সপ্রতিভ ঔৎসুক্য। চোখে উগ্রতা নাই, আছে কোমলতা, একটু লজ্জার সঙ্গে সচকিত কৌতূহলের মিশ্রণ। সেই নবার্জিত দৃষ্টি লইয়া অমিতের স্নেহ ও আদর-মিশ্রিত আশ্রয়ে স্থর তখনি চিনিয়া ফেলিয়াছিল অমিতকে —যে-অমিত সকলের বন্ধন মানিয়াও বাধা মানিবে না, যে-অমিত তাহার গৃহকে, পরিবারকে, বন্ধুদের আড্ডাকে, সুখকে, শান্তিকে, বিদ্যাকে, বুদ্ধিকে,—সঙ্গীতের অনুরাগ ও শিল্পকলার অনুভূতিকে,—আপন কল্পনাকেও পরম গরিমা বলিয়া মানিবে না; মানিবে না সে একান্ত করিয়া আপনাকেও। আপনার স্বস্তি ও আরামের মধ্যেও সে চিরদিন অস্বচ্ছন্দ, চিরদিন অধীর চঞ্চল, উচ্চকিত-গতি।

কিশোরী স্থর তখন তাহার বধূ-জীবনে প্রবেশ করিতেছে; আশা আনন্দ স্বপ্ন সৌন্দর্যে তাহার মন থর-থর।

অমিতের নিকট হইতে সেদিন সে উপহার পাইয়াছিল তখনকার দিনের 'বলাকা'। 'বলাকা' [illegible]বার মত বয়স নয় তখন স্থর-র, সেই বিদ্যা নাই

সেই বুদ্ধি নাই। কিন্তু তবু সেদিন অমিতের মুখে তাহারা কবিতা পাঠ শুনিয়াছে—সুর, অমিতের ভাই মনু, বোন শিশু অনু, ইন্দ্রাণী বৌদি। আর কী একটা স্ত যেন সুর বুঝিয়াছিল—অমিত দময়ী অপ্সর-রমণীর সঙ্গে ছুটিয়াছে পরিচিত জগতের ওপারে ঝঞ্ঝা-মদমত্ত-পাখা হংস-বলাকার মত, আপনার ডানা ছড়াইয়া দিতেছে আকাশের পথে পথে :

জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

গর্জিয়া উঠে যেন ঘরের বাতাসও :

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়—

থর থর কাঁপিতে থাকে সুর-রও মন :

ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে—
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।

স্বামিগৃহ হইতে প্রথম ফিরিয়া অমিদার সঙ্গে সুর দেখা করিতে আসিল। প্রথম-প্রণয়ের অনুরাগ আনন্দে তাহার মন ঝলমল। জীবনের পরম বিস্ময় এই প্রথম প্রণয়; তাহা আবিষ্কারের উত্তেজনায় সুর-র কিশোরী প্রাণ অনুরণিত। কিন্তু অমিদা কোথায়? কোথাও বেরিয়েছে। হাসির মধ্য দিয়া সুর-র দুই চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চায়। চাহিবে না? সুর আজ শুধু একা ত নয়, স্বামীও সঙ্গে আসিয়াছেন—আসিবেন অমিদা তাহা জানিতেন। পশুপতি পরিচয়-আলাপ জমাইতে উৎসুক অমিতের সঙ্গে। এই নবপরিণীতা, চ চক্ষু, চাকত-া বধূর মুখে অমিতের নাম ও খ্যাতি ইতিমধ্যেই বার বার [illegible]নিয়াছে—নানা প্রসঙ্গে

শুনিয়া সে কুতূহলী হইয়াছে, আগ্রহান্বিত হইয়াছে। সেই অতি-প্রশংসিত কুটুম্বটির বিরুদ্ধে একটু মৃদু প্রতিকূলতাও বোধ না করিয়াছে তাহা নয়। হয়ত তাই সে আরও দেখা করিতেও চায়। কিন্তু অমিতের সে সাক্ষাৎ পাইল না। অমিতের পিতার সঙ্গে বসিয়া কত আর পশুপতি গল্প করিবে? কিংবা বালক মনুর সঙ্গেই বা গল্প করিবে কতক্ষণ? অমিত কি জানিত না তাহারা আসিবে? মা জানান, জানিত বৈ কি। তাহাদের আগমনের অপেক্ষায় সকাল হইতেই অমিত সাগ্রহে বসিয়া ছিল। তারপর? মা বলিলেন, বন্ধুরা কে আসিল ডাকিতে। কে সে? না, না, পড়াশুনার বন্ধুরা কেহ নয়—যদিও পরীক্ষা অমিতের নিকটেই। না, সুহৃদের গানের মজলিসের ব্যাপারও নয়। হয়ত পাড়ার সেবা সমিতির কেহ হইবে। অমনিতর কোনো একটা দশ-জনার কাজ—অথবা বন্যা বা দুর্ভিক্ষের চাঁদা তোলা প্রয়োজন। হয়ত পাব্লিক লাইব্রেরির মাসিক সভা, কিংবা উহার বার্ষিক সভার আয়োজন করিতে হইবে। অমিত এখনিই আসিবে, বলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বেলা বহিয়া যায়, কোথায় অমিত? অমিতের মা দুঃখিত হইলেন, বাবা বিরক্ত হইলেন—একটা দিনও কি অমিত তাহার 'খেয়াল' বাদ রাখিতে পারে না? জানে পশুপতিরা আসিবে।

পশুপতি সানুকম্প হাস্যে তাঁহাদের সংশয় ও লজ্জাকে উড়াইয়া দেয়,—'হয়ত কোনো কাজে পড়ে গিয়েছেন অমিতবাবু। আসতে পারলেন না। দেখা হবে—আর একবার আমরা কলকাতা এলে।' আর সুর? তাহার সমস্ত গর্ব ও উল্লাস যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইতেছে। সে বলিয়াই তখনো তাহার মুখে হাসি আর কথা লাগিয়া আছে। চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে বাকী ছিল; ফিরিবার পথে গাড়ীতে সেটুকুও বুঝি আর টিঁকে না।

—খুব ত তোমার অমিদা! তুমি ত অমিদা বলতে পাগল, আর দেখাই নেই তার একটিবারও।—বলিল পশুপতি।

সুর আপনাকে রক্ষা করিল, সেই সঙ্গে রক্ষা করিল অমিতের সম্মান।

কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া গর্বের সহিত সে বলিল,—ওই ত অমিদা অমনি। কোথায় কোন কাজ পড়ল কার; আর তখন তার নিজের কাজ, বাড়ির কাজ, সব রইল পড়ে।

এইরূপই অমিতের স্বভাব; আর তাহা বলিয়াও যেন স্বুর-র গর্ব।

যাদের নিমন্ত্রণ করেছেন তাদের কথাও ভুলে গেলেন,—না?

মাথা নাড়িয়া স্বুর বলিল,—ভুলে যাবেন কেন? ওঁর কি কাজের ঠিকানা আছে, না ঝোঁকের শেষ আছে?—হাঁ, স্বুর সত্যই জানে অমিত ভুলিবে না। ভুলিবে না সে—কিছুই।

স্বুর অশ্রান্তস্বরে বলিয়া চলিয়াছে কত কাজ অমিতের। আর স্বুর পিতৃ-গৃহে ফিরিয়াই পত্র লিখিতে বসিল অমিতকে। পত্র ত নয়, অভিমানাহত স্বুর-র দুই-চোখ-ফাটা চোখের জল। অথচ চোখের জলের চিহ্নও নাই তাহাতে। আছে শুধু হাসির রেখা।—'কাজ ত তোমার যা তা খুব জানি। কোথাও বুঝি আড্ডায় বসে গিয়েছিলে? না, ভালো রেঁধেছিল কেউ, ইন্দ্রা বউদি?' কিন্তু হাসি ছাড়া অমিত কি আর কিছু পড়িতে পারে নাই স্বুর-র সেই চিঠিতে?

স্বুরদের গাড়ি ছাড়িবার বেশ পূর্বেই স্টেশনে আসিয়া অমিত অপেক্ষা করিতেছিল—পশুপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ করিবে। সেই কয় মিনিটেও মোটের উপর স্বুর-র হাসিতেই তাহাদের পরিচয় সুসাধিত হইয়া গেল। স্বুর-র অভিমানও বুঝি ঘুচিল। কারণ, স্বুর জানে অমিতের নিকট এই সব 'বাজে কাজ' প্রলোভনের বস্তু। কিংবা স্বুর বিস্মিত হইল না—'কাজই' এখন বড় হইয়া উঠিতেছে অমিতের জীবনে। বিস্মিত সে হয় নাই সেদিন, কিন্তু ব্যথিত হইয়াছিল, অনেকখানি ব্যথাতেই ব্যথিত হইয়াছিল। তাহার সহজ হাসিতেই সে ব্যথা, সে দুঃখকে সেদিনকার মত সে সহজ করিয়া দিল পৃথিবীর সম্মুখে। কিন্তু আগামী দিনের অনেক অজানিত ব্যথাও তাহার নিকট তখনি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছিল।

দিন-মাস-বৎসরের স্রোতে সেই আগামী দিনও দেখিতে না দেখিতে ছুটিয়া

আসিল। সুর-র জীবন বহিয়া চলে ছোট সংসারের সংকীর্ণ খাতে। আর জোয়ার লাগিল অমিতের দুরন্ত জীবনে। তবু সুর দাবি জানাইল—মঞ্জুকে কোলে পাইয়া সুর-র মন তখন আবার পাল তুলিয়া দিয়াছে। অমিদা সুর-র প্রথমজাত শিশুর একটা নাম ঠিক করিয়া দিক। 'ভালো নাম, সুন্দর নাম, মিষ্টি নাম।' আর, 'সাত দিনের মধ্যে চাই উত্তর। না হয় একটু বন্ধই রইবে তোমার ইতিহাসের গবেষণা, কিন্তু আমার পত্রের উত্তর দিয়ো দেরি না করে।'

কিন্তু উত্তর আসে না। অমিদা নাই হয়ত কলিকাতায়। সুর আবার দেখে। সাতদিনের স্থলে তিন সপ্তাহ শেষ হইল। অভিমানী সুর-র দ্বিতীয় পত্রের পরে তৃতীয় পত্র আসিল;—না, প্রয়োজন নাই অমিতের সুর-কে আর পত্র লিখিয়া। শুধু অমিত সুর-কে জানাক কোন নামটা তাহার পছন্দ—'ক্ষেন্তি, :পুঁটি, পদি, কোনটা মঞ্জুর?' হাসিতে ও অভিমানে মিশানো সে পত্রের পিছনে দুইটি ব্যথিত আয়ত-চক্ষু দেখা যায়। অমিত এবার তাড়াতাড়ি জানাইয়াছিল ফেরৎ ডাকে,—'সব নামঞ্জুর, মঞ্জুর কেবল মঞ্জু।' কিংবা 'মঞ্জুশ্রী'—হোক তাহা বোধিসত্ত্বের নাম।'

আজিকার মঞ্জু হয়ত জানেও না তাহার নামের ইতিহাস,—পৃথিবীতে অপর কেহও তাহা জানে না। অমিতেরও মনে থাকিবার কথা নয়। একুশ বাইশ বৎসর কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কোটালের বান ডাকিল এই দেশের জীবনেও,—অমিত সেই উজান বাহিয়াই ছুটিয়াছে। তবু অমিত দেখিতে পায়—আজও দেখিতে পায়···সেই বাঁধা-পড়া সংসারের বাঁধা-ধরা জীবনের মধ্য হইতে ভয়ে ভয়ে আশঙ্কায় উদ্বেগে এক-একবার গ্রীবা বাড়াইয়া সুর-র দুই চক্ষু অমিতের পথ সন্ধান করিতেছে। অমিতের কোলাহল-মুখর দিনরাত্রির তীরে পত্র আসে—'তুমি কি করছ, দাদা? পি-আর-এস্ আর দেবে না তুমি?'—স্নেহার্থিনী গর্বিতা ভগ্নীর সহজ সনির্বন্ধ এই তাড়না। হাসিরও অভাব তাহাতে নাই, তবু একটি ব্যথা ও সংশয়ের সুর ইহার তলায় তলায় বহিতেছে। অমিতের চোখে কি তাহা পড়ে না? কিন্তু পড়িলেও

তাহা দেখিবার মত সময় কই অমিতের?—অমিতের পৃথিবীতে সময় তখন গতি-উন্মাদ।

'বিনয় রায়—এখানকার ইতিহাসের অধ্যাপক—তাঁর পি-আর-এস-এর থিসিস্‌ই নাকি এবার গ্রাহ্য হয়েছে। অমিত পায় নি বুঝি?'—পশুপতির এই জিজ্ঞাসার পিছনে যে বক্র খোঁচাটা রহিয়াছে তাহা অমিতকে কেহ বলে নাই, কিন্তু স্বর নীরবে নতমুখে অশ্রু গোপন করিয়াছে। চেঁচাইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়াছে,—'দ্যাখো, দ্যাখো, মঞ্জুটা কি মুখে দিলে। পাজি মেয়ে'—অকারণে তারপর স্বর বালিকাকে এক চড় দিল।

ছোট ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দ-উজ্জ্বল শিশু-চক্ষু ছাপাইয়া গেল অশ্রুতে।

অকারণ—অকারণ—অকারণ···

সমস্ত পৃথিবীর বেদনা-সমূহের যে কারণ নাই, শিশু মঞ্জু এই বুঝি তাহা প্রথম বুঝিল। তিন বৎসরের শিশু-প্রাণের সেই বিস্মৃত ক্ষোভের ইতিহাস কি শেষ হইয়া গিয়াছে? কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল ভূমিতে অভিমানে ছোট মঞ্জু।

কিন্তু স্বর-রও উপায় ছিল না। মিস্টার বিনয় রায়কে আপ্যায়ন করিতে পশুপতি গৃহে লইয়া আসিলেন। নতুন পি-আর-এস্ তিনি, বিদেশে বাঙালীর পক্ষে ইহা কি কম গর্বের কথা? মিস্টার রায় অমিতকেও জানিতেন। অমিতের নিষ্ঠা নেই। মেয়ে মহলে বাজে কাজে মাতামাতি করে বেড়ায়। স্বর লুচি ভাজে, নিখুঁত হাতে থালা সাজাইয়া দেয়—নিখুঁত কাটিয়া যায় অপরাহ্ণ। তার পর সন্ধ্যায় মেয়েকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়ায় স্বর। অশ্রুমোচন করিয়া বিহ্বল জাগ্রত স্বপ্নে আপনার আহত অন্তরকে শান্ত, বিক্ষোভ-মুক্ত করিয়া লয় ···যদি স্বর ফিরিয়া যায় এখন কলিকাতায়,—খোকা আসিতেছে এখানে—দু'দিন পরে খোকা ফিরিয়া যাইবে কলিকাতায়।···

যদি ফিরে যাই এখন কলকাতায়···কিছু না বলে একেবারে অমিদার সামনে গিয়ে যদি আমি দাঁড়াই—। দু'হস্তের ক্ষিপ্র তাড়না না মেনে

মাথায় তুলে নোব তাঁর পদধূলি। তাঁর চমকিত চক্ষুর সামনে দাঁড়িয়ে বলব,—'এই আমি স্বর। আমি এসেছি,—এসেছি আমার ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে···হাঁ, ঘর ছেড়ে, সংসার ছেড়ে,···না, না, কিছুই ছেড়ে আসিনি। এসেছি সব নিয়ে,—ঘর নিয়ে, সংসার নিয়ে, আমার এই দিন-রাত্রির সমস্ত কাজ আর জঞ্জাল নিয়ে ;—কিন্তু এসেছি, এসেছি তা জেনো। আর জানো কি—এসেছি যে তার কারণ কী? তার অর্থ বোঝ কি?' 'কী কারণ?' 'কারণ'?—না, না, কিছুতেই বলব না বিনয় রায়ের কথা। কিছুতেই বলব না ওঁর এই ব্যঙ্গ, এই খোঁচা। বলব না কারণ। বলব, 'এসেছি; কারণ তুমি—তুমি আমাদের অমিদা—যে ইচ্ছা করলে কী না করতে পার—কেন ইচ্ছা করো না তুমি?—কেন ইচ্ছা করো না তোমার বিদ্যাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে? প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কেন? কী তুমি না করতে পার?'—হাসবে নিশ্চয় অমিদা—হাসবে।······'হাসছ? তুমি বুঝছ না—কিছুই বুঝছ না আমাদের কথা। বুঝতে চাও না, বুঝতে পার না কি? নিশ্চয়ই বুঝতে পার, কিন্তু বুঝতে চাও না। আর আমি স্বর, তোমাকে এই কথাই বুঝোতে এসেছি—হাঁ, বুঝোতে এসেছি তোমাকে—তোমার সাধ্য কি আমার কথা তুমি না বুঝে পারবে? পাঁচশ-মাইল দূর থেকে আমি এসেছি—অনেক জ্বালা আর জঞ্জাল সত্ত্বেও এসেছি,—তোমাকে বুঝতে হবে—তুমি আমার কথা বুঝবে, অমিদা। বুঝবে, বুঝবে'···

সেই স্বপ্ন—শেষ পর্যন্ত একখানা ছোট চিঠির মধ্যে সাধারণ অনুযোগেই শেষ হয়। স্বর-র অশ্রুধৌত মন আপনার হাসি আর দাবি লইয়া একটি একান্ত প্রশ্নে আপনার কথা বুনিয়া তোলে, 'তুমি পি-আর-এস দিচ্ছ না কেন, দাদা?'

স্বর-র চারিদিকে জীবন নিস্তরঙ্গ। ইংরেজ বণিকের অপিসে তখন পশুপতি পদ-মর্যাদা-ভালো দক্ষিণা লাভ করিতেছে, কেন অমিতের নামের সঙ্গে অকারণে নিজেকে সে বিজড়িত করিবে? স্বর আপনার ঘরে স্বাচ্ছন্দ্য

আর সৌন্দর্য কি ফুটাইয়া তুলিবে না—তুলিবে বৈ কি! তুলিতেছেও। কিন্তু সুর-র হাসি আর সহজ নাই। তাহার কোল আলো করিয়া আসিল পুত্র, আর সাতদিন পরেই কোল অন্ধকার করিয়া সেই শিশু চলিয়া গেল। সুর-র চোখও অন্ধকার হইল। একটা গভীর কঠিন ব্যাধিও তখন হইতে তাহার দেহের মধ্যে অতি ধীরে, অতি অগোচরে বাসা বাঁধিল। কেহ জানিল না; কাহাকে সে বলিবে আপনার কথা?—কেহও নিকটে নাই। অমিতকেই লিখিতে হয়—আপনার লোক আর কোথায় সে ছাড়া? কিন্তু, না, পীড়া-বেদনার কোনো কথা সুর তাহাকে জানাইবে না।

কিন্তু কেমন যেন কলম কাঁদিতে চাহে। সংসারে সে ভাগ্যবতী;—কাঁদিবে কেন তাহার কলম?—সুর ভাগ্যবতী। তাহার শ্বশুর, শাশুড়ী ও আত্মীয়দের অনেকের চক্ষে প্রায় অন্যায়রূপেই সে ভাগ্যবতী। কি আছে সুর-র যোগ্যতা যে, সে কানপুরের ব্রিটিশ ইন্‌ডাস্ট্রিজ্‌ লিমিটেডের অ্যাসিস্টেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার মিস্টার পি, গ্যাংগুলির স্ত্রী হয়? লাভ করে এই গৃহের গৃহলক্ষ্মীর পদ—এত সম্মান, এত সম্পদ, এত সৌভাগ্য? অযোগ্যই সুর তাহার স্বামীর ও তাহার শ্বশুরবংশের, অযোগ্যই সে এই সৌভাগ্যের।

শুধু অযোগ্য নয়, সে অপরাধিনীও। এই সম্পদ-সম্মানের মধ্যে কোথায় তাহার গম্ভীর মর্যাদাময় কর্ত্রীত্বপনা ও স্থিরগর্বিত পদবিক্ষেপ? হাঁ, সুর তাহার এক কালের মমতাভরা কণ্ঠ হারাইয়া ফেলিয়াছে; উৎফুল্ল হাসি ভুলিয়া গিয়াছে; সেই অকারণে ঔৎসুক্য, সকলের জন্য সহমর্মিতা সংহত করিয়াছে। না, আগেকার মত চঞ্চল নাই আর সেই সুর। তাহার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি ভারী হইয়াছে, চরণের চঞ্চল গতি সংযত হইয়াছে, উৎফুল্ল ওষ্ঠের হাসি এখন ম্লান হইয়াছে। সে গৃহিণী হইয়াছে,—সংসারের স্বাভাবিক নিয়মকে সে অস্বীকার করিবে কি করিয়া? উহা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই। স্বামীর বিশিষ্ট অভ্যুদয়ের পক্ষে যে সে আপনাকে উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহা নয়। সে যোগ্যতা সুর-র কোথায়? এ সংসারে লক্ষ্মী নূতন করিয়া আবির্ভূত হইতেছেন। সেখানে হাস্যমুখে

আগু বাড়াইয়া তাঁহাকে সাদরে আপ্যায়ন করিবার মত গৃহিণী না থাকিলে কি চলে? কিন্তু স্বর যেন সেই লক্ষ্মীকে স্বাগত করিতে জানে না,—শুধু তাঁহাকে মানিয়া লয়। নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম মনে তাঁহার আসন পাতিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করে। গৃহের ভৃত্যদিগকে সে প্রভুত্বের সহিত হুকুম করিতে পারে না। প্রতিবেশিনীর সঙ্গে আপনা হইতে আলাপ করিতে আগাইয়া যায়। আবার পিছাইয়া আসে সংশয়ে। তাহার অন্যদের সঙ্গে মেলামেশায় একজন বড় অফিসারের পরিবারের মত আত্ম-সচেতন গর্ব কোথায়? যাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারে না মিশিতে গলে সে 'খেলো' করিয়া ফেলে নিজেকে; যাহার তাহার সঙ্গে মিশিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে 'গ্যাংগুলি সাহেবের' প্রেস্‌টিজ।

স্বর নিজেকে তাই গৃহ-প্রয়োজনে সঁপিয়া দেয়! ত্রুটি ঘটিতে দিবে না; —না, না, ত্রুটি ঘটিতে দিবে না সে এই সংসারে নিজের আয়োজনে, তাহার অভিপ্রেত-অনভিপ্রেত দিন-রজনীর এই কঠিন, নিরর্থক ব্রতে।

তবু ত্রুটি ঘটিয়া যায়। ঘটিবে না কেন? নিজেরই অগোচরে হঠাৎ মাথা তুলিয়া বিদ্রোহ করিবার স্বপ্নও স্বর দেখে।—পশুপতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্থির চক্ষে স্থির কণ্ঠে আজ বলিবে—'তোমার এ সংসার, এ সম্পদ, এ তোমার 'নতুন কপাল।' এর থেকে আমাকে মুক্তি দাও, ছুটি দাও। আমাকে আমি হতে দাও, আমি হতে দাও।'······চমকিয়া উঠে স্বর— —কাহার কথা সে আবৃত্তি করিতেছে? কাহার কথা? ইহা তো তাহার উক্তি নয়। বুঝি অমিতের নিকট শোনা কোনো গল্পের নায়িকার। বুঝি ইন্দ্রাণীর—যে ইন্দ্রাণীকে স্বরও ভালোবাসে—জানে তাহার মন উজ্জ্বল। তাহা উদার। তবু স্বর-র কোনো দিন ভালো লাগে নাই ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহ। ইন্দ্রাণীর আস্ফালন, পুরুষের সমাজে অত কুণ্ঠাহীন দৃপ্ত আচরণ সে মানিতে পারে নাই; এখনো মানিতে পারে না—'ইন্দ্রাবৌদি'র আত্ম-প্রকাশের নামে আত্মপীড়ন। 'প্রগল্‌ভা, দর্পিতা, আত্ম-সর্বস্বা ইন্দ্রাণী'—সুধীরা বলিয়াছে, 'আপনার জিদ, আপনার বাহাদুরি ছাড়া কি আছে তার বিদ্রোহের কারণ?'

সুধীরা কি করিয়া জানিবে সংসারের দুর্ভোগ,—ও জীবনের দুর্যোগ?—যে দুর্যোগে সুর আহত, ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পড়িতেছে, পৃথিবীতে কেহ কি তাহা জানে?—জানে তাহা সুধীরা? জানে ইন্দ্রাবৌদি? সুর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া তাহা জানিবে নাকি অন্য কেহ? সুর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে; তাই বলিয়া সুর বিদ্রোহ করিবে নাকি? না, সুর আত্মসর্বস্ব নয়। এত স্বার্থপর দর্পিতা কেন হইতে যাইবে সুর? সংসারের কাছে নিজেকে সে সঁপিয়া দিতে পারে।

মঞ্জুকে সুর কাছে টানিয়া লয়। তাহার ভাগ্যলিপি সুর জানে, গৃহ-কর্তব্যের পবিত্র ব্রত সে মানে। সে বোঝে—নিজেকে বুঝাইতেও পারে—সংসারে সে অনেক পাইয়াছে--সত্যই অনেক পাইয়াছে। পাইয়াছে পশুপতির মত স্বামী—কর্মী মানুষ, সম্মানিত মানুষ সে; পুরুষের মত আপনার ভাগ্যকে সে আপনি আয়ত্ত করিতেছে। বুদ্ধি দিয়া, পরিশ্রম দিয়া, কৌশল দিয়া, আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনে পড়ে সুর কিন্তু তাঁহাকে সেইখানে সাহায্য করিতে পারে নাই। তাঁহার গতি-পথকে মসৃণ করিয়া তুলিতে পারে নাই। না, পশুপতির এই প্রয়াস প্রচেষ্টাকে, সাহেবদের প্রতি আনুগত্যকে, সুর ঠিক-মত বুঝিতেও পারে না। সুর ভাবে—এতটা তোশামোদ উহাদের না করিলেই বা কি? কিন্তু তোশা-মোদ কোথায়? ইহাই যে কৌশল; ইহা যে অফিসের ডিসিপ্লিন্‌ও। না হইলে—কী রকম কড়া মেজাজ, কঠিন প্রেস্টিজ-বোধ গাঙ্গুলী সাহেবের! সুর তাই এইদিকে পশুপতিকেও বুঝিতে পারে নাই। সুর' মানে—মনে মনে মানে, বুঝিতে অক্ষম বলিয়াই সে স্বামীকে বুঝিতে পারে নাই। বুঝিতে পারে নাই স্বামীর ভালোবাসার প্রকৃত রূপও—যে ভালোবাসা তাহার তরুণী জীবনে প্রথম বিস্ময় আর রোমাঞ্চ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার কাছে পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল—সে ভালোবাসা যে কত অপরিমেয় তাহাও সুর এই অভ্যস্ত দিনরাত্রির মধ্যে বুঝি ভুলিয়া যায়। কাহার জন্য পশুপতির এই দুর্জয় সাধনা? পুরুষ মানুষ পশুপতি,—উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নতিশীল পুরুষ। পার্টিতে,

মাইফেলে তাহার ডাক পড়িবে বৈকি। ঠিকাদার ব্যাপারী বণিকদের খানাপিনা, নাচগানের আসরে তাহার না গেলে চলিবে কেন? তাই বলিয়া পশুপতি কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? না, বিস্মৃত হইয়াছে তাহার স্ত্রী, কন্যা, সংসারকে, আপনার লোকদের? সুর সংশয়ান্বিত হয়, কিন্তু তখনি আবার বুঝিতে চাহে,—এবং বুঝিতে পারেও—কি জন্য স্বামীর এই প্রয়াস প্রচেষ্টা; নানা বাজে লোকের সহিত এত খাতির আপ্যায়ন? সুর-র জন্যই ত, মঞ্জুর জন্যই ত, তাহার পরিবারের সুখ সম্মানের জন্যই ত। সুর-র মন কৃতজ্ঞতায় পরিপ্লুত হইতে চাহে।

আর সেই কৃতজ্ঞতার বশেই আবার সুর লিখিতে চাহে—কাহাকে লিখিবে? অমিত বড় একা, বড় দূরে এখন, রাজ-বন্ধনে জর্জরিত। এই সুখের দিনে অমিদাকে সে ভুলিয়া থাকিলে বড় অন্যায় হইবে সুর-র। বন্ধন-ব্যথার মধ্যে একটুকু সুখের স্বাদ অমিত গ্রহণ করিতে পারিবে—সুর-র এই সুখ-সৌভাগ্য জানিলে।

সুর চিঠি লিখিতে বসে,- আপন সৌভাগ্যের কথা লিখিতে বসে। লিখিতে লিখিতে কি করিয়া মনে পড়ে এই সৌভাগ্যের মধ্যে তাহার কোল-শূন্য-করা সেই শিশুকে।—আর কি সে আসিবে না? কেন সে আসিল; কেন সে গেল?…কোথা দিয়া আপনার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথায় যেন কি কঠিন ক্ষোভের ও আবেগের তীক্ষ্ণ ঝটিকাঘাত আসিয়া লাগে। সুর আপনাকে সামলাইয়া লয়—অশ্রুসজল কথার ধারা হইতে আপনাকে ফিরাইয়া লয়। অমিতের কথা, তাহার কুশল-অকুশলের প্রশ্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুর নিজের ক্ষোভকে, তাহার উদ্বেগ-বেদনাকে চাপা দেয়।—আর উহারই ভারসাম্য রাখিতে গিয়া অমিতের জন্য, তাহার শুভাশুভের জন্য সুর-র ভ্রাতৃ-মমতা, উৎকণ্ঠা, হৃদয়াবেগ বন্ধন-মুক্ত হয়।

গোয়েন্দা অফিসারের বহু ছাপ খাইয়া সে চিঠি অমিতের হাতের পরিবর্তে ফিরিয়া আসিয়া পৌঁছিল পশুপতির কাছে। হতাশ বিমূঢ় সুর-র উপরে সমস্ত শ্বাপদ-সমাকুল সংসার এবার ঝাঁপাইয়া পড়িল। শুধু সুর

অযোগ্যা নয়, সুর অপরাধিনী; সংসারেরই সে শুধু মর্যাদাহীন নয়, সুর তাহার পাতিব্রত্যেরও মর্যাদানাশিনী।

তারপর? ভগ্ন বিপর্যস্ত অবসন্ন হইয়া সুর আপনার দেহে-মনে ভাঙিয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা তখন বাগ্‌যুদ্ধের পর্বে। মেডিকেল কলেজের ক্যাবিনে সুরকে দেখিতে গেল অমিত। সে যাইতে চাহে নাই। পশুপতির মায়ের অপমানকর ইঙ্গিত পূর্বেই সে জানিয়াছিল, সুর-র অসহ্য গঞ্জনা বুঝিয়াছিল। তবু সুরকে দেখিতে গেল। কারণ, বারে বারে সুর জানাইয়াছে,—একটা কঠিন অস্ত্রোপচার তাহার প্রয়োজন, অমিত কি তৎপূর্বে একবার দেখা করিতে আসিবে?

কিন্তু কাহাকে দেখিল অমিত? সুর কোথায়?···মন্দির ভাঙিয়া পড়িয়াছে, আর কোথায় বা সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতা? একদিন যাহার চক্ষু ছিল সরল বিশ্বাসে সুন্দর, প্রাণের স্বচ্ছতায় নির্মল অতল, সে চক্ষু তাহার কোটরগত, ক্লান্ত বিবশ; হাসিতে গিয়া শঙ্কায় সে ত্রস্ত। সে রঙ নাই, সে রূপ নাই। সেই উৎফুল্ল অধর হাস্যহীন, রঙহীন। সর্বোপরি সেই ঝরণা-স্রোতের মত কণ্ঠ কেমন যেন চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। মন্দির ভাঙিয়া গিয়াছে; সেই ভাঙা-মন্দিরের দেবতাই বা কোথায়?

সুর কিছুই বলিতে চাহিল না, তবু অমিত বুঝিল অনেক। অস্ত্র করিবার কি প্রয়োজন আর? অনেক ক্ষতই ত তাহার জীবনে জুটিয়াছে, এই দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া আর লাভ কি তবে? মিঃ গাঙ্গুলী তখনো কলিকাতায় আসেন নাই, আসিবেন অস্ত্র যেদিন হইবে সেইদিন। তাঁহার তিন দিনের বেশি থাকিবার উপায় নাই। যুদ্ধের সময়, অনেক কাজ এখন কোম্পানির। সাহেবরা নাই, যুদ্ধে গিয়াছে; তিনিই বড় ইঞ্জিনীয়ার। কারখানায় মজুরদের গোলমালও লাগিয়াই আছে। সুরকে একটু নিরাপদ দেখিলেই তিনি ফিরিয়া যাইবেন। 'মঞ্জু আসে নাই?' অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

একটু হাসি ফুটিল স্বর-র। মঞ্জু আসিতে চাহিয়াছিল, স্বর-রও ইচ্ছা ছিল লইয়া আসে। কিন্তু শ্বশুরের তাহা মত নয়—এই সব কাটা-ছেঁড়ার ব্যাপারে অতটুকু মেয়ের থাকা উচিত নয়। পশুপতিরও তাহাই মত। বিশেষত স্বরও বোঝে ক্লাশে মঞ্জুর পড়া-শুনার ক্ষতি হইবে। পড়িতেছে বৈকি। বাঃ! মঞ্জু বড় হয় নাই? পনের পার হইতেছে যে। কন্‌ভেণ্ট স্কুলের উঁচু ক্লাশে সে উঠিতেছে, এক বৎসর পরে সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ দিবে।

—আমরা ত দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না। ওরা যদি তবু তোমাদের কাজে লাগে।—ক্ষীণ ম্লান হাসি ফুটিল স্বর-র অধরের কোণে।

···একটা জীবনের ইতিহাস কি পড়িতে পারা যায় না? পড়িতে কি অসমর্থ ছিল অমিত?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বাড়ি ফিরিল, ভাঙা মন্দির দেখিয়াছ, অমিত। ইতিহাসের ছাত্র তুমি। নালন্দা, তক্ষশীলার ভগ্নস্তূপ হইতে পুনর্গঠিত করিতে পারা যায় সে দিনের মন্দির। মেডিকেল কলেজের মেয়ে-ওয়ার্ডের এই 'বেড্ নম্বর—১৩' হইতে পুনর্গঠিত করিতে পারিবে না তুমি অতীতের স্বরকে?···

ডাক্তার অস্ত্র যথাযথ নিয়মে করিয়াছিলেন, শুধু স্বর-র স্বাস্থ্যই গোল ঘটাইল। তাই একটা বৎসর ঘুরিয়া না আসিতেই সে অতি সহজে সংসার হইতে বিদায় লইল, গাঙ্গুলীদের সংসারের একটা দায় চুকাইয়া দিল।

শাশুড়ী তখন নাই। বৃদ্ধ শ্বশুর গৃহে রহিয়াছেন; আর আছেন কর্মব্যস্ত গৃহস্বামী,—পশুপতির এক মুহূর্তও নিশ্বাস ফেলিবার অবসর কোথায়? বিশেষত, যুদ্ধ তখন জমিয়া উঠিয়াছে। কোম্পানির চাকরি করিতে করিতেই যুদ্ধের দুই একটা ছোটখাটো বিজ্‌নেসে বেনামীতে পশুপতি টাকা ঢালিতেছে। গোপন হইলেও সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়,—মারোয়াড়ী অংশীদারকে বিশ্বাস আছে? কিন্তু কে এই পশুপতিকে দেখে, কে দেখে সংসার? কে তাহার বৃদ্ধ পিতাকে করে সেবা? মঞ্জু? সে পারিবে কেন? সেভাবে সে পালিতা হয় নাই। [illegible], চপল, মেয়ে সে। তাহা ছাড়া

তাহাকে পরীক্ষাও দিতে হইবে কিছুদিন পরে, পড়াশুনা না করিলে সে পাশ করিবে কিরূপে ?

পশুপতির বড় বিপদ হইল। কিন্তু বিজনেস্ ত বিজনেস্ই।

যুদ্ধের বাজার জমিয়াছে। বোমা-পড়া কলিকাতায়ও আবার ভিড় বাড়িতেছে। পূর্ব গোলার্ধের যুদ্ধের বাজার এখানে। চাকরি ছাড়িয়া পশুপতি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়, বিজনেসে সে প্রকাশ্যে নামিতেছে। বালিগঞ্জের বাড়িতে পশুপতি একা থাকে। মঞ্জু দাদুর সহিত ঘাটশিলায় রহিল—বোমার এলেকার বাহিরে, অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই সে পরীক্ষা দিবে। তাই বাঙলা ও অঙ্ক শিখাইবার জন্য একজন টিউটর প্রয়োজন। 'অমিত মামার' কথা এই উপলক্ষে বাবাকে মঞ্জুই মনে করাইয়া দিল। 'অমিত ?' পশুপতির বিশেষ মনঃপূত হইল না। মনে হইল অমিত লোকটা লক্ষ্মীছাড়া, সন্দেহ-জনক চরিত্রের। পশুপতির সংসারে অবশ্য গোলযোগ সে ঘটায় নাই। সে দোষ স্বর-রই। বরাবরই স্বর-র মস্তিষ্ক কেমন বিকৃত ছিল; মাত্রাজ্ঞান যেন কিছুতেই জন্মে নাই। শরীরও ছিল তেমনি অপটু—সে ব্যাধিগ্রস্ত হইতেই জানিত। পশুপতির সংসারে সে না দিতে পারিয়াছে শান্তি, না দিতে পারিয়াছে মর্যাদা। 'শী মেণ্ট নো বিজ্‌নেস।' মাথা-ভরতি ছিল ননসেন্‌স্। না, সে দোষ অমিতের নয়। তবে মন্দ না হউক, অমিত লোকটারও মাথা নন্‌সেন্‌সে ভরা। তবে মঞ্জুর জন্য একজন টিচার খুঁজিয়া দিতে সে পারিবে—ওসব কাজে সে-ই ভালো। না, পুরুষ টিচার নয়। একা বাড়িতে বৃদ্ধ পিতা মাত্র থাকেন, সেখানে মঞ্জুর জন্য পুরুষ টিচার পিতারও পছন্দ হইবে না। পশুপতিরও মতে মেয়ে-টিচারই চাই —বৃদ্ধ পিতাকেও সে দেখিবে শুনিবে। পশুপতি পয়সা খরচ করিতে গররাজী নয়; কিন্তু ভালো ঘরের মেয়ে হওয়া প্রয়োজন। তাহার মেয়ের শিক্ষার ভার পশুপতি যে-সে মেয়ের হাতে দিতে পারে না। স্বভাব-চরিত্র ভালো হওয়া চাই। আর ভালো টিচার হইতেই হইবে।—সেও কলিকাতার বোমার ভয় হইতে বাঁচিবে, অধিকন্তু পাইবে ঘা[illegible] খাদ্য ও বাসস্থান।

শোভাদিকে মঞ্জু নিজেই স্থির করিয়া ফেলিল; তাহাদের স্কুলও বোমার ভয়ে ঘাটশিলায় বসিতেছে। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট হইলেও আঁক ও বাঙলায় মঞ্জুকে শোভা সাহায্য করিতে পারিবে, অনু মাসীও তাহা লিখিয়াছেন।

'আপনি অমিত মামা, না?' সভার শেষে একটি মেয়ে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। এ কে? এমন সচকিত চক্ষু, এমন ওষ্ঠাধর এমন স্বতোচ্ছ্বসিত সানন্দ কণ্ঠস্বর—বলে কি?

আপনার কথা অনেক শুনেছি মায়ের মুখে—

তথাপি অমিত বুঝিতে পারে না কে এই বালিকা।

আমি মঞ্জু।

মঞ্জু!—কিশোরী কোমল দৃষ্টি, বুদ্ধিমতী সুর-কে মনে পড়িল; অমিতের বুঝিতে বাকি রহিল না—হাঁ, সে মঞ্জু! সুর-র সেই চোখ, সেই ওষ্ঠাধর, সেই কণ্ঠস্বর, সব— যাহা ভস্মশেষে মিলাইয়া গিয়াছিল যখন শেষবার অমিত সুর-কে দেখে হাসপাতালের ক্যাবিনে,—অনেক দিনে তিলে তিলে উহার সব কিছু তখন লুপ্ত হইয়াছে। সুর কিছুই না বলিলেও তাহার সেই শ্মশান-শেষ রূপ দেখিয়াই অমিত একটি অকথিত জীবনের কাহিনী বুঝিয়া ফেলিয়াছিল; বুঝিয়া ফেলিয়াছিল সেই ভগ্ন মন্দিরের কথা। দেখিতে পাইয়াছিল এদেশের সমস্ত বন্দিনী নারী-জীবনের বহু বহু শতাব্দী-জোড়া ইতিহাসের একটি ছত্র। সেই ইতিহাস অমিতের কত পরিচিত! কত গৃহে না সে দেখিয়াছে—কত চকিতে-দেখা বেদনাতুর নারী-মুখে, কত অবসন্ন, ক্লান্ত নারী-দেহে, আবার কত সালঙ্কারা শৃঙ্খলা-গর্বিতা ফ্যাশান-সর্বস্বার দম্ভেও এই ইতিহাস অমিত পাঠ করিয়াছে।

সেই সুর যেন সম্মুখে।—কিন্তু বিশ-পঁচিশ বৎসরের কালস্রোতের এই পারে সে আর সে নাই। ইস্কুলে কলেজে বাহিরে বিদেশে স্বচ্ছন্দ বিচরণের মধ্য দিয়া সেই এখনকার সুর—বা সুর-র তনয়া মঞ্জু—আর সেই হাস্তময়ী বাঙালী মেয়েটি নাই।—সেই চক্ষু আছে, কিন্তু সে কোমল দৃষ্টি নাই। সেই

উৎফুল্ল অধর আছে, কিন্তু হাসিতে সেই স্নিগ্ধ ছটা নাই। সেই কণ্ঠ আছে, কিন্তু নাই তাহাতে নিভৃত আন্তরিকতা। সেই মুখ, সেই দেহ,—কিন্তু নাই সেই লজ্জানম্র সরলতা, জীবনের সেই গভীরতা। এই মঞ্জু!—চঞ্চলা, প্রখরা, চকিতদৃষ্টি, চকিতগামিনী,—তরুণী নয়—বালিকাই এখনো মঞ্জু!

এই মঞ্জু! আরও ষোল বৎসর পরে এদেশের নারী-নিয়তির বিধানে অমিত হয়ত আবার তাহাকেও দেখিবে ভাঙা-মন্দির। হয়ত বা এমন মন্দির যেখানে দেবতার প্রতিষ্ঠাও হয় নাই কোনদিন—যেখানে পূজা হয় নাই, দেবতার আহ্বান ধ্বনিত হয় নাই—উঠিয়াছে শুধু ফ্যাশানের স্তব! শুধুই পলে পলে নব-নব বিলাসে ফ্যাশানে ভাসিয়া যাইবে চঞ্চলা এই অগভীর-চেতনা বালিকা।...

অমিত ঘাটশিলায় সভাশেষে মঞ্জুকে সেই প্রথম দেখিল। সে খুশী হইল, দুঃখিতও হইল। তারপর মনে মনে একটা দ্বিধাও বোধ করিল—পশুপতি লোকটা 'ভাল্‌গার'। না, মঞ্জু যতই পীড়াপীড়ি করুক, ঘাটশিলায় পশুপতির গৃহে অমিত যাইবে না।

মঞ্জু শুনিল—অমিতের গাড়ির সময় হইয়াছে। এখন যাওয়া সম্ভব নয় কাহারও বাড়ি।

দিন তিনেক পরে অমিতের গৃহে কলিকাতায় মঞ্জুই উপস্থিত আবার: 'আমি মঞ্জু!' তারপর—

শোভাদিকে নিয়ে চলে এলাম—আপনার সঙ্গে দেখা করতে। অনু-মাসী নেই বুঝি? বালিগঞ্জের বাবার কাছে যাইনি? হাঁ, গেছলাম। দেখলাম বাবা নেই। তিনি নাকি দু'দিনের জন্য যশোরে গিয়েছেন,—সেখানে এরোড্রোম তৈরী করছেন। বেয়ারা আর ঠাকুরকে বললাম,—লোকজন আরও কে-কে ছিল চিনি না,—'বোলো মঞ্জুদি এসেছিলেন। রাত্রিতে ফিরে যাবেন আবার ঘাটশিলা।' দিনের বেলা আজ খাবো যেখানে হয়—কলকাতায় ঘুরব। বেশ, আপনাদের এখানেই খাবো। আপনি ত আর গেলেন না। আমিই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে। অনু-মাসী আসবেন কখন? শ্যামলবাবু?

তাহার পরে অনুর সঙ্গে মঞ্জুর ও শোভার কথা আর শেষ হয় না। সহজেই কেমন আপন হইয়া গেল মেয়েটা।

সেই মঞ্জু পাশ করিল; কলিকাতার বোর্ডিংএ থাকিয়া কলেজে পড়িতে লাগিল। পশুপতি তখন যুদ্ধ কণ্ট্রাক্টের এভারেস্ট-অভিযানে অগ্রসর হইতেছে। বাড়িতে নানা লোক, বিজ্‌নেস্‌এর নানা ধরনের মানুষ সেখানে সর্বদা আসে যায়; কেহ কেহ দু'একদিন থাকেও। যুদ্ধের ব্যবসায়ী—সুবিধার লোকও অনেকেই নয়। মঞ্জু একা মেয়ে, এ বাড়িতে থাকিবে কি করিয়া? মঞ্জুও বাঁচিল। বোর্ডিংএর বহু ছাত্রীর মধ্যে সে আপনার স্বচ্ছন্দ স্থান করিয়া লইয়া মহোৎসাহে কলিকাতা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইল।

কয়মাস পরে অনু একদিন জানাইল, মঞ্জুর বাবা আবার বিবাহ করিতেছেন;—সেই শোভা রায়কেই বিবাহ করিতেছেন। কি করিবেন পশুপতিবাবু? তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে দেখিবার লোক নাই; তাঁহাকেই বা কে দেখে? তাহা ছাড়া, পশুপতির বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয়-স্বজনও চাহেন বংশে একটি পুত্রসন্তান থাকুক।

নিশ্চয়ই—হাসিয়া বলিল অমিত।

অনুও হাসিল। বলিল,—আমরা যখন ইস্কুলে পড়ি, শোভাদি তখন আমাদের নতুন টিচার। খুব 'স্বদেশী'। তারপরে কলকাতার ইস্কুলে ছাত্রী আন্দোলন গড়তে নেমেছি। শোভাদিকে বলেছি—'কাজে আসুন।' শোভাদি কান দিতেন সব কিছুতে,—কিন্তু হাত দেবেন না। দেবেন কি করে? ওঁর জীবনের আদর্শ আরও অনেক বড়—মহতের সংসর্গে তিনি জীবনকে বাঁধবেন। আদর্শ এত উচ্চ বলেই তিনি বিয়ে করতেও চান না। বিয়ে করতে তাঁর আপত্তি নেই, মা হতেও আগ্রহান্বিতা। কিন্তু বিয়ে করলে বিয়ে করতেন তিনি হিটলারকে কিংবা আইনস্টাইনকে; গান্ধীজিকে কিংবা রবীন্দ্রনাথকে;—রবীন্দ্রনাথ তখনো বেঁচে ছিলেন।

অমিত হাসিল, সুভাষ বোস্‌-জওহরলাল পর্যন্ত নামতে রাজী ছিলেন না বোধ হয়?

না।—অনু হাসিতে লাগিল।

আগা খাঁ?

বলা যায় না,—হাসিতে লাগিল অনু।

সো, এখন মিসেস্ পশুপতি গাঙ্গুলী—পশুপতি সকলের সমাহার দ্বিগু—না গান্ধীজী, না রবীন্দ্রনাথ, না হিটলার না আইন্‌স্টাইন্—কিন্তু ওয়ার কণ্ট্রাক্টের এ্যাড্‌ভান্‌চারার। কিন্তু সে না হয় হল, মঞ্জু করছে কি?

কি করবে? খবরটা তোমাকে দিতে সে-ই এসেছিল। একটু কেমন-কেমন লাগছে হয়ত তারও; কিন্তু ভাবে তা বুঝলাম না। পশুপতিবাবুর ও শোভাদি-র কোষ্ঠীতেও নাকি মিলে গিয়েছে, পশুপতিবাবু বিচার করিয়ে দেখেছেন। মঞ্জুই একথা বললে। বিজ্‌নেস এখন খুব ভালো চলছে পশুপতি-বাবুর। মঞ্জু বললে, 'বিয়েতেও দুদিনের বেশি সময় দিতে পারবেন না, বাবা।'

অমিত হাসিল: মঞ্জুও দেখছি বিজ্‌নেস-লাইক্।

...সুর-র মত তাহার চোখ, মুখ, গলা; কিন্তু সে সুর নয়! বরং মঞ্জুও পশুপতিই, সে বিজ্‌নেস্-লাইক্। বাপের বিবাহও 'বিজ্‌নেস্-লাইক্' রীতিতে সে গ্রহণ করিতেছে—যেন ইউরোপ-আমেরিকার মেয়ে। আশ্চর্য দেশ! যার পিণ্ডদানের জন্য বংশরক্ষার দাবিও শেষ হয় নাই, অথচ কোষ্ঠী মিলাইয়া প্রাগ্-দাম্পত্য পূর্বরাগকেও পাকা করিতে হয়; আবার দুইদিনের বেশি সময়ও আর বিবাহে ক্ষেপণ করা সম্ভব নয়—বিজ্‌নেস্এর তাড়া যে বড় প্রবল।—একই সঙ্গে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক আর একবারে বিংশ শতকও,—সব তালগোল পাকানো। মঞ্জুও একই সঙ্গে সুর আর পশুপতি; আর সব তালগোল পাকিয়ে—শেষ পর্যন্ত কি সে? দিনে দিনে তুষানলে ভস্মীভূত সুর কিংবা—ললিতা?...সংসারের দাহে, দগ্ধ, তিক্ত, বিরক্ত সদা-খেঁকানো শিল্পী [illegible] একদা-তন্বী, অধুনা শাঁখচুন্নী প্রেয়সী—পূর্ণিমা? হাকিম স্বামীর ঐশ্বর্যবাহিনী, শৈলেশের পদ-গর্বি[illegible]স্ত্রী পুঁটু—এখন যে প্রতিভা? কিংবা, খুব বেশি হইলে বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠা-শিকারিণী প্রচার-কামিনী

মিসেস সেন চৌধুরী?…অথবা সব ছাড়াইয়া, সব হারাইয়া পেটি-বুর্জোয়ার বিদ্রোহের উন্মাদনায় উন্মত্তা, বিক্ষুব্ধচিত্তা, বিক্ষিপ্ত-চেতনা ইন্দ্রাণী?…

কিন্তু আপাতত শুধু scatter-brain বিক্ষিপ্ত-বুদ্ধি মঞ্জু! কথা বলিতে গেলে চেঁচাইয়া উঠে, চলিতে গেলে ছুটিয়া চলে, হাসিতে গেলে ঢেউএর মত লুটাইয়া পড়ে।…

বলিতে গেলে চেঁচাইয়া-ওঠা, চলিতে গেলে ছুটিয়া-চলা, আর হাসিতে গেলে ঢেউএর মত লুটিয়া-পড়া এই মঞ্জু অমিতের চোখে তবু প্রশ্রয়ই পাইয়া গিয়াছে,—কারণ সে সুর-র মেয়ে। বালিকা, নিতান্ত বালিকা। হাসির, কথার, চলার-বলার তুফানে চড়িয়া সে যে অমিতের-অনুর কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছিই ফিরিতেছিল, অমিতের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। কিন্তু একদিন অমিতের নিকট পশুপতি আসিয়া উপস্থিত হইল—মঞ্জুকে একি প্রশ্রয় দিতেছে—অমিতেরা?

কি ব্যাপার?—অমিত জিজ্ঞাসা করে।

কেন জানা নাই নাকি তাও তোমার?

পশুপতি বেশ জানে—লোকটা এমনি পাকা বদমায়েস। ঠিক সুর-র সঙ্গে সম্পর্কেও অমিত এমনি একটা সরলতা ভান করিত। পশুপতি মনে মনে জ্বলিয়া গেল। কিন্তু সে কাজ পণ্ড করিতে আসে নাই। 'আই নো মাই বিজ্‌নেস্! এত লোককে ম্যানেজ করি, আর তুমি, অমিত? দেখছি।'

মুখে পশুপতি একবারে আত্মীয় হইয়া গেল। 'ফাইব্ ফাইব্ ফাইব্' সিগারেটের কৌটা খুলিতে খুলিতে বলিয়া চলিল: জানোই ত ওর মাথায় কিছু নেই; —ওর মায়েরও ছিল না। মানে ভালোমানুষ ছিলেন আমার ফার্স্ট ওয়াইফ্। সতীলক্ষ্মী সিম্পল্,—তাই অ্যাড্‌ভানটেজ নিত সকলে। তারই মেয়ে ত মঞ্জু। ন্যাচারলি, তাকে দশজনে যাতে নাচিয়ে না দেয় তা দেখা—অ্যাজ্ মাচ্ আমার ডিউটি, অ্যাজ্ ইওর্স। তাই না?

অমিত সে বিষয়ে একমত। কিন্তু কাণ্ডটা কি?

ওসব ফুলিশ্‌নেস থেকে মঞ্জুকে দূরে রাখো ত—এই ছাত্রীদল, ছাত্রদল,

পুত্রদল, কন্যাদল,—কত কি যে সব তোমাদের দল হয়েছে! তুমি পলিটিক্স্ করো, অমিত, সে এক কথা—লেখাপড়া শিখেছ, নামটামও করেছ, এ্যাসেম্ব্লিতে যাবে, কর্পোরেশনে ঢুকবে;—হাঁ, তুমি একটা লাইন ধরেছ। ছোকরারা যে হৈ-চৈ করে, তাও বুঝি। কিন্তু মেয়েদের কেন ও হুল্লোড়?—আর ইয়ংগার্ল্স্‌দের? একটা বিপদ ঘটলে?

ঘটবে—অমিত এবার অবলীলাক্রমে বলিল।

ঘটবে!—বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হইতেছিলেন পশুপতি গাঙ্গুলী। কিন্তু সামলাইয়া লইলেন। হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন: যাক, একবার একটু সীরিয়াস হও ত। সীরিয়াসলি—বলো ত কি করি? তুমি, তোমার বোন—কি নাম তার? অনু? অনুজা?—সে বিয়ে করেছে বুঝি তার ক্লাশ-মেটকে? 'ক্লাশ-মেট্ নয়, সহকর্মী।' এনি ওয়ে, ভিন্ন জাতের ছেলে সে। তা যাক।—তোমরা কলকাতায় আছ, তাই আমি একরকম নিশ্চিন্ত। নইলে কলকাতায় কে কাকে চেনে? সাংঘাতিক জায়গা। তোমাদের থেকে মঞ্জুর আপনার আর কে আছে? আমি তাকে দেখি কখন? বিজ্‌নেসই দেখে উঠতে পারি না। আমার ওয়াইফ্, মানে মঞ্জুর নতুন মা, কি সব শোনেন কার কাছে, তিনি মঞ্জুর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। বলেন, 'বোর্ডিংএ থেকে কি করে-না-করে মঞ্জু জানি না। এখন নানা রকমের দল আর পলিটিক্স্।' মঞ্জু নাকি জুটেছে কমিউনিস্টদের দলে। আমিই বা এ-সব কি জানি? তবে জানি—ঠিকই হচ্ছে। যুদ্ধে তোমরা কো-অপারেট করছ, গবর্নমেন্টও তোমাদের ব্যাক্ করছে। অ্যাণ্ড ইউ আর ডুয়িং গুড্ বিজ্‌নেস্। তা ছাড়া তুমি যখন আছ কমিউনিস্ট—তখন মঞ্জুর জন্য আমি কেন ভেবে মরি? কিন্তু দ্যাখো, এ শহরে এদিনে যখন-তখন যেখানে-সেখানে মেয়েদের ঘুরে বেড়ানো আমি ভালো মনে করি না। এ কথাই বলেছি কি সেদিন অমনি চটে উঠে মঞ্জু বাড়ি থেকে চলে গেল। কিন্তু আমরা হিন্দু; সমাজ, সংসার আছে, দুদিন পরে ওর বিয়ে হবে; বাজে মেয়ের মত পথে পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালে ভালো ঘরে বিয়ে হবে আর ওর? কেমন, ঠিক না?

অমিত জানাইল, ঠিকই।

তাহলে—নাউ কাম টু বিজ্‌নেস্। কি করবে তুমি?

অমিত বুঝিতে পারিল না বিজ্‌নেস্‌টা কি।

হাসিয়া পশুপতি বলিলেন,—আই লিভ্ হার টু ইউ। তুমি আর তোমার বোন—কি নাম যেন তার? অনু, হাঁ অনু।—বেশ, তোমাদের উপর ভার রইল মঞ্জুর।

অমিত আপত্তি করিল, এ অন্যায় কথা, মিস্টার গাঙ্গুলী। মঞ্জু আপনার মেয়ে, তার দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে চাইলে হবে কেন?

কিন্তু পশুপতি তাহার আপত্তি কানেই তুলিল না। হাসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল: ওসব আমি ভাবতেই টাইম্ পাব না। কথা বেশি বলেই বা কি হবে?

অমিত ও অনুকেই মিঃ গাঙ্গুলী মঞ্জুর 'ভার' দিবেন।

অমিত নিজের পরিচয়-পরিধি হইতে মঞ্জুকে আরও দূরে রাখিয়া দিল। তাহাতে অসুবিধা ছিল না। কলিকাতার কোন কলেজের এক ছাত্রী মঞ্জু আর কোথায় নানা কাজে, গ্রন্থপ্রচার ও সম্পাদনায়, নানা আড্ডায়, গল্পে, সভায়, সমিতিতে সদা-ব্যস্ত অমিত। তবু মাঝে মাঝে সেই ত্বরিত-চরণা বালিকা অমিতের কার্যক্ষেত্রের সীমানায় আসিয়া পড়িত, জানাইয়া দিত--মঞ্জু বেশি দূরে নাই। অনুর কার্য ও কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ত তাহার স্থান আছেই, অমিতের কার্যক্ষেত্রের মধ্যেও সে আপন অধিকারেই আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু অমিত তাহার সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজ রাখিত না। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশ 'স্বাধীন' হইতেছে। আন্দোলনের ধাপে ধাপে পা ফেলিয়া মঞ্জু কোথায় দাঁড়াইয়াছে হয়ত অনুর মুখে অমিত তাহা শুনিতে পারিত, কিন্তু সেদিকে তখন তাহার দৃষ্টি নাই। ইতিহাস যে এই দেশে জোর কদমে পা বাড়াইতেছে! হঠাৎ পথে অমিত দেখিল উনত্রিশে জুলাই মিছিলের মধ্যে এম-এ ক্লাশের ছাত্রীদের নেত্রী মঞ্জু। চুল উড়িতেছে, মুখে চোখে অক্লান্ত উদ্দীপনার সঙ্গে শ্রান্তির কালো দাগ। অজস্র হাসির মধ্যে তাহা এখনো মিলাইয়া যাইতেছে, তবু একেবারে তাহা অদৃশ্য থাকিবে না,—যেমন অদৃশ্য নাই আজ তাহা অনুর

চোখে, অন্থর মুখে—এই উনত্রিশে জুলাইর বিরাট-জনস্রোতের মধ্যে। পৃথিবীর কাছে অন্থ পরাজয় না মানিয়া অনমনীয় তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে,—কিন্তু পৃথিবীর কে চিনিবে তাহাদের সেই শ্রী, তাহাদের তেজো-দ্দীপ্ত মহিমা, তাহাদের ক্রমক্ষয়িত রূপস্বাস্থ্যের ইতিহাস? ইতিহাসের কি ঐশ্বর্য কিনিতে গিয়া কি মূল্য দিতে হইবে জানে কি তাহা তাহারা—এই চঞ্চলা, অগভীর-চিত্তা এ-কালের মঞ্জুরা?

…ইতিহাসের কোন মূল্য কি ভাবে আদায় হয়, তাহা কি তুমিই জানিতে সেদিন, অমিত?—আপনাকে চকিতের মত জিজ্ঞাসা করিল অমিত।—পনের দিন শেষ হইতে না হইতে ভ্রাতৃরক্তের স্রোতে ডুবিয়া গেল কলিকাতার সেই বৈপ্লবিক ভ্রাতৃত্ব। তারপর নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব। আর ইতিহাসের সমস্ত সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া খণ্ডিত হইয়া গেল তোমার ভারতবর্ষ, খণ্ডিত হইয়া গেল তোমার বাঙলা, অমিত!—আর তুমি—তোমরা?

অমিতের বুক জ্বলিতেছিল সেই দাঙ্গাতে, দেশ-বিভাগের ক্ষতে—কোথায় তখন মঞ্জু, কোথায় তখন পশুপতি?

ভুলিবার উপায় রহিল না। মাস দুই পরে আবার পশুপতি আসিলেন। কথাটা পরিষ্কার করিয়া না লইয়া তিনি যাইবেন না। গেলেনও না। অমিতের কাছে কথাটা তিনি পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে চান—মঞ্জু কি তাহার পিতার কথা শুনিবে, না, শুনিবে অমিতদের কথা? না, না; অমিত কথাটা এড়াইয়া যাইতে পারিবে না। এই প্রশ্নের উত্তর দিক সে, স্পষ্ট করিয়া উত্তর দিক। মঞ্জুর বয়স হয় নাই নাকি? তাহার বিবাহ হইবে না? সে বিষয়ে কি ভাবে না কিছু মঞ্জু?—এখনো যে যত নাম-না-জানা ছোকরাদের সঙ্গে সে নাচিয়া বেড়ায়? অমিত ইহার কিছুই জানে না—পশুপতি এই কথা বিশ্বাস করিবেন কি করিয়া? চির জীবনই অমিতের নীতি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি', 'ডুবিয়া ডুবিয়া জল খাওয়া'। কিন্তু পশুপতি সমাজ-সংসার মানেন, বিবাহ মানেন, সতীত্ব মানেন, মেয়েদের লজ্জা-সরমের প্রয়োজনীয়তা আছে মনে করেন। আজ ইহার সঙ্গে, কাল উহার সঙ্গে প্রেম করিয়া বেড়ানো এই দেশের মেয়েদের আদর্শ নয়;—

রুশিয়ায় চলিতে পারে, ভারতবর্ষে চলিতে পারিবে না। অন্তত পশুপতি ইহা চলিতে দিবেন না। মঞ্জুকে হয় তাহার কথা শুনিতে হইবে, না হয় পিতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে হইবে।

ব্যাপারটা কি ?—অমিত বিরক্ত হইতেছিল।

কেন, অমিত, জানো না নাকি ?—ন্যাকা সাজিতেছ যে ?—অবশ্য ন্যাকা সাজা অমিতের পক্ষে নতুন নয়।—পশুপতি আপনার উষ্মা গোপন করিলেন না। কিন্তু থামিলেন, অমিতকে বলিলেন,—মঞ্জুর জন্য তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন। কথা এখনি পাকা হইতে পারিত।—চা বাগানে অগাধ সম্পত্তির মালিক তাঁহারা। কৌলিন্যেও পাল্টা ঘর।

হাসি গোপন করিয়া অমিত বলিল, কিন্তু কোষ্ঠী ? কোষ্ঠী দেখিয়েছেন ?

কোষ্ঠীতেও মিলিবে—ভালো ছেলে। বি-এ পাশ করিয়া ছেলেটি বিজ্‌নেস্ দেখে—না হয় বিলাত ঘুরিয়া আসিবে। কিন্তু মঞ্জুকে বিবাহের কথা বলিতেই সে ক্ষেপিয়া গেল—সে বিবাহ করিবে না। যেন বিবাহ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে ? পশুপতি তবু ভাবিয়াছিলেন তাঁর 'ওয়াইফের' কথামত মেয়েকে একটু সময় দিবেন—মাথা ঠাণ্ডা হউক মঞ্জুর। কিন্তু ইতিমধ্যে কি কনফারেন্‌স্ হইতেছে অমিতদের—বিদেশের মেয়ে-পুরুষ আসিতেছে। তাহাতে মঞ্জু কয়েকটা ছোকরার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পশুপতির বাড়িতেই একটা আপিস খুলিয়া বসিতেছে। পশুপতি আসামে ছিলেন—বৎসর দুই পূর্বে যুদ্ধ থামিতেই বিজ্‌নেসে একটা ভারী লস্ দিতে হইয়াছে। এখন যুদ্ধ নাই; নানা দিকে তাল সামলাইতে তিনি ব্যস্ত। তাঁহার 'ওয়াইফ্' থাকেন বালিগঞ্জের বাড়িতে, তাহার 'মাদার ইন্ ল'ও এখন আছেন সেখানে। তাঁহাদের কাহাকেও বলা-কওয়া নাই; আপনার খুশিমত মঞ্জু বাড়িতে সভার ব্যবস্থা করিতেছে! বলে, "তোমাদের মহলে হাত দিচ্ছি না। ভেতরের দিকের এ দুটো ঘরেই আমাদের হবে,—আমাদের আলোচনার কথাবার্তার জন্য একটা গোপন জায়গা চাই।" পশুপতি শুনিয়া সন্ত্রস্ত ও রুষ্ট হইয়াছেন,—এই বাজারে পুলিসের খাতায় নাম উঠিলে গবর্নমেণ্ট

কণ্ট্রাক্টগুলিও যাইবে। গোপন জায়গা যেখানে খুশি হোক্, কিন্তু পশুপতির বাড়িতে না। 'ওয়াইফের' নিকট হইতে খবর পাইয়া পশুপতি তাই অমিতের নিকটে আসিয়াছিলেন। ওই দুই-তিনটা ছোকরার সঙ্গে মঞ্জুর সম্পর্ক কি, তাহা জানিতে পারেন কি পশুপতি?—অমিত কিছু জানে না? জানি না মানে, বলিবে না? সে না বলুক, খুব বিশ্বাসী লোকের নিকটেই পশুপতি সব কথা জানিতে পারিয়াছেন। কিন্তু একটা নয়, দুটা নয়, গুচ্ছের ছোকরার সঙ্গে যে মেয়ে ইয়ার্কি-ফক্কুরি করিয়া বেড়ায়, কোন ভদ্রলোকের ছেলে জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে? তাহা ছাড়াও অনেক কথাই ভাবিতে হয় পশুপতির।—তিনি ত সমাজে থাকেন। কাল যদি মঞ্জুর একটি ভাই হয়—সে সম্ভাবনা যখন হইয়াছে—

অকস্মাৎ অমিত কৌতুক বোধ করিল: তাই নাকি? তা হলে খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন আমাদের।

কিন্তু পশুপতি পথভ্রষ্ট হইলেন না: বিধাতার হাত। যখন মঙ্গলমত সব হইবে, তখন সবই পশুপতিকে করিতে হইবে,—তিনি সমাজে থাকেন। পরিবারে অন্য দশজন আছে। এই সব কথাও মঞ্জুকে তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারিলেন না। অমিতকেই তাই পশুপতি জানাইতেছেন—পারিলে অমিত বুঝাক মঞ্জুকে। না হইলে আর পশুপতি কি করিবেন? মঞ্জু যদি ইহার পরে বাড়ি ছাড়িয়া যায় যাইবে। সেজন্য বাড়িটাকে ত 'কমিউনিস্টদের কেলিকুঞ্জ' করিয়া ফেলিতে পারিবেন না পশুপতি। বিশেষত তাঁহার স্ত্রীর অবস্থাও এখন ডেলিকেট—ইতিপূর্বে একবার গোলমাল হইয়া গিয়াছে। এইবারও এখন বাড়িতে ছোঁড়াছুঁড়িদের হুল্লোড়। এসব এক্‌সাইট্‌মেণ্ট্, নার্ভাস স্ট্রেন্ তিনি স্ট্যাণ্ড করিতে পারিবেন কেন?

অমিত বুঝিল। জিজ্ঞাসা করিল, মঞ্জুকে তাহলে কোথায় দিচ্ছেন?—বোর্ডিংএ?

আমি দিব কেন? বাড়িতেই সে থাক না। তবে দশটা মেয়ের মত

থাকবে। বৈশাখেই তার বিয়ে হয়ে যাবে। কথাটা বুঝে রাখুন আপনি—'আই মিন বিজ্‌নেস্‌'।

আবার পশুপতি বুঝাইলেন – তিনি মেয়েকে গৃহত্যাগ করিতে বলেন নাই —আর অমিতেরা মঞ্জুকে সেইরূপ প্ররোচনা দিয়াও ভালো করে নাই। কত মঞ্জুর বয়স? প্রয়োজন হইলে পশুপতি অমিতদের বিরুদ্ধে পুলিশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন—ফর এনটাইসিং অ্যাওয়ে এ মাইনর্‌ গার্‌ল্‌।

এবার অমিত হাসিয়া কথা শেষ করিয়া দিল: তা হলে তা-ই নেবেন। কিন্তু তার চেয়ে আপনার এম-এ পরীক্ষার্থিনী 'মাইনর্‌ গার্‌ল্‌টি'কে সসম্মানে বাড়িতে রাখতে চেষ্টা করুন। অবশ্য মেয়ের যদি সত্যই সম্মানবোধ থাকে তা হলে আপনার বাড়িতে সে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

কেন?—পশুপতি অমিতের স্পর্ধায় বিমূঢ় হইল।

সে উত্তর তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। স্ত্রীকে সম্মান করতে জানেন নি; কিন্তু মেয়েকে সম্মান করতে এখনো শিখুন।

পশুপতি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ইতরের মত চীৎকার করিতে গেলেন, এত বড় স্পর্ধা তোমার, অমিত! ভেবেছ তোমাদের বজ্জাতি আমি জানি না—

অমিত উঠিয়া দাড়াইল। বলিল, বাস্‌! থামুন মিস্টার গাঙ্গুলী। জানেন—আমি নাম-কাটা সেপাই—পুলিসকেও ভয় করি না। আমাকে সম্মান করতে না চাইলে আমি তা আপনাকে শেখাতে পারব।—আর একটি কথা বলেছেন ত তা বুঝবেন।

আশ্চর্য সুফল ফলিল এই স্থূল রূঢ়তায়।

অমিতের মনে দ্বিধা ছিল—এই তো তাহার দেহ, এই তো তাহার বয়স, —কড়া কথা বলিতেও সে জানে না। এইরূপ একটা হুমকিতে এই স্থূল-স্বভাব লোকটা থামিবে তো! কিন্তু আশ্চর্য রকমের কাজ দিল তবু তাহার এক কালের জেল-খাটা খ্যাতি। মনে মনে অমিত একবার কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল তাহার সেই জেল-জীবনের দীর্ঘ বৎসরগুলির জন্য, নিতান্ত অর্থহীন '**স্বদেশী**' নামটার জন্যও।

ক্রুদ্ধ পশুপতি নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন। অমিত বাঁচিল। এতদিনে তাহার চক্ষে স্বর-র স্মৃতি যেন ক্লেদমুক্ত হইল।

সেই মঞ্জু মাসখানেক পরে অমিতের চোখের সম্মুখে এখন ফুটিয়া উঠিল একেবারে গোয়েন্দা আপিসের এই প্রায়ান্ধকার ঘরে—'অমি মামা।' আর বহু বৎসরের ওপারের সেই কিশোরী হাস্যমুখী স্নেহার্দ্র-হৃদয়া স্বর-কে যেন অমিত দেখিতে পাইল। শুনিতে পাইল তাহার আত্মীয়তা-ভরা কণ্ঠস্বর 'অমি দা'।···দেখিতে পাইল পঁচিশ বৎসরের একটা দ্রুত চলচ্চিত্র।...ঝড় বহিতেছে চারিদিকে তখন অমিতের—চিন্তার, আলোচনার, তর্কের,—আর নতুন সংকল্পের। মঞ্জুকে দেখিতেই পায় নাই অমিত। পাইলে হয়ত মঞ্জুর অপরিণত উৎসাহের বিরুদ্ধে অমিত তাহাকে সাবধান করিত। অন্তত যাচাই করিয়া দেখিত—চঞ্চলা, উচ্ছ্বাস-প্রবণা এই বালিকা জানে কি কোথায় চলিয়াছে সে? কমিউনিজ্‌ম আর এখন জওহর-জ্যাকেট ও জওহর-লালী বাক্য-বিলাস নয়। কিন্তু অমিতের সে সময় হয় নাই। একেবারে এখানেই দোখতে হইল মঞ্জুকে।

'মঞ্জু!' আর কথা সরিল না অমিতের মুখে। হাত ধরিয়া মঞ্জুর চোখের দিকে সে তাকাইয়া রহিল।—সে চোখ ছাপাইয়া আনন্দের কৌতুকের হাসি উপছাইয়া পড়িতেছে।···কিন্তু সে চোখের মধ্যে কি নাই স্বর-র গভীর সুন্দর বেদনা-ভরা মিনতি—সেই ট্র্যাজেডিরও পুনরাভাস?

মঞ্জু, তুমিও এখানে!—বিস্ময় যেন শেষ হয় না। এই বালিকার এই দুর্বার পথযাত্রায় সত্য আছে কি? না, ইহা তাহার চাপল্য? তাহার মস্তিষ্কহীন উদ্দামতা?

আর আপনার আগেই—হাসিতে মাথা দোলাইয়া বলিল সেই বালিকা মঞ্জু। বালিকা?—'এম-এ পরীক্ষার্থিনী মাইনর গার্ল!'···

আমার আগে? কিন্তু তুমি এলে কেন?

ওরা ট্যাক্‌সি নিয়ে এসেছিল;—সকাল বেলায় একটু হাওয়া খেতে এলাম।—হাসিতেছে সেই দুষ্টু মেয়ে। মস্তিষ্কহীনা বালিকা।

সকলে অমিতকে ঘিরিয়া ধরিতেছে। অমিত যে একেবারে জিনিসপত্র লইয়া আসিয়াছে। হাসিয়া অমিত বলিল, কিছুদিন শান্তিতে বসবাস করবার আশা রাখি। তোমরা কি খালি হাতপায়ে এসেছ নাকি? যাও তা হলে, বিদায় হও। আমি হাতপা ছড়িয়ে বসি একবার।

জন বিশেক ইতিমধ্যেই আসিয়া গিয়াছে। প্রত্যেককে দেখিয়াই অমিত বিস্মিত হইল। মেয়েরাও যে—মঞ্জু, সুজাতা, টুনু, আরও কে কে। ইহাদেরও এখানে দেখিবে, এই কথাটা যেন অমিতের মনে ইতিপূর্বে উদিত হয় নাই।

তুমিও যে, সুজাতা?

কি করব, অমিদা?

তোমাদের মেয়েদের ধরলে?—অমিত মনে মনে ভাবিল—অনুও নিস্তার পাইবে না তাহা হইলে।

ওটাও আর আপনাদের একচেটিয়া রইল না, না?—বলিল কিন্তু সেই মঞ্জু।

অমিত তখনো আসন গ্রহণ করে নাই। মঞ্জুকে হাত দিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া অমিত বলিল, না, আর বসা হল না। বলো মঞ্জু, তোমরা থাকবে, না, আমরা? এখনি চলে যাচ্ছি নইলে,—আর বসব না।

কোথায় যাচ্ছেন?

বাড়ি ফিরে।

সকলে হাসিয়া উঠিল।

মঞ্জু বলিল, জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন দুচার দিন থাকবেন বলে—

তখন কি জানি তোমাকেও ধরেছে ওরা? না, এখনি এদের ডি-সিকে গিয়ে বলছি, 'এবার আমাদের পেন্‌শন দিয়ে দিন, আর কেন?'

বলে দেখুন না।

অমিতও হাসিতেছে।—তোমাকেই যদি ধরে তা হলে আমি বও লিখে দিয়ে যাব। নইলে এই চ্যাংড়া ছেলেমেয়েদের পাল্লায় থাকব নাকি আমি ?—

সকলে হাসিয়া উঠিল—কথার অপেক্ষাও কথা বলিবার ধরনে।

কিন্তু নিছক পরিহাস নয়। অমিত যেন মঞ্জুকে এখানে,—এই ঘর, এই আবেষ্টন, মঞ্জুর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের সঙ্গে—মানাইয়া লইতে পারে নাই।—মঞ্জু নিতান্ত বালিকা। ছেলেমানুষ। স্বর-র মেয়ে।

···অবশ্য, এম-এ পড়ে সে। বয়সও একুশ-বাইশ হইবে? হইলই বা,—সে এখনো বালিকা—চোখে, মুখে, কথায়, হাসিতে, অকারণ আনন্দে। এত ছেলেমানুষ স্বর ছিল না এই বয়সে।—এ বয়সে কেন, ইহারও পূর্বে—। যখন সে সত্যই কিশোরী বালিকা হিসাবে আমাদের নিকটে কারণে অকারণে গল্প শুনিতে বসিত। তর্ক শুনিত আমাদের বন্ধুদের, নানা কথা শুনিত তখনকার দিনের,—বাবার সঙ্গে আমাদের, বাবার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুদের। শুনিত আমাদের কলেজের গল্প, অধ্যাপকদের গল্প, বন্ধুদের গল্প। শুনিত খেলার গল্প, পড়ার গল্প, সাহিত্যের গল্প···তখনকার দিনের সেই স্বর তথাপি এতটা বালিকা ছিল না। তখন তাহার বয়স আরও অনেক কম ছিল—তাহার চোখ এমনি ছিল, এমনি মুখ,—এমনি কণ্ঠ।—কিন্তু তবু তাহার চোখে সেই সঙ্গে ছিল আরও একটু সংকোচ ও নম্রতা; তাহার মুখে ছিল আরও একটু সরল ধীরতা, আরও একটু স্বচ্ছ সুস্থিরতা ছিল তাহার গতিতে, তাহার কণ্ঠস্বরে। না, স্বর তখনো এত ছেলেমানুষ ছিল না—অথচ সত্যই সে তখনো বালিকা। কত ছিল তখন তাহার বয়স? হয়ত পনের বৎসর। পনের বৎসরের বেশি নয় নিশ্চয়ই। সকলেই তখন জানিত তাহার বিবাহের দেরি নাই। স্বরও জানিত তাহার পিতৃগৃহের দায়িত্বমুক্ত জীবন আর বেশি দিন থাকিবে না। এবং তাহার পনের বৎসরের কণ্ঠে আর শোভা পায় না বালিকার উচ্চহাস্য, ব্যবহারে অকারণ চাঞ্চল্য, চোখে মুখে অমন ঔজ্জ্বল্য আর উচ্ছ্বাস। ছিঃ, সে যে বড় হইয়াছে। 'অশোভন' তাহার বয়সে—

পনর বৎসর বয়সে—বাঙলা দেশের মেয়ের পক্ষে—অমন অকুণ্ঠিত উচ্চকিত হাসি, অবাধ মুক্তগতি, আচরণ—ইন্দ্রাণী বৌদির মত। তখনি স্বর নিজের বয়সের ও স্বভাবের অপেক্ষাও নিজের সমাজের ও সংসারের প্রচলিত মতামত, বিধি-বিধানকে বেশি মানিয়া লইয়াছিল। তাই সে মানিয়া লইয়াছিল চিরাগত সংস্কারের বশে তাহার ধরা-বাঁধা জীবনকে, ভাগ্যকে—আর সঙ্গে সঙ্গে এদেশের সমস্ত নারী-জীবনের ট্রাজিডিকেও।…তাই বিবাহের পর সেও তেমনি গতানুগতিক নিয়মে জীবনানন্দের প্রথম আস্বাদনে, প্রণয়-শিহরিত প্রাণে পৃথিবীকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়ে সেই হাওড়া স্টেশনে দেখা স্বর ও পশুপতিকে…ট্রেন ছাড়ার দেরি নাই, মালপত্রও কম নয়, চারিদিকে লোকজনের ছুটাছুটি। পিতৃগৃহ হইতে বিদায়ের ব্যথায় চোখ সজল, তবু নতুন জীবনের স্বাদ, নতুন সৌভাগ্য স্বর-র চোখে-মুখে উপচীয়মান। মিথ্যার মোহজাল ছেদ করিয়া ট্র্যাজিডি প্রকশিত হইয়া পড়িল বলিয়া, তবু তখনো তাহার কোনো চিহ্ন নাই সেই নববিবাহিতার চোখ-মুখে। অথচ ট্র্যাজিডি ঘনাইয়া আসিল বলিয়া। সহজ ট্রাজিডিও নয়।

সংসারের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ তুচ্ছতায় সে স্বর আহত হইত না। স্বর মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে, সে জানে এইরূপ তুচ্ছতা লইয়াই মেয়েদের সংসার চলে। শ্বশুর-গৃহের শাসন কঠিনতায়ও সে স্বর চমকিত হইত না। কোন বাঙালী মেয়ে আশৈশব এই গঞ্জনার জন্য প্রস্তুত না থাকে? প্রতিদিনের অজস্র ঝঞ্ঝাট, স্বামী-পুত্র-পরিজনের নির্ভুল নিরন্তর পরিচর্যায়ও সে-স্বর ক্লান্ত, কাতর হইত না। এই সব লইয়াই ত তাহাদের নারী-জীবনের গর্ব গৌরব, আনন্দ-উৎসব। ইহা দিয়াই ত তাহাদের পরিচয়। সংসারের সাধারণ ট্র্যাজিডির ঘটনাজালে কোনোখানে তাই স্বর-র ছটফট করিবার কথা নয়।—তবু সে ছটফট করিল। আশ্চর্য যে, তবু ছটফট করিয়া মরিল স্বর।…

অনেক-অনেক দিন হইতে নিজেরই মধ্যে কি, আমি অমিতু, জানিতাম না

এই হইবে, এই হইতেছে, এই পৃথিবীর সুর-দের জীবন বহু-বহু শতাব্দীর নিয়মে এখানেই আসিয়া ঠেকিবে, মধ্য-যুগের এই সংসার-বিন্যাসের ইহাই অনিবার্য ফল···ইহাই অনিবার্য পরিণাম?

অমিত নিজেকেই আবার বলিল···হাঁ, ইহাই অনিবার্য ফল,—এই ব্যবস্থা স্বীকার করিলেও—এ দেশের মেয়ের জীবন ট্র্যাজিডি; এ ব্যবস্থা অস্বীকার করিলেও তাহা ট্র্যাজিডি। সুর-র ট্র্যাজিডি বহুকালের বহুযুগের ট্র্যাজিডি; তাহা স্বীকৃতির ট্র্যাজিডি। আর বিদ্রোহের ট্র্যাজিডি—মধ্যযুগের দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ট্র্যাজিডি—তাহাও কাল অমিত দেখিয়াছে—বিদ্রোহের সে ট্র্যাজিডিই ইন্দ্রাণীর ট্র্যাজিডি! অথচ মানবতীর্থের মহা-মাঙ্গলিকের বাণী আজ পৃথিবীর ধূলিতে-ধূলিতে অনুরণিত!—কিন্তু মঞ্জু?···চঞ্চলা বালিকা, তুমি কি যাইতে পারিবে আরও সম্মুখে—আরও দূরে—নবজীবনের তীর্থপথে—স্বীকৃতির শীর্ণপথে নয়, বিদ্রোহের অন্ধমার্গেও নয়,—মানবতীর্থের সম্মিলিত অভিযানে তুমি কি সত্যসত্যই যাত্রিণী?

নূতন একদল বন্দী আসিয়া গেল। ডকের মজদুর এলাকা হইতে তাহাদের ধরিয়া আনিয়াছে। সকলে সে কাহিনী সাগ্রহে শুনিতে লাগিল। মঞ্জুও অমিতকে সোল্লাসে তাহার গ্রেপ্তারের বিবরণ বলিতে লাগিল।

'ছাত্রী সমিতি'র আপিস ছিল সেই বাড়িতে। পুলিস শেষ রাত্রিতে আসিয়া হানা দেয়। বাড়িটাতে কন্‌ফারেন্‌সের সময় বিদেশী প্রতিনিধিরাও ছিলেন দুই-একজন—নিজেদের বৈঠক-আলোচনাও হইত। মঞ্জু খুশী মনে বলিতেছে: আপিসের কাগজপত্র নিয়ে পুলিস অস্থির। এ-কাগজ নিয়ে পুলিস দেখতে বসে তো, আমরা তখনি ও-কাগজ ফেলি জানালা দিয়ে বাইরে—যেন কত গোপনীয় কাগজ তা। পুলিসও ছুট; ছুট বাইরে। ততক্ষণে ও-কাগজটাকে ফেলি ছিঁড়ে—যেন কত ভয়ঙ্কর কথাই তাতে ছিল। 'হাঁ-হাঁ' করে ছুটে আসে ওরা—'রাখুন, রাখুন, রাখুন।' তারপর 'ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, কি লজ্জার কথা! আপনারা লেডিজ—একটা ভদ্রতা, সম্ভ্রম আছে।

আপনারা এ-রকম করলে চলে?' সত্যই চলে না। কিন্তু চলে না কার? ওদের, না, আমাদের?

বলিতে বলিতে হাসিতে কৌতুকে মঞ্জু বারে বারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—পুলিসকে সে ভারি নাকাল করিয়াছে। অমিত হাস্যমুখে শুনিয়া যাইতেছে, দেখিতেছে তাহার চোখমুখে অকুণ্ঠিত দেহের স্বচ্ছন্দ উচ্ছ্বাস।... কিন্তু কোন জালে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে, মঞ্জু? বুদ্ধিহীন চপলতা? না, দৃষ্টিহীন বিদ্রোহ—কোন জালে?...কোন জালে?...

অমিত বলিল: এই ভাবে পুলিসের জালে জড়িয়ে পড়লে, মঞ্জু? কিন্তু তুমি রাত্রিতে নিজেদের বাড়িতে ছিলে না কেন?

মঞ্জু এইবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাইল,—সরল, শান্ত সেই দৃষ্টি।

...পনের বছরের সুর-র দৃষ্টিই যেন...সুর-র দৃষ্টিও কি তবে এমনি চকিত চঞ্চল হইয়া উঠিত, যদি সে পাইত আকৈশোর এমনি মুক্তালোকে বিচরণের স্বাধীনতা?...

মঞ্জু বলিয়া চলিয়াছে,—তুমি তবে জানো না নাকি, অমি মামা? ওঃ! আমি ত ভাবতাম—তুমি জানো সব। কিন্তু তুমি দাঙ্গা আর দেশবিভাগ নিয়েই ক্ষেপে গিয়েছ! তোমাকে কি বলতে গিয়ে বাবা একেবারে গুম হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। কংগ্রেসের লোকদেরই উপর তখন বাবার ভরসা। তাঁর ভয় হয়েছে—কমিউনিস্টরা তাঁকে মারবে। তুমি নাকি শাসিয়েছও মারবে বলে। তাই বাবা কংগ্রেসে নাম লিখিয়েছেন; চাঁদা দিচ্ছেন; ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করছেন;—কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করতে হলে তাঁদের ছাড়া আর কে আছে? পাড়ায় একটা 'জাতীয় গার্ডদল' গঠিত হবে। বাবা তাতে টাকা দিতেও রাজী হয়েছেন। আবার হাসিতে ফাটিয়া পড়ে মঞ্জু।

অমিত বুঝিল পশুপতি কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছে।...

ইহারা এইরূপই কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলে। কাণ্ডজ্ঞান থাকিবে কি করিয়া ইহাদের? একটা স্বার্থবুদ্ধি মাত্র ইহাদের আছে, তাহাকেই ইহারা বলে

কাণ্ডজ্ঞান। আর আছে ভীতি। এ অভাগা দেশে আছে ভীতি, রাষ্ট্রভয়, লোকভয়, শাস্ত্রভয়, 'ভূতের ভয়'···আর এখন তো এ স্পেক্‌টার ইজ্‌ হণ্টিং দি ওয়ার্ল্ড্‌। পশুপতির আর দোষ কি?

সেদিনে পুলিসের নামে, গোয়েন্দার নামে, 'স্বদেশীর' নামেও সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইত—তাহাই তো স্থর-র গঞ্জনার কারণ,—তাহাই কারণ কি? না, তাহা উপলক্ষ?—ইহাদের সমস্ত জীবনযাত্রাই মধ্যযুগের। আছে সেই সামন্ততন্ত্রী সংসার, মানুষ তাহার জাঁতাকলে গুঁড়াইয়া যায়। তাহার সঙ্গে জুটিয়াছে সাম্রাজ্যতন্ত্রী যুগের এই কাঙালী বিদায়। আস্তাকুড়ের আগাছার মত তাই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে এদেশে 'বড়বাবু' আর 'ছোট সাহেবের' প্রেস্টিজ। ইহাই কলোনির কেরানি জীবন। সহজ সাধারণ বুদ্ধি, সহজ সাধারণ জীবন-যাত্রা এখানে আসিবে কি করিয়া? পশুপতির দোষ কি? পশুপতি বুদ্ধিমান্ লোক; কে তাহাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে? আমরা? আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের প্রমাণ তো এই যে, কিছু না করিয়াই লর্ড সিংহ রোডের এই ঘরে আসিয়া পৌছিলাম।

অমিত বলিল, কিন্তু মঞ্জু? কেন তোমাকে নিয়ে এল?—

অমিতের কানে গেল: আপিসে তল্লাসী যখন শেষ হল, আপিস তালাবন্ধ করবে, তখন বললে 'আপনাকেও একবার যেতে হবে। গাড়ি রয়েছে'।

তাই চলে এলে?

হাঁ, ওরা বললে, 'আধঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন আবার'।

এবার হাসিয়া উঠিল অমিত। সেই অনাবশ্যক অভ্যস্ত মিথ্যা। বিশ বৎসর পূর্বেও যাহা এখনও তাহা। অমিতের নিকটেও, মঞ্জুর নিকটেও—সমান প্রয়োজন।

আধঘণ্টার আর কতক্ষণ বাকি এখন, মঞ্জু?

আধঘণ্টা কি? একঘণ্টা হয়ে গিয়েছে।

তাহলে ফিরে যাওনি যে?

কেন? থাকিই না—দেখে যাই আপনারা কে-কে এলেন। ততক্ষণ গল্প করি।

তা বেশ। চা-টা খেয়ে এসেছ? আর শাড়ি-জামা নিয়ে এসেছ?

বাঃ! তা আনব কেন?

এসেছ যখন, গল্প করো—দু'চার দিন, দু'চার মাস, কিংবা দু'চার বৎসর থেকেই যাবে,—বিশেষত যখন নিরাপত্তা আইনটা সবে চালু হয়েছে।

সূর্যনাথ নিকটে আসিয়া বসিল। নিরাপত্তা আইন সম্বন্ধে সে বিশেষজ্ঞ। আইন পড়িয়াছে, প্র্যাকটিসও করিবে, অ্যাটর্নি হইবে। সূর্য বলিল, তা তো কথা নয়। এ আইন চোরাবাজারীদের জন্য, মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছেন। অবশ্য জানি চোরাবাজারীদের কখনো ধরা হবে না। চোরাবাজার যদি বন্ধ হয় তাহলে বড়বাজারও বিদ্রোহ করবে, লালবাজারও চটে লাল হবে, লালদীঘিও শুকিয়ে যাবে; তবু ওটা কংগ্রেস গবর্নমেণ্ট আমাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে না—এত শীগগির।

অমিত হাসিল, বিশ্বাসের জোর আছে দেখছি খুব। এখানে এনেছে কেন আপনাকে-আমাকে? মন্ত্রী মশায়ের নির্ব্বাচনে খেটেছেন তাই বুঝি আমাদের নিমন্ত্রণ লর্ড সিংহ রোডে? ওরা মিষ্টিমুখ করাবে।—কিন্তু খেয়ে এসেছেন কিছু? সঙ্গে এনেছেন কিছু কাপড়-চোপড়?

কৌতূহল সত্ত্বেও সকলেরই মুখ একটু গম্ভীর হইল।—আপনার কি মনে হয়, অমিদা, আমাদের আটকে রাখবে ওরকম?

নইলে এতগুলো লোককে এ সময়ে কি উদ্দেশ্যে মহামান্য পুলিস-মন্ত্রী নিমন্ত্রণ করেছেন এখানে—এই দোলপূর্ণিমার শেষ-রাত্রিতে? চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী পুরনো বন্ধুদের নিয়ে লাটপ্রাসাদে বাঙালী কীর্ত্তন শুনবেন বলে?

আলোচনা আগাইয়া চলিল। জমিয়াও উঠিল। অনেকে কাছাকাছি বসিয়া গেল। মঞ্জু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—শুনিতেছে সূর্যনাথের যুক্তি, বিজয়ের তর্ক, দিলীপের অর্থনৈতিক ভাষ্য। অমিত বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল

মঞ্জুর একান্ত নিবিষ্ট মূর্তি, আগ্রহে-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহের সেই সাবলীল ভঙ্গি, বিজয়ের চক্ষুর দিকে তাকাইয়া-থাকা তাহার চোখের সপ্রশংস চাহনি ;—হাতের উপরে রাখা সেই সুশ্রী চিবুক, তরুণ সুন্দর মুখের কোমলতা, তাহার উপর চিন্তা ও কল্পনার আলোছায়ার খেলা, ক্ষণে ক্ষণে বুদ্ধি ও কৌতুকের বিদ্যুৎস্ফুরণ...

সংসারের আঁচ লাগে নাই তাহার গায়ে, মুখে চোখে, মনেও। ও জানেও না তাহা। জানেও না কেমন করিয়া ওর মা সেই আঁচে জ্বলিয়া গিয়াছেন।... মঞ্জু এখনো কেমন সুখী, এখনো বালিকা। পৃথিবীর কোনো কণ্টক-রেখা এখনো মঞ্জুর গায়ে লাগে নাই। এই দুঃসহ কালের কোনো তাপ এখনো ওর দেহে মনে ছাপ আঁকিতে পারে নাই—অথচ আঁকিবে নিশ্চয়, যেমন আঁকিয়াছে তাহা ইতিমধ্যে অমুর মুখে।...

অমু বুদ্ধিমতী, আত্মসচেতন বোন অমিতের। মাতৃহীন সংসারে সে কৈশোরে লইয়াছিল জরাগ্রস্ত পিতার দায়িত্ব,—দায়িত্ব গ্রহণে সে অভ্যস্তা। পিতৃহীন জীবনে সে-ই আবার অমিতের আশ্রয়, তাহাকে ঘিরিয়াই অমিতের নিজ জীবন। জীবন-সংগ্রামে অমু মূল্য দিতে জানে—দ্বন্দ্বলেশহীন চিত্তে। সে মূল্য দিবে বলিয়াই যে এই বিপ্লবের যুগে বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। বিদ্রোহিনীর মত আত্ম-দর্পে নয়, ব্যর্থতার তাড়নায় নয়, আসিয়াছে জীবনকে জানিয়া, বুঝিয়া। সেই অমুরও কর্মব্যস্ত মুখে আসিয়াছে শীর্ণতা, চোখে তীব্রতা, কণ্ঠে ক্লান্তি-জনিত দুর্বলতা। দেহ শোধ গ্রহণ করিবেই তো—এত পরিশ্রম, এত অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি, এত রৌদ্রবৃষ্টির অতি-প্রাচুর্য—ইহার মূল্য দিতে হইবে না অমুকে? নিয়মিত কর্মের, নিয়মিত পরিশ্রমের, নিয়মিত জীবন-পদ্ধতির মধ্যে যে-দেহ যে-মন আপনার লালিত্যে. লাবণ্যে আপনাকে পোষণ করিতে পারিত, এই পথে—এই দুঃসাধ্য কর্মে, বিপ্লবের নানামুখী স্রোতে—তাহার স্বস্তি, মনের দেহের স্বাস্থ্য দেখিতে না দেখিতে নিঃশেষ হইয়া যায়। অমুরও তাহা শেষ হইতেছে—মঞ্জুরও শেষ হইবে। মঞ্জুরও এই স্বচ্ছন্দপালিত দেহের সৌকুমার্য কোথায় মিশাইয়া

যাইবে! কর্ম-ব্যস্ততা—রৌদ্র, জল, বৃষ্টি, ছুটাছুটি, চেঁচামেচি এই কোমল মুখশ্রী হরণ করিবে; এই উজ্জ্বল ললাটে ক্রমে শ্রান্তি-ছায়া আঁকিয়া দিবে; তারপর উৎফুল্ল অধরের কোণে, চোখের তলে, মুখের উপরে অকালে কালো রেখা ফুটিয়া উঠিবে; আর এই ঝরনার মতো উচ্ছল কলকণ্ঠ—পথে, সভায়, মিছিলে চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া হইয়া উঠিবে তীব্র, কর্কশ, কঠিন।...এই পথে এই তোমার নিয়তি, মঞ্জু,—তাহা জানো কি? তোমার শীর্ণ মুখচ্ছবি, কর্মক্লান্ত দেহ, তোমার বিমলিন লাবণ্য তখন আর মানুষের দৃষ্টিকে এমন করিয়া বিমুগ্ধ করিবে না। নারী হইয়া, তরুণী হইয়া, কে সহ্য করিতে পারে পুরুষের দৃষ্টির সেই অবজ্ঞা? পারিবে তুমি মঞ্জু?...তন্বী তরুণী এখনো মঞ্জু। সে চলিয়া গেলে পৃথিবীর মানুষ তাহাকে আজ মুগ্ধ দৃষ্টি তুলিয়া দেখে। তাহার সমস্ত অঙ্গ দিয়া মঞ্জু তাহা জানে; অচেতন মন দিয়াও সে অনুভব করে সেই বিমুগ্ধ দৃষ্টির অভিষেক। অনুভব করে. এবং তৃপ্তি পায়। কখনো কখনো বিরক্তও হয়। কিন্তু পুলকিত হয়, তৃপ্তি পায়, তাহাতে ভুল নাই। তাহার এই দেহ-মন প্রাণ-লীলায় চঞ্চল, যৌবনের নতুন ঐশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত, হিল্লোলিত।... সহ্য করিতে পারিবে কি তুমি, মঞ্জু, পুরুষ-চক্ষের অবজ্ঞা, বক্র হাস্য, তোমার রূপ-যৌবনের প্রতি উপহাস? না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি কল্পনাও করিতে পার না। তোমার অসহ্য তাহা। সুন্দর স্বপ্নময় দিনগুলি সবে তোমার জীবনে আসিতেছে—নতুন যৌবনের মাদকতাময় এই দিনগুলি, তাহাতে তুমি ভাসিয়া চলিতেছিলে। তুমি তো সুর-র মত সংসারের কারাগারে নিষ্পিষ্ট হও নাই— দুর্যোগের দিনে হও নাই স্থৈর্যে বুদ্ধিতে সংহত। অনেক সহজ, অনেক স্বচ্ছন্দ দিনরাত জুটিয়াছে তোমার জীবনে। ইস্কুলে, কলেজে, বন্ধুগোষ্ঠীতে, জনাকীর্ণ সভায়, পথের ভিড়ে তোমার স্বতোচ্ছ্বসিত জীবন পূর্বাপর আনন্দে অব্যাহত। দায়িত্বের কোনো ভার তোমার মনে ঠাঁই পায় নাই। না জানিয়া, না বুঝিয়া পথ চলিয়াছ; আর না জানিয়া, না বুঝিয়া পথের মিছিল হইতে এবার চলিয়া আসিয়াছ জেলখানার অন্ধগলিতে। কী সে অবরুদ্ধ বন্দিনী-জীবন—জানোই না, ভাবিতেও পার না।...প্রাচীরের মধ্যেও

প্রাচীর, ফটকের ভিতরেও ফটক, জেনানা ফটকের অপ্রশস্ত আঙিনার অপরিচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ। দিনের পর দিন যায়, রাত্রি আসে, অন্ধ ঘরে অন্ধকার ঘনাইয়া ওঠে। আবার দিন, আবার রাত্রি। আর কী সেই দিন, কী সেই রাত্রি! অথচ প্রতি দিনে বাড়িয়া যাইবে তোমার বয়স। বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না, অথচ জীবন ফুরায়। যৌবন ম্লান হয়, প্রাণ মাথা ঠোকে। অবরুদ্ধ নিশ্চল দিনরাত্রি পাষাণের মত নিথর হইয়া ওঠে। ক্লান্তি পুঞ্জিত হইয়া ওঠে ক্রমে চক্ষে, আর তার পরে বক্ষের তলায়। যৌবনের কামনা ও কল্পনা দেয়ালে দেয়ালে প্রাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া শেষে মেঝেয় লুটাইয়া পড়িবে···তোমার কৌতুকচঞ্চল ঋজু দৃষ্টি ততক্ষণে খরধার হইয়া উঠিতেছে। তির্যক হইতেছে, বক্র হইতেছে, শাণিত ছুরিকার মত তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে। সে দৃষ্টি পৃথিবীকে টুকরা টুকরা করিতে চাহিবে ব্যর্থতার আক্রোশে। আর-কাহাকেও আঘাত করিতে না পারিলে, নিজেকেই শতবার শত স্থলে বিদ্ধ করিবে—রক্তাক্ত করিবে, ছিন্নভিন্ন করিবে।···না মঞ্জু, এই নিয়তি তুমি ভাবিতেও পার না, কল্পনাও করো নাই।

মঞ্জু!—অমিত ডাকিল।

গল্পের মধ্যে মঞ্জুর চমক ভাঙিল। গল্প ছাড়িয়া সাগ্রহে অমিতের নিকটে আসিয়া সে বসিল।

কি, অমি মামা?

তুমি এ পথে আসতে গেলে কেন, মঞ্জু?

মঞ্জু হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কি এতই অযোগ্য—অমিত মামার চক্ষে, অমিত মামার বিচারে?

অমিত বুঝাইয়া বলিতে গেল, বড় জড়িয়ে পড়লে যে—

মঞ্জু প্রথম অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিল, পরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল; ওঃ! তাই।

না, না, সত্যই তোমার ভাবা উচিত ছিল।

ভাবিনি, কি করে বুঝলে?—কিন্তু ভাববারই বা কি অত?

ভাববার নয় ?—অমিত বুঝিল সত্যই মঞ্জু এখনো তাহার কাজের গুরুত্ব বোঝে না।

মঞ্জু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলিল, না। তবে কেন এলাম এ-সবে শুনবে ?—তোমার জন্য।—অমিতকে উত্তরের অবকাশ না দিয়াই বলিল মঞ্জু।

আমার জন্য ?—এরূপ আক্রমণের জন্য অমিত একটুও প্রস্তুত ছিল না।

হাঁ। মা বরাবর বলতেন দুটি কথা—'আমাদের মেয়েদের দিয়ে কিছু হবে না।' আর তাঁর মুখে শুনতাম—তোমরা নাকি মস্ত বড় কাজ করছ। ঠিক করেছিলাম— মাকে দেখাব সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে।...

অমিত যেন আবার শুনিতে পাইতেছে বিশ বৎসর পূর্বেকার খেদ 'আমরা তো দেশের কোনো কাজেই লাগলাম না।'—আর শুনিতে পাইতেছে কি আজ বিশ বৎসর পরে উহার উত্তরও—'সে কাজ মেয়েরাও করতে পারে' ?

সুর-র খেদ আজ মঞ্জুর স্পর্ধায় পরিণত হইয়াছে।

মঞ্জু হাসিয়া বলিল, কি ভাবছ, অমি মামা ? মায়ের দ্বিতীয় কথাটা শুনবে না ? শুনবে ? শোনো তবে। মা বলতেন, 'বিয়ে যখন করবে, করবে তুমি। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো বিয়ে করতে বলব না, মঞ্জু।'

চমকিয়া উঠিল এবার অমিত।

...না, না। সংসার ছলনা করিতে পারে না—সহজ মানুষকে, প্রাণবান মানুষকে ঠকাইতে পারে না পৃথিবী। এই তো একটা জীবনের অভিজ্ঞতা দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে সুর-র এক অতি-সহজ উক্তিতে। মাত্র এই একটি কথার মধ্য দিয়া সুর তাহার একমাত্র সন্তানের কাছে উৎসারিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার প্রবঞ্চিত জীবনের সমস্ত বেদনা। সমস্ত মধ্যযুগের আদর্শের প্রতি,—পরিবারের প্রতি, পাতিব্রত্য ও গৃহধর্মের প্রতি—এই তো জীবন্ত ধিক্কার সুর-র। এবং সুর-র মত আরও অনেক জীবনের—ইন্দ্রাণীর। ইন্দ্রাণীর বিদ্রোহে ও সুর-র আত্মবিলোপে সেই ধিক্কারই ধ্বনিত। ব্যর্থতায়-ভরা যুগে ব্যর্থতায়-ভরা ইহাদের পারিবারিক বন্ধন ও জীবন-যাত্রা।...

কথা বলছ না, অমিত মামা ?

অমিত বলিল, আমি যে ওকথা মানি না, মঞ্জু।

সত্যি ? তবে বিয়েটাকে অমন তোমরা বাঘের মত মনে করেছ কেন ?

কে বললে আমি তা মনে করি ?—অমিত একটু চমকিত হয়।

করো না ? ও ! তা হলে 'বিপ্লবীদের' বিয়ে করতে নেই বুঝি।

অমিত হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একদিন তাই ছিল, মঞ্জু। কিন্তু আজ আর-এক দিন। তখন আমরা করতাম 'স্বদেশী'—তাতে বিয়ে ছিল বর্জনীয়। লোকে বলে, আজ আমরা পলিটিক্‌সই করি বিয়ে করার জন্য।

কিন্তু, তোমার মতো বিয়ে না পেলে ?—মঞ্জু হাসিতে হাসিতে বলিল।

মনের দুঃখে বনে চলে যাই।—অর্থাৎ, জেলে আসি। তাই তো এত বলছি—তুমি এখানে এলে কেন, মঞ্জু ?

বিয়ে পাই নি বলে,—বলিয়া হাসিতে অমিতের সামনে মঞ্জু প্রায় লুটাইয়া পড়িল।

না, বড় ফাজিল, বেয়াড়া হইয়াছে সুর-র মেয়েটা ! অমিত তথাপি রাগ করিতে পারিল না, হাসিল।

কিন্তু কোলাহল আবার বাড়িয়া গেল—কাহারা আসিল ? সাংবাদিক বন্ধুরা বুঝি।

তিন

প্রেস-শুদ্ধ আপিস তালাবদ্ধ করিয়া সকলকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। —আর এই কাগজ বাহির হইবে না। এই শেষ সংখ্যা সংবাদপত্রের—সকলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে তাহার উপর।

তপনকে পাশে বসাইল অমিত। খড়দ-বরানগরে তাহার বাড়ি সে ইহাদের মধ্যে আসিল কি করিয়া?

ফিলজফিতে এম-এ পড়িতে গিয়াছিল তপন। অধ্যাপকদের প্রিয় ছাত্র, নিজেও পণ্ডিত বংশের ছেলে—অধ্যাপক ব্রাহ্মণের বংশ। তাহাদের মাথায় একটু ছিট থাকে। তপনের বাড়িতে আছে চতুষ্পাঠী, পিতা এখনো পরিচালনা করেন। ছাত্র বিশেষ নাই। ব্রহ্মত্র সামান্য, বৃত্তি ও সাহায্য সামান্যতর। কী করিয়া চলিবে চতুষ্পাঠী? কিন্তু নিকটস্থ শ্রীপাট হইতে মহাপ্রভু গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। তখনকার দিনে এখানে তাঁহার কৃপালাভ করিয়াছিলেন এই বংশের পণ্ডিত ও ভক্ত পূর্বপুরুষ। তাহার পর হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় সে ঐতিহ্য তাঁহারা বহিয়া চলিয়াছেন। চতুষ্পাঠী এদিনে চলে না; তবু গোলক ভট্টাচার্য একেবারে তুলিয়া দিতে পারেন নাই। আঁকড়াইয়া পড়িয়া ছিলেন। কিন্তু মনে মনে পরাজয়ও স্বীকার করিতেছিলেন—বাহিরে না হউক, গৃহে। তাই তপনকে ইংরাজি পড়িতে দেন—গৃহিণী যে কিছুতেই তাঁহার ছেলেকে পিতার এই দারিদ্র্যভার গ্রহণ করিতে দিবেন না। তারপর তপন ক্লাসে ক্লাসে পারিতোষিক ও বৃত্তিলাভ করিয়া চলিল। খরধার বুদ্ধির সঙ্গে দীপ্ত অভিমান:—ইংরেজী বিদ্যা, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান কোনো কিছুরই নিকট তপন আত্মবিক্রয় করিবে না। কোথায় কাহার শ্রেষ্ঠতা বিচার করিয়া বুঝিবে। পড়িতে গেল সায়েন্স্। ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পাইয়া সে গবেষণায় লাগিল। জীন্স্, এডিংটনের বাগ-বৈদগ্ধ্যে [illegible] ল্যাবরেটরির অধ্যাপকেরাও বিমুগ্ধ। তপনও পরিতৃপ্ত চিত্তে

অগ্রসর হইয়া গেল গণিতের পথে। বিশ্ব তো একটা আঁকের সুবৃহৎ সমীকরণ। নিয়ম-নীতি, বিজ্ঞানের বিধি-বিধান সবই অনিশ্চিত, সবই রহস্য; চরাচর তাবৎ বস্তু শুধুই আপেক্ষিক। জানিয়া পরিতৃপ্ত হইলেও কিন্তু কেমন বাধা পাইল তপন এই সবে। এত ঘটা করিয়া এই কথাটা বলিবার মতো কি আছে জীন্‌স ও এডিংটনের? যাহা তাঁহাদের বিবেচনায় গভীর চিন্তার ফল তাহা তো দর্শনের প্রায় প্রাথমিক পাঠের বিদ্যা। দর্শন পড়াই তবে প্রয়োজন। ভারতীয় দর্শন নয়, ইউরোপীয় দর্শনই পড়িতে হইবে তপনকে। পর বৎসরে বি-এ-র ছাড়পত্র লইয়া ফিলজফির ক্লাশে গিয়া উদিত হইল তপন।

বন্ধুরা বলিল, কি পাগলামোতে পেয়েছে তোমাকে! অমিতও তপনকে বুঝাইতে গেল। তপন উত্তরে বলিয়াছে, শীঘ্র গিয়েছেন কোনো দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে? শত দুই সম্ভবত প্রোফেসর আমাদের। দেখেই বুঝা যায় দেশের অধ্যাপক-সমাজের তাঁরা ইম্পীরিয়াল সার্ভিস। অন্য কলেজের অধ্যাপকদের তুলনায় খান ভালো, পরেন ভালো; এবং আরো বেশি ভালো কি করে খাবেন, কি করে আরো বেশি পরবেন তা ছাড়া অন্য চিন্তা নেই;—ইকোনোমিক ইণ্টারপ্রিটেশন অব্‌ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রোফেসরশিপ শুনবেন? পরীক্ষার দক্ষিণা ও পাঠ্য-পুস্তকের মুনাফা, এই দুই প্রকাণ্ড ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল প্রয়াসের ভিতর দিয়ে ক্লাসের পড়ানো কাজটা কোন রকমে পার করে দিয়ে তাঁরা বসেন—কোষ্ঠীবিচারে, জমির দর হিসাবে; শেষে হিটলার-হিন্দু মহাসভার মাহাত্ম্য-কীর্তনে। দর্শনের অধ্যাপকদের কথা বলছেন? বিদ্যার অভাব নেই কারও। যাঁর বিদ্যার অভাব, তাঁরও অন্তত বুদ্ধির অভাব নেই। আর কী চমৎকার ইংরেজিতে অধিকার স্যর সর্বপল্লীর! ফার্স্ট ক্লাস বক্তা, সেকেণ্ড ক্লাস লেখক, থার্ড ক্লাস অধ্যাপক, আর ফোর্থ ক্লাস দার্শনিক। তাঁর প্রাঞ্জল ইংরেজী শুনবার জন্য নিশ্চয় টিকেট কিনেও তাঁর ক্লাসে বসা চলে। কিন্তু এক বৎসরের বেশী কতদিন তা শুনতে ভালো লাগবে? বিশেষ করে আমরা টোলে চতুষ্পাঠীতে মানুষ হয়েছি। চার শ বৎসর ধরে ভাগবৎ আর ষড়দর্শনের চর্চায় [illegible] [illegible]দের মগজ

গঠিত হয়ে উঠেছে। বেশ বুঝতাম, ভারতীয় দর্শনের এ ব্যাখ্যা বিলাতে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তা ফাঁকা। গভীরও নয়, সত্যও নয়। আসলে এর উদ্দেশ্যও হচ্ছে—বিলাতের মনের মতো করে আমাদের মনের কথাকে তুলে ধরা। তাতে অন্যায় কি, বলছেন? অন্যায় এই যে যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের কথা এ ব্যাখ্যায় নেই; আমাদের মনের কথাও তাতে নেই। অন্যায় তাই এই যে, তা সত্যই গঙ্গার জল নয়, টালা ট্যাঙ্কের জল।

অমিত হাসিয়া বলে, এ যুগের উপযোগী গঙ্গার জল তো তাই।

তপন ছাড়ে না—ঠিক, কিন্তু কলের জল তো গঙ্গোত্রীর জল নয়, হরিদ্বারের গঙ্গাও নয়; পরিস্রুত জল মাত্র।

'এ যুগের উপযোগী' করে যদি সে যুগের দর্শনকে না নিলেই নয়, তা হলে সে যুগের দর্শনকে নিয়ে টানাটানি করা কেন? এ যুগের দর্শনকেই বরং সরাসরি গ্রহণ করব। আর আগামী যুগ আসতেই তা হলে এ যুগের দর্শনকেও বিদায় দোব। কারণ যুগটাই তা হলে বড় কথা।

তপন দেখিতেছিল—এদেশের দর্শনের অর্থ আত্মতত্ত্বের অনুসন্ধান। তাঁহাদের গৃহীত প্রতিজ্ঞার সূত্র ধরিয়া যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদের গৃহীত প্রতিজ্ঞার সূত্র ধরিয়া তাঁহারা যুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ জগৎ-দৃষ্টির মধ্যে প্রমাণ অনুমান আপ্তবচনের চকমকি ঠুকিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যে যুগ, যে জগৎ-বোধ অবলম্বন করিয়া এই সৌধ-নির্মাণ চলিয়াছিল, সে জগৎ-বোধই বিজ্ঞানের যুগে অচল। কারণ, সেই জীবনযাত্রাই যখন নাই তখন সেই জীবন-বোধ টিকিয়া থাকিবে কিরূপে? তপন তাহার পিতাকে দেখিয়াছে। তাঁহাকেও মানিতে হইতেছে নৈহাটি-ভাটপাড়ার চটকলকে, উহার মজুর ও সাহেবদের। অধ্যাপক-পাড়ার সীমানাতেই আজ জুয়ার আর মদের আড্ডা। ন্যায়ের তর্ক অপেক্ষা মাতাল মজুরের হল্লায় তাহা এখন মুখরিত।

তাঁহাদেরও অন্তরের বিশ্বাস ভাঙিয়া গিয়াছে। গোলোক ভট্টাচার্যও ইহা

বুঝেন। কবে তাঁহাদের সেই যুগ ভাসিয়া গিয়াছে—সেই জীবন-বিন্যাস, গৃহ-দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া সেই গৃহ রচনা—শান্ত সদাচার, পূজা-নিয়ম, সম্মানিত অনুগত লইয়া সেই সমাজ-পালন অসম্ভব। রেল বসিল, তার আসিল, ডাক চলিল; কল-কারখানার চাপে পল্লী-শ্রী পরিণত হইয়াছে ইন্‌ডস্ট্রিয়াল এরিয়ার কুশ্রীতায়। মজুর, মালিক, মাড়োয়ারী, কাবলী, আর সর্বোপরি ইংরেজ ছাঁকিয়া ধরিয়াছে শ্রীপাট খড়দহের নিকটস্থ এই পল্লিপ্রান্তকে। ইংরেজের শিক্ষা, তাহার শাসন, তাহার আদর্শ—ইহার মধ্যে তাঁহাদের ভাটপাড়া-নবদ্বীপের সেই সমাজ আর কতটা টিকিয়া থাকিবে? সেই গৃহ আর কি করিয়া রহিবে দৈন্যের মধ্যেও শ্রীময়, সম্মানিত? গোলোক ভট্টাচার্য পত্নীর তাড়নায় তপনকে ইংরেজী পড়িতে দিয়াছিলেন। ভাস্কর পাশ করিলে বিজ্ঞান পড়িতে চলিল—কোনো প্রশ্নই আর উঠিল না। অংশুমানই বা কেন পৈতৃক টোল আগলাইবার জন্য সংস্কৃত পড়িতে চাহিবে? গোলোক ভট্টাচার্যই বা আর কি করিতে পারেন? আত্মরক্ষায় যে সমাজ আপনাকে সাত শত বৎসর ধরিয়া গুটাইয়া লইতে শিক্ষা দিয়াছে, সে সমাজেরই অভ্যস্ত শিক্ষায় তিনি আপনাকে আরও সীমাবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। জীর্ণ গৃহের দৈন্যের মধ্যে তাঁহার শেষ আশ্রয় নিজের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা, আচরণ, কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মমর্যাদাবোধ। লোভকে অস্বীকার করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা অশ্রান্ত—তবু অস্বীকার করিতে পারেন কই? তপনের আয়, তপনের উন্নতির দিকে তাঁহার সংসারের সকলে চাহিয়া আছে। তিনিও আছেন, কিন্তু তবু তিনি তাহা অস্বীকারও করিতে চাহেন; বিলাতী বণিকের বেতন লইয়া তপন দাসত্ব না করিল। বেতন যদি লইতেই হয় অধ্যাপনাই তপন করুক। গোলোক ভট্টাচার্য বাঁচিয়া থাকিতে অন্তত তাঁহার পুত্রেরা যেন এইটুকু ঐতিহ্যও অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাইতে পারে। তপন বিজ্ঞানের অধ্যাপক হইল। পিতার আপনার সহিত আপনার এই আপোস-রফা তপন বোঝে। বোঝে ইহার ভিতরকার দুর্বলতা; বোঝে ইহার ভিতরকার সত্যপ্রিয়তা; আর বোঝে ইহার পিছনকার করুণ বেদনাটুকুও। কিন্তু সে বুঝিতে পারে [illegible]—ইংরেজী-জানা ভারতীয়

বিস্তার" অধ্যাপকদের এই বাগাড়ম্বর, এই দম্ভ, আর এই প্রতারণা। জগৎকে তাঁহারা দশজনের মতোই মানেন, বেশ স্থূলভাবেই মানেন,—হয়ত বা দশ জনের অপেক্ষাও একটু বেশি করিয়াই স্থূলভাবে ভোগ করেন। তথাপি ইঁহারা অতি গম্ভীর কথায় ভারতীয় ত্যাগাদর্শের, তাহার দর্শনের পশরা সাজাইয়া বসেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলের সীমারেখায় ঘুরিতে ঘুরিতে তপন ক্ষেপিয়া যায়। এমন স্থূলচরিত্র, বিনয়-বিবেক-বর্জিত আত্মসন্তুষ্ট মানুষ বুঝি এ দেশের আই-সি-এস্‌রাও নয়। তাহাদেরও স্থূলতা এমনিতর; কিন্তু ভাগ্যবান বলিয়া এমনিতর ঈর্ষা ও লোভ তাহাদের মধ্যে নাই। 'হাক্‌স্টারস' !

অমিত শুনিয়া হাসিয়াছে।—অত রাগ করো কেন? অধ্যাপক বলেই কি তাঁদের অপরাধ? তাঁরা অন্যদের থেকে কেন স্বতন্ত্র হবেন? তাঁদের সহপাঠী, স্বজন, বন্ধু, স্বশ্রেণীর লোকেদের জীবন-আদর্শ কেন এই অধ্যাপক ব্যাচারীদের গ্রহণ করা চলবে না, বলো? তাঁরা অন্য কিছু না-পেয়ে ছাত্র-পড়ানোর ব্যবসা নিয়েছেন বলে?

ব্যবসা?

হ্যাঁ, অধ্যাপনাও ব্যবসাই। যুগটাই ব্যবসায়ীর। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম পর্যন্ত মার্কেট-নিয়মে চলে।

তপন অত না জানিলেও বোঝে যুগকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার পিতার মতোই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অধ্যাপকও উহারই প্রমাণ।

কিন্তু কী এই যুগ যাহাকে অস্বীকার করা যায় না? কী সেই যুগ যাহা আবার আপনার নিয়মেই এইরূপে অস্বীকৃত হইয়া যাইতেছে? বিজ্ঞানের ছাত্র তপন স্থির করে—বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারই উহার কারণ।

হাঁ, এই যুগ বিজ্ঞানের যুগ,—ইহাই এই যুগের পরিচয়।

কিন্তু তাহা হইলে এই যুগেই বা কেন এই পাশ্চাত্য জাতির বৈজ্ঞানিকদের মনে এমন সংশয় জাগিল? তাঁহারাই তো আজ চীৎকার করিতেছেন—'তফাত যাও, তফাত রহ, সব ঝুটা হায়?'

অস্পষ্টভাবে এই সব চিন্তা যখন তপনকে অস্থির করিতেছে তখন অমিতের সঙ্গে পরিচয়টা তপনের ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল। আলাপটা জমিল বই-এর দোকানে। ইতিহাসের ছাত্র অমিত। সে জানাইল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তপনকে বুঝিতে হইবে ভারতীয় দর্শনের মূল্য ও বিজ্ঞানের কথা।

অমিতের বইএর দোকান হইতে বের্নল-ক্রোথারের বই লইয়া সেদিন তপন বাড়ি ফিরিল। তখন যুদ্ধের প্রথম যুগ। বিজ্ঞান কলেজের চারিদিকে ধর্না দিতেছে যুদ্ধরত শাসকেরা: 'ধনং দেহি, খাদ্যং দেহি, অস্ত্রং দেহি, দ্বিষো জহি।' মানুষের মুখে মুখে বিজ্ঞানের আসুরিক বিভীষিকার কথা। একই লোকের মুখে জড়বিদ্যামূলক বিজ্ঞানের ব্যর্থতার প্রচার, আবার বৈজ্ঞানিকের সামাজিক কর্তব্যেরও অঙ্গীকার। কথার ও কাজের এই ধোঁয়ার জালের প্রতি তপনের যে উপেক্ষা ছিল উহার ঊর্ধ্বে উঠিতে-উঠিতেই এই সবের অর্থও যেন সে বুঝিতে পারিল।

দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ এই যুগে বিজ্ঞান আজও সাবালকত্ব লাভ করে নাই। মুনাফার দাস আজও বিজ্ঞান।—চাই এই মুনাফার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি। ইহাই তবে 'যুগ-সন্ধি'। মুনাফার নাগপাশ হইতে বিজ্ঞানের মুক্তি চাই।—তাহাতেই মুক্তি সংশয়মুক্ত চেতনার, ও দ্বিধা-সংকুচিত চিন্তার। মুক্তি মানুষের মনবুদ্ধিচেতনার, মানব-আত্মার।

অমিত বলিল, তা-ই—তোমার চক্ষে আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে। কিন্তু শিল্পীরা সাহিত্যিকরা তাঁরা বলবেন কি?

তপন অবজ্ঞাভরে বলে তাঁদের বলবার কি আছে? দু হাজার বছর ধরে চাঁদের সুধা, কোকিলের ডাক কিংবা প্রেমের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে তাঁরা বলছেন। বিজ্ঞান তো অনেকদিন ধরেই তাঁদের কাব্যের সে বনিয়াদ উপড়ে ফেলে দিয়েছে। আর কেন?

অমিত জানায়, আমরা শুনতে চাই বলে, সাহিত্য পড়তে চাইব বলে—

অর্থাৎ আপনারা বিজ্ঞানকে মানবেন না?—বিদ্রোহীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে অমনি তপন।

ঠিক উল্টো। বিজ্ঞানই হবে তখন কাব্যেরও বনিয়াদ, যেমন দর্শনের আশ্রয় হচ্ছে বিজ্ঞান এখনই।

কথাটা তপন ভাল বুঝিল না বলিল, ওসব আপনাদের বুজরুগি।

অমিত হাসিল—তপন একটা ক্ষ্যাপা। মনে কেমন মায়া জাগিল এই ক্ষ্যাপা ছেলেটার জন্য।

কিছু করানো যায় না তপনকে দিয়া—লেখাপড়া কিছু? জীবনে অমিত যাহা করে নাই তাহা অপরকে দিয়া করাইবার চেষ্টায় অনেককেই তখন সে লিখিবার উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়া বেড়ায়। বৈঠকে, আসরে, তর্কে তপনেরও এখন কুলাইল না। তপন কলম তুলিয়া লইল। সে কলমে যেমন তীক্ষ্ণতা, তেমনি উগ্রতা—অমিতের শাসন মানে না। আরও আগাইয়া চলিল তপন। দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে চোরা কারবারে মুনাফা-শিকার তাহার চোখের সম্মুখেই পরিণত হইয়াছে মানুষ শিকারে!

কলেজের চাকরিটা তখন একবার যাইতে যাইতে টিঁকিয়া গেল। টিকিল, কারণ যুদ্ধের দিন, বিজ্ঞানের অধ্যাপক পাওয়া দুর্ঘট। তাহা ছাড়া কর্তৃপক্ষের ধারণা কমিউনিজম্-এর স্বপক্ষে লেখা তখন ব্রিটিশ গবর্নমেন্টেরই মনঃপূত। হয়তো সরকারের সাহায্যও পায় তপন। প্রিন্সিপাল নিজে ইহা বিশ্বাস না করিলেও কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকদের, এমনকি ছাত্রদেরও, তাহা বিশ্বাস করিতে বাধা হইল না—সরকারই টাকা দিয়া তপনকে লেখাইতেছে। তপন লেখা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ক্ষেপিয়া গেল নাকি তপন?

অমিতকে সে বলিল: কোথায় আটকে যাচ্ছিল বার বার। মনে পড়ল শেষে আপনারই কথা প্রথম আলাপের দিনে—'In the beginning there was deed, চিন্তায় নয় কর্মেই জীবন।'

অমিত চমকিত হইল। মনে পড়িল অনেক কথা...'চিন্তা নয় কর্মে আমাদের জীবন।' এই বয়সে এইরূপই জীবন-জিজ্ঞাসা অমিতকেও আকুলিত করিয়াছিল, সেদিন জীবন-জিজ্ঞাসায় সেও উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল।

আপনাকে কিছুতেই শান্তি দেয় নাই, নিশ্বাসও সে ফেলিতে পারে নাই। পথ হইতে পথে, বই হইতে বইয়ে সে খুঁজিয়াছে উত্তর। ক্ষ্যাপার মতো খুঁজিয়াছে—দুই হাত দিয়া কেবলই একটার পর একটা যবনিকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে: 'আবীরাবির্ম এধি'। প্রকাশিত হও, প্রকাশিত হও, হে সত্য, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। তারপর অকস্মাৎ উন্মত্ত প্রার্থনা সার্থক হইল ত্রিশের কর্মোন্মাদনায়। জীবন-জিজ্ঞাসা ঠেলিয়া লইয়া গেল অমিতকে পিপাসা-নিবৃত্তির দিকে—অকূল সমুদ্রের মধ্যে, মানবমহাসমুদ্রের তীরে,—এ কালের মানব-সাধনার পরম সমারোহের ক্ষেত্রে। আর অমিত প্রাণ ভরিয়া—সমস্ত প্রাণ ভরিয়া—বলিয়া উঠিল: 'শোনো, শোনো, অমৃতের পুত্ররা, তোমরা যাহার ধ্যান করিতেছ, তাহাকে আমি জানিয়াছি।—না, না, শুধু জানি নাই—আমি তাহাকে পাইয়াছি,—পাইয়াছি শত সহস্রের মধ্যখানে। সমবেত জীবনের স্রোতে, জীবনে জীবন ঢালিয়া।' আর সেদিন মহদুন্মাদনায়, পরম উত্তেজনায় অমিত বলিয়াছিল, 'না, না, চিন্তা নয়। চিন্তা নয়; Thought is at best repressed action.—কর্মেই জীবন,—কর্মেই জীবন।'···অনেকখানি সত্য ছিল অমিতের সেই ঘোষণায়,—অনেকখানি অসত্যও। সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার করিবার দিকেই ছিল তাহার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি।—বহুদিনের চিন্তাজ্বর-তপ্ত অমিত সেদিন চিন্তাকে অস্বীকার না করিলেই সুস্থ বোধ করিত না।

তেমনি মুহূর্ত আসিয়াছে কি এবার তপনেরও জীবনে? তেমনি ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যখন আত্মবিস্মৃত হইতে না পারিলেই মানুষ আত্মভ্রষ্ট হয়?

In the beginning there was deed—ও কথাটা আমার নয়, তপন। অমিত বলিল।

জানি। এঙ্গেলসের; কিংবা তারও পূর্বেকার কারও। হবে হয়তো [illegible] কিন্তু কথাটা আমার কাছে পৌঁছেছিল আপনার [illegible]। [illegible] সত্য।

[illegible]বে, তপন?—তখন অমিত জি[illegible]া করিল

জানি না।

নির্বাচনের ঝড়ে গাল খাইয়া, ঢিল খাইয়া, শেষে মাথা কাটিয়া রক্তাক্ত দেহে তপন ফিরিয়া আসিল।

হিন্দু-মুসলমানের মহাযুদ্ধে দেশ তখন ভাঙিয়া পড়িতেছে। তপনের একমুহূর্ত অবকাশ রহিল না। তারপরেও তপনের ডাক পড়িল—অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিকেরা নিজেদের সমিতি গঠন করিতে চান। বিলাতে ঐরূপ সমিতি আছে, ট্রেড ইউনিয়নের পদ্ধতিতে চলে, এখানেই বা তবে তাহা হইবে না কেন? তপনের মতো বৈজ্ঞানিক কর্মী ছাড়া কে করিবে ইহার প্রাথমিক কাজ? তপন মাতিয়া উঠিল। ছয় মাস ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী বৈজ্ঞানিকদের বুঝাইয়া পড়াইয়া, পত্র লিখিয়া যখন দিল্লীতে সমিতি গঠন করিতে গেল, তখন ওয়েভেলের মন্ত্রি-প্রধানেরাই এই সমিতির ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। আর সমিতির পরিচালনা ভার রহিল তাঁহাদেরই মনোনীত অধ্যাপক ও উপকর্তাদের হাতে। অবশ্য তপনও উহাতে আছে, থাকিবেও। সে ইয়ংম্যান,—উদ্যোগ, পরিশ্রম করিবে, ছিট আছে তাহার মাথায়, কাজ সে করিবে। অবশ্য বেশি বিশ্বাস তাহাকে করা চলিবে না—কমিউনিস্ট। কিন্তু আপাতত তাহাকে ছাড়া কাজ করিবার লোকই বা পাওয়া যায় কোথায়? হাঁ, কর্তৃপক্ষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। কারণ, বিশ্বাস করা যায় না, তপন যখন কমিউনিস্ট।

দরিদ্র, মন্দভাগ্য বৈজ্ঞানিক, কারিগর, মিস্ত্রি, কর্মীরা তপনকে তখন শুনাইয়া শুনাইয়া গজগজ করিতে করিতে জানাইয়া গেল, 'ডা'নের হাতে পুত্র সমর্পণ। যাঁরা বরাবর আমাদের আধ-পেটা রাখছেন সেই মন্ত্রী আর মালিকদেরই করলেন আমাদের এই সমিতিরও কর্ণধার।'

মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকরা বুঝিতে পারেন না—তপনদের 'অধৈর্য' হইবার কারণ কি? "ছোকরা বৈজ্ঞানিক কর্মীদের ও যুদ্ধের বেকার কারু-কর্মীদের বড় বাড় হয়েছে। দেখে নি তো এরা কি ভাবে আমরা আরম্ভ

করেছিলাম বিজ্ঞানের সেবা! সায়েন্স তো চায় না এরা, চায় পলিটিক্স—এরা সব কমিউনিস্ট।”

তপন বলিল, আর না। আপাতত এখানেই শেষ।

অমিত বলিল: তা হলে তুমি করবে কি?

কেন? জন্মে অবধি দেখছি চটকল—এই চিমনির ধোঁয়া। কিন্তু জীবনে কারখানার ভেতরটা দেখিনি। জানি না কিই বা তাঁত-ঘর, কিই বা ফুরন, কিই বা কি?

অধ্যাপক পণ্ডিতের পরিবার—বহু সন্তর্পণে আপনাদের পবিত্রতা এই কল এলেকার মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। অমিত বলিল, আর এখন চট করে তা জেনে ফেলবে? বিশেষত চটকলের যে অবস্থা।

জানিতেই হইবে। কিন্তু চটকল যেন অচল। বহু হরতালের মধ্য দিয়া উহার মজুরদের পরীক্ষা হইয়াছে; অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে,—'বাবুরা সবাই চোর।' আর তপনই বা 'বাবু' ছাড়া কি? তবু যাতায়াতের, সাধ্য-সাধনার ফলে সাড়া মিলিল নিকটস্থ সুতাকলে। সেখানে ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিল। দুঃখ ও অভাব অসন্তোষ ঐক্যে রূপ-গ্রহণ করিতে লাগিল। বাক্যহারা মানুষের মুখেও কথা ফুটিল: যুদ্ধকালীন মাগগী ভাতা কমাইলে চলিবে না। কথায় কথায় জরিমানা, বাড়তি খাটুনি কেন? তাঁত-ঘর বন্ধ রাখিলেও তাহা মজুরেরা সহ্য করিবে না।

'সহ্য করিবে না'?—সেকেণ্ড ফোরম্যান চক্রবর্তী জ্বলিয়া উঠে। খুব কথা বলিতে শিখিয়াছে দেখি এই মাদ্রাজী মাগীটাও। দু টাকার জন্য কাহারও অঙ্কশায়িনী হইতে যাহাদের আপত্তি হয় না সে মাগীদেরও এত কথা। গলা-ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবে—রুক্মিনী মারিয়াম্মাকে সেকেণ্ড ফোরম্যান চক্রবর্তী। চক্রবর্তী ছোকরা নয়, যথেষ্ট সে দেখিয়াছে; কাজও জানে। মেয়েমানুষ লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি সে করে না। তাই মেয়েমানুষের ঢং, ভড়ং, মুখে মুখে কথা কওয়াও কাজের সময় সে বরদাস্ত করে না। ওসব ফষ্টি-নষ্টি করুক তাহারা রায় বা সিং-এর মতো ফক্কর আর লক্করদের সঙ্গে। সে

বি. বি. চক্রবর্তী— সেকেণ্ড সিনিয়ার ফোরম্যান। হি উইল্ স্ট্যাণ্ড নো ননসেন্স্।

কিন্তু 'ননসেন্স্' নয়, গোলমাল বাধিয়া গেল। কোথা হইতে রুখিয়া আসিল বিলাসপুরী মেয়েটা—মংগলী। উঠিয়া মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল—সেই বাঙালী মেয়েটিও—সাত চড়ে যার মুখে রা সরিতে দেখে নাই কেহ,—'বিলুর মা' পার্বতী। আর কোথা হইতে তারপর ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল মাদ্রাজী, ওড়িয়া, বাঙালী, হিন্দুস্থানী নানা জাতের পুরুষ! শেষে ইঞ্জিন-ঘরের রশিদ, মামুদ পর্যন্ত। সকলে কাজ বন্ধ করিয়া দিল।

হরতাল! দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল!

দেশলক্ষ্মী মিলে হরতাল? দেশের একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বাঙালীর নিজস্ব কাপড়ের কল,—তাহাতে হরতাল!

তপন তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আকস্মিক উদ্দীপনা ও দুইদিনের সতেজ সংগ্রামের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল বাঙালী রশিদ মিঞা আর হিন্দুস্থানী সুখারী, 'বিলাসপুরীয়া' মংগলী আর বাঙালী পার্বতী। জান মহম্মদ সর্দার আর জাফর আলী বিক্ষুব্ধ হয়। লোকগুলার স্পর্ধা বাড়িয়াছে—সর্দারকে বলা নাই, কওয়া নাই, হরতাল করিয়া বসে। জাফর আলী শেখ সুখারীকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয়। হাঁ, বিহার মুলুকের মানুষ তাহারা দুই জনেই। তাঁতঘরের 'জাফর চাচাকে' না জিজ্ঞাসা করিয়া তবু বাহির হইয়া গেল সকলে? আর সুখারীই গেল তাহাদের আগে আগে? ইমান বলিয়া একটা জিনিস আছে। এই সুখারীকে কারখানায় ছোট ফোরম্যান সাহেবের ক্রোধ হইতে জাফর চাচাই সেবার বাঁচায় নাই কি? সকলকেই 'চাচা' আপনা ব্যাটার মতো দেখে! উনিশ বছরের কাজ তাহার। আগে ছিল মেটিয়াবুরুজের কেশোরাম মিলে। শেঠী সাহেব তাহাকে লইয়া আসেন 'দেস্ লক্স্মীতে'। এই কলের প্রথম দিন হইতে এখানে আছে জাফর আলী। কী-না দেখিয়াছে সে এই কলের, কী না করিয়াছে! প্রথম দিনে ম্যানেজার সাহেব আসিয়া বলিলেন, 'কারখানা

আপনাদের হাতে, শেখ সাহেব। আমরা সবাই মিলে এ কারখানা গড়ছি।' সেই জাফর আলী শেখ কী এখন পাইতেছে? বেইমান মালিক! উনিশ বছরেও তাহার অভাব যায় নাই। তবু তাহার তাঁতখানার মানুষেরা কেহ বলিতে পারিবে না 'চাচা' কাহাকেও সাহায্য করে নাই। ম্যানেজারকে সে বলিলে কবে জাফর শেখের কথা না রাখিয়া পারিয়াছে ম্যানেজার? কিন্তু এইবার জাফর চাচার সেই মাথা তাহারা হেঁট করিল। একটা বার জিজ্ঞাসা করিল না তাহার তাঁতঘরের লোকেরা তাহাকে! হরতাল করিয়া বাহির হইয়া গেল। আর কাহার কথায় করিল হরতাল?—এই অ্যাকাউন্টের কেষ্ট মল্লিক, আর এই বাহিরের 'ভটচার্জি বাবুর' কথায়। এই সব 'বাবু-'দের চিনিতে দেরি আছে মজুরদের। কেন সুখারীরা হরতাল করিয়াছে? সেই মাদ্রাজী আওরাতকে মারপিঠ করিয়াছে চক্রবর্তী? 'বুরা কাম।' কিন্তু কলের আবার আওরাত!—জাফর ঘৃণায় মুখ বাঁকায়—'আধা কসবি, আধা জনোয়ার'। 'বিলাসপুরীয়াকে' কি নতুন দেখিতেছে জাফর? কামারহাটির কলে ছিল এই মংগলী পাঁচ বৎসর। তখনো 'ছুকরি' ছিল। এখনো কপালের দাগ রহিয়াছে 'বিলাসপুরীয়ার'—ওর মরদের মার। সেখানে ফিরিঙ্গি সাহেবদার পেয়ারের হইয়াছিল তখন ছুকরি মংগলী: চোখে মানুষ দেখিত না সেই কলে। তারপর জুটিল উহাদের সর্দারের সঙ্গেই, শাহাবাদের এলাহি বকুনের সঙ্গে। তারপরে 'বিলাসপুরীয়া' পলাইয়া আসে এপারের চটকলে। সেখান হইতে আবার এই পাঞ্জাবী গেন্দা সিংএর সঙ্গে জুটিয়া এখন দেশলক্ষ্মীর সুতা কলে আসিয়াছে। ইতিমধ্যেই এখানে মংগলী কত জনের সঙ্গে কত কাণ্ড করিয়াছে তাহার ঠিক নাই। হাঁ, হাঁ, বাঙালী আউরাতকে দেখিয়াছে জাফর আলী;—ওই পার্বতী। বাঙালী আউরাত: ভালো হইলে কলে আসে কভি বাঙালী জেনানা? হুঁ, আসিতেছে আজকাল? আকাল দেশে পড়িয়াছে, জানে জাফর আলী। কিন্তু জানে—আসেও তেমনি আউরাতই। আসিবে এই মথুরার বউ? হাঁ, গ্রামের বাড়ি বাড়ি যায়, ঘরে দুয়ারে কাজ করে, ধান ভানে, আপনা পেট গুজ্‌রায়—তব্‌ভি কলে আসিবে না। ইজ্জত থাকিবে

বাঙালী আউরাত কলে মজতুরনী হইবে না। আর এই মাগীদের কথায় নাকি এখন মামুদ, রশিদের সঙ্গে মিলিয়া সুখারী এই কারখানায় গোল পাকাইতেছে —'চাচাকে' একবার 'পুছলও' না।

তথাপি তৃতীয় দিনে হরতালের জয় হইয়াছে। তখন সেকেণ্ড ফোরম্যান নাই। তাহার পদচ্যুতি হইয়াছে কিংবা ছুটি মিলিয়াছে। কিন্তু সর্দার, দর-ওয়ান, ফোরম্যান কাহারও নিকটে আর মাথা নিচু করে না—পনের শত এই দেশলক্ষ্মী কাপড়ের কলের মজুরেরা—মেয়ে বা পুরুষ। ইউনিয়ন জাঁকিয়া উঠিল। সভ্য হইবার জন্য আপিসে ভিড় লাগিয়া গেল। শিফ্‌ট শেষ হইতে না হইতে সংঘের ফরম্‌ ফুরাইয়া যায়। চাঁদায় ইউনিয়ন ফণ্ড ভরিয়া উঠে।

লাল ঝাণ্ডা উড়াইয়া ফ্যাক্টরিরই সামনে একটা চালের দোকানে দোতলা টিনের ঘর ভাড়া লইয়া বসে ইউনিয়ন আপিস। কাজের শেষে মজুরেরা জটলা করে। দাবিদাওয়ার কথাই আলোচনা করে, কারখানার সমস্ত অন্যায়ের হিসাব লইয়া বসে, কল্পনা করে আগামী দিনের হরতালের— অ্যাকাউণ্টের মল্লিক বাবু আর ইউনিয়নের তপনের সঙ্গে। মজুরেরা কারখানায় যখন যায়, যায় বিজয়ীর মতো। কারখানাটা যেন আর ম্যানেজার ও মালিকের নয়। তাহারা এক রোজও কল চালাইতে পারে নাকি? সে তো দেখাই গেল। মজুরেরাই কল চালায়, উহাদেরই জিনিস কারখানা। কল উহাদেরই জিনিস যখন, উহাদেরই বাঁচিবার দাবিও মানিয়া লইতে হইবে প্রথম তখন ;—মালিকদের লুঠ ও খুন-শোষণ আর আগেকার মতো চলিবে না।

সত্যই সুখারী আর রশিদ মিঞা, মংগলী আর পার্বতী একটা তোলপাড় বাধাইয়া দিয়াছে দেশলক্ষ্মী মিলে। কেষ্ট মল্লিককে হাত করিবার চেষ্টায় লাগি-লেন ম্যানেজারেরা। অনেকখানি বেতন বৃদ্ধি আর প্রমোশনের প্রলোভন ; মল্লিকের নিকট উহা তুচ্ছ করিবার মতো জিনিসও নয়। মধ্যবিত্ত চাকুরিয়া সংসারে অভাব-অনটনের অন্তত অভাব নাই। কিন্তু কিছুতে তাহা শেষও হইবে না তাহাও কেষ্ট মল্লিক জানে। ছোট বোনের বিবাহ—দুই দশ টাকা

বেতন বাড়িলেও সম্ভব হইবে না। পিতার চোখের দৃষ্টিও তাহাতে ফিরিয়া আসিবে না। কেষ্ট মল্লিককে ম্যানেজাররা পক্ষে পাইল না। তপনকেও পাওয়া গেল না—না কলেজের মারফতে, না তাহার আপন আত্মীয়দের মারফতে। তাহাকে অবশ্য পাইবার কথাও নয়, লোকটা ক্ষ্যাপা। তাহা ছাড়া পাকা কমিউনিস্ট। এ দেশের কমিউনিস্ট—অর্থাৎ ছিল ইংরেজের পুষ্যি পুত্র। তাই উহাকে এই অঞ্চল হইতে সরাইতে হইবে, এখানে ঢুকিলেই মার দিতে হইবে। অবশ্য দেরি করা প্রয়োজন। সুখারী আর রশিদ আলিও যে এত পাজি হইবে তাহা ম্যানেজার সাহেব বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে টেক্স্‌টাইল ইন্‌জিনীয়ারিং শিখিয়াছেন, ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্টের পক্ষপাতী। মনে মনে তিনি নিজেও তো সোশ্যালিস্ট। আর '৪২-এও কামতাপ্রসাদ তাঁহার বাড়িতে দুই দিন ছিলেন। অর্থাৎ থাকিবার কথা ছিল।—কিন্তু সুখারী রশিদের কাণ্ডটা ছাখো? ব্যাটাদের ভারী গুমোর হইয়াছে—'নেতা' হইতে চায় নিশ্চয়। সেরূপ ব্যবস্থাই করিতে হইবে জানু সর্দার আর জাফর মিঞাকে দিয়া। কিন্তু তাহাতেও আবার একটু দেরি করিতে হইবে, তারপর ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত না হয় জবাব দিতে হইবে দুই-একজনকে; একটা গোলমাল বাধিয়া উঠিবে তাহাতে। সেই সম্পর্কেও তাই আগেই ব্যবস্থা করা চাই,—সেইরূপ কথাও হইয়াছে মন্ত্রীদের সঙ্গে। তাঁহারা চান—মিলের মধ্যে কংগ্রেস মজদুর সংঘের ঢুকিবার মতো সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। না, সোশ্যালিস্ট মজদুর সভা-টভা মন্ত্রীরা পছন্দ করেন না; উহাতে কাজ হইবে না। মিলের সম্মুখেই একটা ভালো ঘর ভাড়া লইয়া কংগ্রেস মজদুর সংঘের আপিস খুলিয়া দিবেন মিলের মালিকেরা। ম্যানেজার, দরওয়ান, সর্দার, সবাই উহার সভ্য হইবে; পুলিস তো আছেই। মজদুর সংঘের লোকেরা আপিসে বসিতে আরম্ভ করিবে।

তথাপি এই সবে একটু দেরি করিতে হইবে···

'একটু দেরি করিতে হইবে, একটু দেরি করিতে হইবে'···যাহাই করিতে চাহেন ম্যানেজার সাহেব—'একটু দেরি করিতে হইবে।' কিন্তু দেরি করি-

বার মতো সময় যে নাই। প্রতিদিন মজুরদের সভা, প্রতিদিন মিছিল, নতুন নতুন দাবি—'রেশন কাটা মানব না,' 'খুন-চোষা চলবে না'—চারিদিক যে গরম। কলের মেয়েগুলি পর্যন্ত আর ভয় করে না কর্তাদের। দেখো না কাণ্ড তাহাদের।

সাত চড়ে কথা সরিত না মুখে সেই মেয়েটার—পার্বতী। বাঙালী মেয়ে। দরিদ্র হইলেও ভদ্রঘরেরই মেয়ে। ভালো কায়স্থ তাহারা। ভাই চাকরি করিত বেলুড়ের অ্যালুমিনিয়ম কারখানায়। আকালের দিনে পার্বতী পূর্ব বাঙলার বাড়ি ছাড়িয়া আসে। স্বামী রুগ্ন, দেশে কোনো মহাজনের ঘরে খাতা লিখিত। অভাবে ও অসুখে চলৎশক্তিহীন, বাতে অচল। ছেলে ও মেয়ে লইয়া পার্বতী প্রথম আসিয়াছিল বেলুড়ে ভাইয়ের নিকটে। কোনো ভদ্র-লোকের সংসারে গৃহকর্ম পাইবে না কি? কিন্তু তখন চালের মণ চল্লিশ টাকা; 'রেশনের'ও ব্যবস্থা হয় নাই। ইচ্ছা থাকিলেও আর খাওয়া-পরা দিয়া ঝি-দাই রাখিবার সাহস অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের বিশেষ নাই। তাহার উপরে যাহার দুইটি ছেলেমেয়ে আছে, তাহাকে কে গৃহে স্থান দিবার কথা একালে ভাবিতে পারে? ভাইএর চেনায় ও চেষ্টায় পার্বতী আসিল 'দেশলক্ষ্মী মিলে' কাজ লইয়া। ভয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু আর উপায়ও নাই। দেশে স্বামী আছে কি নাই, জানে না। কিন্তু এখানে ছেলেমেয়েদের আর বেশি দিন বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা বোঝে! দাদা ভরসা দিলেন, 'দেশলক্ষ্মী মিলে মল্লিক আছে।' সে দাদার পরিচিত, তাঁহার শ্বশুরবাড়ির দেশের লোক, একটু জানাশুনাও ছিল গ্রামে। মল্লিক এক সময়ে 'স্বদেশী' করিত। তারপর এখন কি হইয়াছে সেই মল্লিক, তাহা কে জানে? কিন্তু আপাতত পার্বতী দেখিল কারখানায় রেশন দেয়; নিজে ও ছেলেমেয়ে তাহাতে বাঁচিবে। এমনকি দুই এক টাকা স্বামীকেও পাঠানো সম্ভব হইতে পারে। পরে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবে। তাই বলিয়া এখন বাঁচিবার চেষ্টাও করিবে না? অন্তত যাহাই থাকুক পার্বতীর অদৃষ্টে, ছেলেমেয়েদের সে না খাইয়া মরিতে দিবে কি করিয়া?

না, পার্বতী কিছুতেই ভয় পাইবে না। যে করিয়াই হউক বাঁচিবে, ছেলে-মেয়েদের বাঁচাইবে। যত অপমান থাকুক কলের কাজে, যত ভয় থাকুক ইজ্জতের। সে নিজে যদি ভালো থাকে, কাহাকে তাহার ভয়?—দাদা অবশ্য কথাটা বলেন ভগ্নীর ভার হইতে নিষ্কৃতি চাহেন বলিয়া। কিন্তু কথাটা সত্য।

পার্বতী নিজে বাঁচিয়াছে, ছেলেমেয়েদের বাঁচাইয়াছে, স্বামীকেও এখন দেশ হইতে আনাইয়াছে। কারখানারই লেবর কোয়ার্টার্সে তাহাদের স্থান করিয়া দিয়াছেন ম্যানেজার সাহেব নিজে। হাজার হোক, তিনি বাঙালী; বাঙালী মেয়ে-মজুরের জন্য একটু 'সিম্প্যাথি' না রাখিলে চলিবে কেন? তাহা ছাড়া মেয়েটি মুখে রা কাড়ে না, কাজেও নিয়মিত আসে। স্বভাব-চরিত্রও নাকি ভালোই,—মানে, যতটা ভালো হইতে পারে কারখানায় কাজ-করা এই সব মেয়ের। কতই বা ভালো হইবে? কি করিয়াই বা কেহ ভালো থাকিতে পারে? যে সংসর্গ!—একদিকে এই সর্দার, বাবু, ফোরম্যান, মিস্ত্রি-গুলির প্রলোভন উপদ্রব, অন্যদিকে ওই মাদ্রাজী, বিলাসপুরী প্রভৃতি মেয়ে-গুলির সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করা: ইহার মধ্যে ভালো থাকিতে চাহিলেই বা ভালো থাকিতে পারিবে কেন কেহ?—বিলাতেই কি থাকে? কোনো দেশেই থাকে না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে ম্যানেজার সাহেবের। তাহা ছাড়া পার্বতীর বয়সও এমন কিছু নয়। শরীর দুঃখে তাপে বেদনায় ক্লান্ত, ম্লান হইলেও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অবশ্য তাহার ছেলে-পিলে আছে; ঘরে একটা স্বামীও আছে—যদিও পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আর নিজেও পার্বতী দেখিতে ময়লা। যাহা হউক, ম্যানেজার সাহেব বোঝেন—পার্বতী কিছুটা বুঝিয়া-শুঝিয়া চলিলেই যথেষ্ট।—সে 'সীতা-সাবিত্রী' না হইতেও পারে।

সেই পার্বতী ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। কথা এখনও বেশি বলিল না। কিন্তু যাহা বলিল, বলিল স্পষ্ট--গুছাইয়া। কেহ তাহাকে শিখাইয়া-পড়াইয়া তৈয়ারী করিয়া দিলেও ম্যানেজার অবাক হইতেন। কিন্তু সেরূপ সুযোগও পাইবার কথা নয়। পার্বতীকে একেবারে কাজ হইতে তিনি হঠাৎ

ডাকাইয়াছেন। যত তিনি বুঝান মেয়েটা কিছুতেই মানিল না—তাহার ভাগ্য ভালো। সে মরিতে বসিয়াছিল, এখন ছেলে-পিলে-স্বামী লইয়া খাইয়া পরিয়া আছে—এই সত্যটা যেন একটা সামান্য কথা। উলটা বলিতে চাহে, পরিশ্রম ও গঞ্জনার মূল্যে যাহা পাইবার তাহাই সে পাইয়াছে। তাহার স্বামীর চিকিৎসা হয় না; দুইজনে রেশনের চালে আধা-পেটা খায়; ছেলেমেয়ে দুটিকে খাওয়াইতে হয়; বিলুকে পাঠশালায় পাঠাইবার পয়সা নাই; নিজের অসুখ-বিসুখ থাক, ছেলেটার জ্বর হইলেও একবেলা কামাই করিবার তাহার জো নাই। অথচ কাজ কি কারখানায় এই কয় বৎসর কম হইয়াছে? যুদ্ধের সময়ে তো মালিকেরা পাঁচগুণ মুনাফা লুটিয়াছে। পার্বতী অবশ্য সব হিসাব জানে না; কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের নিকট হইতে শুনিতে পায়। কেষ্ট মল্লিক কেন, সবাই এসব কথা বলে। তাহা ছাড়া নিজের চক্ষে পার্বতী দেখিতে পায়--কি ছিল তখন কারখানা, চোখের উপর বাড়িয়া তাহা কি হইয়াছে এখন।

কেউ তো জোর করে তোমাকে এ মজুরিতে খাটতে বলে না। তোমরা নিজের ইচ্ছায় কাজ নিয়েছ। এখানে কাজ না পেলে তখন কি হত, মনে পড়ে?

মরতাম!

তবে?—বিজয়ীর মতো ম্যানেজার সাহেব প্রশ্ন করিলেন।

হয় না খেয়ে শুকিয়ে মরো,—নয় খেটে মুখে রক্ত উঠে মরো,—মোটের উপর মরতেই হবে। এর মধ্যে তা হলে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কি আছে?...

ইউনিয়ন আপিসে কথাটা শুনিতে শুনিতে সেদিন সন্ধ্যায় তপন প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াছিল। 'ফ্রিডম্ টু স্টার্ভ্ অর্ বী স্লেভ্':—এমন পরিষ্কার রূপে কি করিয়া বুঝিল এই অশিক্ষিতা বাঙালী মজুর-মেয়ে বুর্জোয়া ফ্রিডমের এই স্বরূপকে? আপনার অভিজ্ঞতা হইতে? তপনের উৎসাহদীপ্ত সেই মুখ অমিতের মনে আছে! তপন অতি উৎসাহী; হয়তো পার্বতীর কথাও বাড়াইয়াই বলিতেছে।

বেশ সেই বিলাসপুরীয়া মংগলীর? তার কথা তো সবাই জানে।

ম্যানেজার তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় নাই। 'পাঠাত'—মংগলী বলিয়াছে,—'একবার দেখে নিতাম।' কতকটা তাচ্ছিল্য, কতকটা ক্ষোভ মিশাইয়া সে এমনি ভাবে কথাটা বলিল যেন তাহা হইলে একটা মজাদার ব্যাপার হইত। সে সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীও বঞ্চিত হইয়াছে। কি করিত সে?

সে তুহারা না শুনিলি—তুহারা ভাল মানুষ আছিস—থাক্। মংগলী তো আর ভালো নেহি।

কি করিত মংগলী ঠিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রূভঙ্গির সঙ্গে কালো দেহের মধ্যে এমন একটা তরঙ্গ খেলিয়া যায় যাহাতে অদ্ভুত রহস্যময় সম্ভাবনায় ভরিয়া উঠে তাহার উক্তি। তপনের কল্পনা যেন একটা উত্তেজনা পায়—সেই কথাটি আশ্রয় করিয়া নানা কল্পনায় মাতিতে। হাস্যকর ঔদ্ধত্যের কল্পনা, অসংযত ইয়ার্কির কল্পনা, আর অসংকুচিত লাস্যবিলাসের কল্পনা,—কোনো-টাই যেন 'বিলাসপুরীয়ার' কথা, চক্ষু, অনতিব্যক্ত দৈহিক ভঙ্গি হইতে কল্পনা করিতে কষ্ট হয় না। কষ্ট হয় না এই বলিয়াই বোধ হয় যে. সে 'বিলাসপুরীয়া'। শুধু দেহের ভঙ্গিই নয়, তাহার ইতিহাসও এইরূপ রহস্যের পরিপোষক। কিছুতেই তাহার সংকোচ নাই, কিছুতেই তাহার শঙ্কাও নাই। এই কলের যে মিস্ত্রি-ফোরম্যান গেন্দা সিংকে সে সত্য সত্যই ভালো লাগিয়াছে বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকেই আবার হরতালের প্রারম্ভে অব-লীলাক্রমে ব্যঙ্গ করিয়া, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিতে জানে। আবার তাহারই জন্য এখন মংগলী হরতালের শেষে ইঞ্জিনীয়ার 'কোয়ার্টারের' আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া মরিতে পারে।

মংগলী বলিবে—যখনকার বিরোধ তখন গিয়াছে, এখন তাহার জের টানা কেন। 'তুহার আপনকার লোক আসবে; পরিবার আনিবি; বহু আসবে;—তখন কি মংগলী আসবে তুহাকে ডাকতে, সিং? আসবে না। তুহার ইজ্জত আছে, তুহার বহুরও ইজ্জত আছে। সে তুহার যেমন

আপনার ; মংগলীর ইমান, মংগলীর ইজ্জত, উভি ঐসা মংগলীর আপনার। তখন হরতালের রোজ ছিল। তুহার সকলেরই সাথে হামাকার লড়াই। মালিক ম্যানেজার অফ্‌সার ইঞ্জিনীয়ার—সকল গোষ্ঠীর সাথে লড়াই তখন হামাকার গোষ্ঠীর, মজুর-মজুরনী সবাইকার। দুজাতের লড়াই,—তুহার জাতের, হামার জাতের। তু হামাকে তখন ছুঁবি? হামার জাত নেহি? হামার জাতের ইজ্জত নেহি? দুশমনের জাত, লড়াইর ওক্‌তে আস্‌বি হামাকে ছুঁতে? তু দালালি করতে বলছিলি—'তেরী ভারী তলব মিলেগা, তুমকো খুশী কর দেগা মালিক লোক'। থুঃ! থুঃ। তুহার ইমান আছে, সিং; তুহার জাতের ধরম তুই রাখলি। আর হামাকে বলছিলি হামার জাতের ধরম হামি ছাড়ি দিই।'

বিলাসপুরীয়ার এই যুক্তি শুনিয়াছে সুখারী, শুনিয়াছে কেষ্ট মল্লিক। তাহাদের মুখেই উহা শুনিয়াছে তপনও। বিলাসপুরীয়াকে লইয়া এই মুশ-কিল। সে কিছুতেই ভয় পায় না। লড়াই বাধিলেই খুশী। কিন্তু তাহার পরে? —যে-কে সেই। কাহার সঙ্গে ভাগিয়া পড়িবে হঠাৎ, কোথায় মদ খাইয়া গানে নাচে মাতিবে; তারপর বেঁহুশ হইয়া দিন কাটাইয়া দিবে। একেই তো মিলের এলেকা; 'বিলাসপুরীয়া' মেয়েগুলি এইসব দিকে লজ্জা, শরম, নিয়ম-নীতি বিশেষ মানিতেও চাহে না। ইউনিয়নের কাজে উহাকে দৈনন্দিন পাইবার জো নাই; অথচ সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিলাসপুরীয়া আসিয়া দাঁড়াইবে সর্বাগ্রে। যেমনি সাহস—তেমনি বুদ্ধি।

সেই সাহস, সেই বুদ্ধিই মংগলীকে টানিয়া লইয়া যায় যৌন-পিপাসার ও উৎকট বিলাস-লাস্যের দিকে—তপনের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। প্রাণশক্তি মংগলীর প্রবল। আপনাকে উচ্ছ্রিত করিতে না পারিয়া আপনার মধ্যে গুমরাইয়া গুমরাইয়া মরিবে, সভ্যতার এমন সংযম-শিক্ষা তো মংগলীর ভাগ্যে জোটে নাই। কিছুই মংগলী মানেও না। তবু কাজের মধ্যে, মজুর আন্দোলনের বিপুল উত্তেজনার মধ্যে একবার যদি উহাকে ডুবাইয়া ফেলা যায়—তাহা হইলে? তাহা হইলে এই সংকোচ-শঙ্কাহীনা মেয়ে নতুন

মানুষ হইয়া উঠিতে পারে না কি ? দেশলক্ষ্মী মজুর ইউনিয়নের মধ্য হইতে উত্থিত হইতে পারে না কি সত্যকারের ভারতীয় মজদুরনী নেত্রী বিলাসপুরীয়া মংগলী, আর বাঙালী পার্বতী ?

তপন তাহাদের ডাকিয়া পাঠায় ইউনিয়নের কাজে। বুঝাইতে বসে—হাঁ, একদিন তাহাদের ইউনিয়নের চিঠিপত্র হিসাব সবই মজুরদের নিজেদের রাখিতে হইবে। স্থির হয়—রশিদ, সুখারী আর বিলাসপুরীয়া ও পার্বতীকে লইয়া সে রাজনৈতিক ক্লাস করিবে।

প্রাণপণ চেষ্টায় তপন উহার সহজ পাঠ তৈয়ারী করিতেছে। কোথা হইতে আরম্ভ করিবে সে ?—কোথা হইতে ? ইতিহাসের ধারা প্রথমাবধি অনুসরণ করিয়া ? না, এই দেশলক্ষ্মী মিলের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে ? বিদেশের মজদুর আন্দোলনের পাঠ্যতালিকা দেখিয়া তপন সিলেবাস প্রণয়ন করিতে থাকে, মনে মনে বক্তৃতা ভাঁজে। তারপর কেরোসিন তেলের ডিবা জ্বালাইয়া বসে রাত্রি সাতটায় প্রথম ক্লাস খুলিয়া। উৎসাহের অন্ত নাই। কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠে প্রথমে মংগলী। নটা বাজে যে ! অনেকক্ষণ সংযত হইয়া বসিয়া আছে সে। অনেকক্ষণ শুনিয়াছে সে তপনের কথা। হাঁ, ভালো বুঝে নাই ; তবে শুনিয়াছে, সব শুনিয়াছে। কিন্তু নটা বাজিয়া গেল না ? তাহা হইলে ? হাজিগঞ্জের কলের একটা পুরানা দোস্ত আসিবে। দুয়ার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যাইবে হয়তো। আজ ভালো একটা আচ্ছা ছবি আছে ঃ 'হাণ্টারওয়ালী'। সাড়ে আটটা না বাজিতেই তাই তপনের সেদিন ক্লাস শেষ করিতে হয়। আর দ্বিতীয় দিনে নটা বাজিল, তবু আর মংগলী আসে না। পরদিন আসিয়া জানাইয়া যায়—সারাদিন খাটিয়া সন্ধ্যায় আবার পড়াশুনা,– মংগলী তাহা পারিবে না। আসলে অন্যরাও বেশি পারে না। সুখারী ঝিমাইতে থাকে। পার্বতী ঘরে গিয়া রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তবু সারাদিনের পরে এই সময়টাতেই ছেলে-মেয়ে-স্বামীর সঙ্গে তাহার কথা বলিবার সময়। তাহাও ছাড়িতে হইবে কি ? না, সপ্তাহে দুই দিনের বেশি তাই পার্বতীও আসিতে পারিবে না। আবার

ইউনিয়নের মেয়েদের মেম্বর করিবার জন্যও তাহাকেই ঘুরিতে হইবে—মংগলী স্পষ্টই বলে, উহা তাহাকে দিয়া হইবে না।

মজদুরদের ক্লাস কিছুতেই জমিল না। একা রশিদই শুনিয়া যায়, বুঝিতে চাহে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও করিয়া বসে। সে ইস্কুলে পড়িয়াছিল; উচ্চ প্রাইমারি পাস করিয়া মাইনরও পাস করিয়াছিল। নিকটে উচ্চ ইংরাজী ইস্কুল নাই, তাই কাজের খোঁজে সে তখন আসে কলকাতায়। এখানে ইঞ্জিনীয়ারিং রুমে তাহার কাজ মিলিয়াছে—সাত বৎসর যাবৎ। লেখাপড়া সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। এখন—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি পাইয়া যেমন শুষ্ক মাঠের ঘাসপাতা মাথা তুলিয়া উঠে,—রসিদের মনের সমস্ত চিন্তা যেন সতেজে বাড়িয়া উঠিতে চাহিল। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান: সে পাকিস্তানের মুসলমান, জীবিকার দায়ে হিন্দুস্থানে। এই জীবিকার শর্তটা কি? কি তাহার বর্তমান, কি তাহার ভবিষ্যৎ? পাকিস্তানে কল-কারখানার পত্তন হইলেই বা রসিদের ভরসা কি?

'মজদুরের দেশ নাই, মজদুরের জাতি নাই।' কিন্তু ইহাও আবার রশিদ জানিয়াছে—আজ মজদুরের নিজস্ব রাষ্ট্র আছে। পৃথিবী-জোড়া মজদুর-কিসান তাহাদের ভাই-বোনদের এই নাড়ীর টানও আজ অনুভব করিতেছে।

তপন খাড়া হইয়া বসে রসিদের জিজ্ঞাসায়। জিজ্ঞাসা করে, শুনবে তোমরা সোভিয়েট দেশের কথা?

শ্রমিক এলেকায় সোবিয়েত ফিল্ম দেখাইবার সাধ্য নাই। তাই উহারা দেখিতে পাইবে না 'রোড্ টু লাইফ'। যাহাদের আপনার কথা, তাহারাই দেখিবে না। তপন চটিয়া যায়, বড় জোর উহা দেখিবে মধ্যবিত্ত শৌখীনেরা, আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু যাহারা দেখিলে বুঝিবে, মানিবে, আর তাহাতে পৃথিবীর নতুন শক্তির সঞ্চার হইবে, তাহারাই দেখিতে পায় না। কোনো ছবিঘরের মালিক সেই সব ছবি দেখাইতে দিবে না নিজের ঘরে। তপন অগত্যা ছবির বই লইয়া আসে। ডাকিয়া আনে ইউনিয়নের আপিস-ঘরে মজুরদের। পার্বতী লইয়া আসে মাদ্রাজী ও বাঙালী

মজুরনাদের। বিলাসপুরীয়া মংগলীও শুনিয়া দেখিতে আসে; দেখিয়া লাফাইয়া উঠে—'বাহাদুর, মজদুর মেয়ে! অমন তাহাদের বেশভূষা, হাসি, রং! আর এদেশে তুহরা বাবুরা কিনা আমাদের বলিস 'প্যাঁচা হইয়ে থাক্'। যেমন তুহরা সব, তেমনি হামরা সব।'—এমন করিয়া তপন ও মল্লিকের দিকে দেখাইয়া পার্বতী ও অন্য মেয়েদের দিকে মংগলী হাত বাড়াইল যে তাহার উপহাসে হাসির রোল পড়িয়া গেল।

তপন বলিল, ঠিক। তবে আগে দেশ ও-রকম করে না নিলে মেয়েরাই বা ও-রকম হবে কোথা থেকে?

তা কর না, বাবু, দেশ অমন? কিন্তু কই? তুহরা তো সব পণ্ডিত বানাবে, ইস্কুল খুলবে, ভালো মানুষ হবে, গরীবের ভালাই করবে।—দাঙ্গা-ফ্যাসাদ, হরতাল, ইন্‌কেলাব্ করবে কেনে?

তপন বুঝায়, ইন্‌কেলাব-ই তো করতে হবে—তৈরী করো, তৈরী হও।

মংগলী বলিল, সে তুহরা করো। ওসব হামাকের দিয়ে হয় না,—গজর-গজর বুকনি। লড়াই লাগুক্, হামিও লাগব কামে।

মংগলীর উপহাসে তপনের অর্ধসুপ্ত আত্ম-সমালোচনা তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। ক্লাস করিবার, মজুরদের 'ভালাই করিবার' কাজেই কি মজুরদের সত্যকারের ভালো হয়?

দেশলক্ষ্মীর বিজয়ী শ্রমিকদের,—এতগুলি সংগ্রামমুখী সেই শ্রমিকের উদ্যম-উৎসাহকে জুড়াইয়া দিতেছে না তো তপন? ইউনিয়ন গড়িবার ঝোঁকে, দাবির হিসাব-পত্র পাকা করিবার নামে, শ্রমিকের 'একাই', সংগঠন, সুদৃঢ় করিবার অজুহাতে, ভাবী সংগ্রামের জন্য 'ফণ্ড' তুলিবার প্রয়োজনে,—এই যে দেশলক্ষ্মীর ইউনিয়ন-নেতারা সময় কাটাইল,—তাহাতে ছোটখাটো অসন্তোষ-গুলিকে অবশ্য ইতিমধ্যে দানা বাঁধিবার সময় দিল, দাবিগুলিকে মজুরদের মনে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল,—কিন্তু ইহার মধ্য দিয়া কি মজুরদের এই বিজয়প্রবুদ্ধ উৎসাহ স্তিমিত হইতেছে না?

মোতাহের বুঝাইতে চাহিল—আকস্মিক আঘাতের ফলে একবার যা হয়

বিজয় সহজে লাভ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মাতাল হইয়া উঠিয়ো না। কি তোমাদের সংগঠনের জোর? কি আছে তোমাদের ফণ্ডে? ট্রাইব্যুনাল, আর্বিট্রেশনের পথ ছাড়া উচিত নয়।

অমিতেরও মনে হইল—বড় উগ্র, বড় ধৈর্যহীন তপন। কর্মকে চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া লইবারও যেন সময় নাই; তথ্য ও তত্ত্বের অন্বাঙ্গিত্ব বুঝিবার মতো অভিজ্ঞতা সে লাভ করে নাই। এইরূপই হইবার কথা; সংশয়-তাড়িত বলিয়াই না হ্যামলেট্ ঝাঁপাইয়া পড়ে উগ্রতম উন্মাদনায় কর্মক্ষেত্রে। পুথিপড়া মধ্যবিত্ত সমাজের মহৎ-কল্পনার ও মহৎ-প্রয়াসের ঘূর্ণীপাকে জড়িত বাঙালী বুদ্ধিজীবী আমরা—হ্যামলেট্স্ অব দি এজ্?...

অমিত জানে সেদিন হ্যামলেটের চিন্তা-উদ্বুদ্ধ কর্মী চরিত্রকে সে চিনিতে পারে নাই। ভুল দেখিয়াছে কোলরিজ-এর মতো কর্মশঙ্কিত চোখে হ্যামলেট্‌কে দেখিয়া। আসলে হ্যামলেট্ কর্মবীর আর চিন্তাবীর। সেই 'হার্স ওয়ার্ল্ড্‌ও' শেষ হইতেছে, আসিতেছে আর-এক দিন—এইরূপই তাহার হ্যাম্‌লেট্স্ অব্ দি এজ্—চিন্তাবীর ও কর্মবীর, সংগ্রাম-প্রবুদ্ধ 'নতুন মানুষ'।

কিন্তু বুদ্ধিজীবী তপনের জন্য নয়, বুদ্ধিজীবী মালিক-ম্যানেজারদের চেষ্টাতেই সেই সংগ্রাম বাধিয়া গেল। ইউনিয়নের দাবি ও নোটিস মাত্র পেশ হইয়াছে, অমনি সুখারীকে লইয়া গোলমাল বাধিল সর্দারের সঙ্গে। তাহার তলব কাটা যাইবে। তাঁত-ঘরে কাজ নাই বলিয়া কিছু মজুরের উপর নোটিস হইল। নোটিস হইল কিছু মেয়ের উপর; আর তাহাদের মধ্যে পার্বতীও আছে। ইউনিয়ন নেতাদের মধ্যে শুধু রশিদেরই কিছু হইল না। সে পাকিস্তানের মুসলমান, তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে ম্যানেজার খুশী হইতেন। কিন্তু ইঞ্জিনের কাজ এই নোয়াখালী-চাটগাঁয়ের মুসলমানদের ছাড়া চলে না। অতএব, তাহাকে তোয়াজ করিয়াই রাখা উচিত। সেই ভার জাফর আলী শেখের উপর। জাফর আলীও [illegible] ত্রুটি করিবে না।

মেয়ে মজুরগুলি প্রথম কাজ বন্ধ করিল। মংগলী বিলাসপুরীয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। তিনজনার উপর 'লুটিশ' হইয়াছে। তাহারা তিনজনাই কিন্তু তাহা শুনিবে না: 'লুটিশ তুলে নাও সাহেব, নইলে দেখি কে কাজ করে এ ঘরে।' কাজ বন্ধ হইল। মংগলী আসিয়া আঙিনায় দাঁড়াইল, ডাকিল তাঁত-ঘরের মজুরদের, 'তুহারা কিরে? শুনিস নাই লুটিশ দিয়েছে পার্বতীকে, মাদ্রাজী মনিয়াম্মাকে, বুড়ি লছমনিয়াকে?'

তাঁত-ঘরের লোকেরা বাহির হইয়া আসিল।

তারপর বিপুল উত্তেজনা।

রশিদ ম্যানেজারকে গিয়া জানাইল—ইঞ্জিন-ঘরও কিন্তু বন্ধ হইবে—যদি ম্যানেজার নোটিশ তুলিয়া না লন।

দেখিতে না-দেখিতে হরতাল। দুপুরের পরে সম্পূর্ণ বন্ধ কারখানা। বুদ্ধি, পরামর্শ, সংগঠন, ফণ্ড—কোনো কিছুরই পরোয়া না করিয়া দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে মিলের সমস্ত কাজ বন্ধ করিয়া ঘোষণা করিল, 'লুটিশ উঠা লও', 'মাঙ্ পুরী করো।'

চোখে আগুন জ্বলিতেছে মংগলীর। আর তেমনি প্রদীপ্ত অগ্নি চারিদিকে। আলাপ, চেতনা, অভিজ্ঞতা—ইহার মধ্য দিয়া কখন পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে রশিদের মন। নিজের মনের আগুন পার্বতীই বা কতটা চাপিয়া রাখিবে?

কিন্তু এবার ম্যানেজার ও মালিকেরাও প্রস্তুত ছিল।···চিরদিনই প্রস্তুত থাকে সেই বিষ-কুটিল চক্রান্তকারী রাজা ও লেইরটিস্—হ্যামলেট ঝাঁপাইয়া পড়ে দুঃসাহসে তাহাদের খর্পরে। আধঘণ্টার মধ্যেই এক লরি গুর্খা পুলিস আসিয়া গেল। তখনো রসিদ ইঞ্জিন-ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া—ইঞ্জিন তখনো চলিতেছে। সেখানে দাঁড়াইয়াই দেখিল বড় দারোগা হুকুম করিল, কাজ না করিলে মজুরেরা মিল ছাড়িয়া যাক্। তারপর এক-একটা ঘরের দুয়ারে দাঁড়া[illegible] দুইজন করিয়া বন্দুকধারী গুর্খা; [illegible] বন্ধ হইল। উহার বাহি[illegible]হারা দিতে লাগিল দুই জন গুর্খা, ভিতরে দরওয়ানেরা। রশিদ ও

মামুদের আর কাজ করা হইল না। ইঞ্জিন-ঘরের দুয়ার হইতে আসিয়া তাহারা সকলের সঙ্গে আঙিনায় দাঁড়াইল। বড় দারোগা হুকুম করিতেছে—মজুরেরা মিল খালি করিয়া দিক, শান্তভাবে বাহির হইয়া যাক। না হয়, প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে লাগুক।

এবার বুঝি আগুন জ্বলে। চারিদিক থমথম।···একটা কঠিন প্রতীক্ষা। কি হয়, কি হয়!

হঠাৎ মংগলীর গলা শোনা গেল, মিল চালাবে কে রে—হামরা মিল খালি করে দিলে—ওই মোটকা ম্যানেজার?—মংগলী হাসিয়া খুন। এতক্ষণ উত্তেজনায় সকলে স্তব্ধ ছিল। হঠাৎ এই হাসিতে ফাটিয়া পড়িল মজুরেরা সকলে।

চালাবি তুহারা? চালা না দেখি—কত তুহাদের তাগদ। কেমন তুহাদের বাপের জন্ম—

কথাটা আরও একটু অশ্লীল হইতেছিল। কিন্তু মংগলীর চোখ ছিল অন্য দিকেও—চারিদিক হইতে সিপাহি-দরওয়ানে মিলিয়া তাহাদিগকে ঘেরাও করিতেছে, মিলের ফটকও খোলা নাই। কী খেয়াল হইতেই মংগলী বলিল: আচ্ছা চালা না তুহারা, চালা। দেখব হামরা।—চল্ লো, চল্,··· দেখি উহারা কল চালাক, হামরা যাচ্ছি ঘরে।···উহারা কল চালাক...পুলিস আর দরওয়ানে মাকু চালাক,···হামরা ঘরে বসে শুনি···

"চল্ চল্।" মংগলীর সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়িয়া গেল—চল্-চল্। বাহির হইয়া চলিল সকলে। ম্যানেজার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এবার নিজের আপিসের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাই তো, মিলের আঙিনায় এখন আর কাহাদের ঘেরাও করিয়া চড়াও করিবে পুলিস-দরওয়ান?

ফটকের বাহির হইতে মংগলী আবার হাঁকিল ম্যানেজারের উদ্দেশে,—দেখিস সাহেব, বাপের ব্যাটা যদি হোস বে-ইমানি করবি না—কল চালাবি তুহারা।

এদিকে ইউনিয়নের আপিসের লাল ঝাণ্ডা বাহির করিয়া লইয়া আসিয়াছে

পার্বতী আর কেষ্ট মল্লিক। দেখিবা মাত্রই উত্তেজনায় মজুরেরা জ্বলিয়া উঠিল। লাল ঝাণ্ডার সভা বসিল, লাল ঝাণ্ডার শপথ লইল। বস্তি ছাড়িয়া ছেলেমেয়ে আসিয়া জড় হইতে লাগিল। আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে শ্রমিক বস্তিতে, নিকটের পথে, দোকানে, লোকের মুখে, কথাবার্তায় 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর'।

কলেজের ল্যাবরেটরি হইতে তপন নিত্যকার মতো ইউনিয়নের আপিসে আসিতেছিল; দেখিয়া অবাক। দেখুক মোতাহের ও অমিত—তপনের উগ্রতা, তাহার বামপন্থী বাড়াবাড়ির কোনো প্রয়োজনও হয় নাই। আপনাদের সংগ্রাম-বুদ্ধিতেই আগাইয়া গিয়াছে দেশলক্ষ্মীর মজুর।

সাবধানে মজুরদের তপন একবার জানায় এক মাসের নোটিশের সময় পার হয় নাই। ট্রাইব্যুনালে আবেদনের চেষ্টাও করে নাই মজুরেরা।—

উঃ, তুহরা বাবুরা করগে—জানাইল মংগলী। মামলা, মোকর্দমা তুহাদের ভালো লাগে, তুহরা কর। হামরা যা জানি, তাই করি!

অমিত মনে মনে বিচার করে—এবার হরতাল টিঁকিবে কি? হয়তো টিঁকিবে না। 'হ্যামলেট' এই 'হার্শ ওয়ার্লডে' বলি যাইবে।—দেশলক্ষ্মীর মজদুরও হয়তো এবার হারিবে। শেষ সংগ্রামে ছাড়া কোন সংগ্রামে কবে মজদুর জিতে? তবু সংগ্রাম ছাড়া পথ নাই। আর তাই বলিতে হয় 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর'।

আগুন জ্বলিতে লাগিল। ইঞ্জিন-ঘর বন্ধ হইয়া যাইতেছে। সমস্ত মিল যেন একটি মৃত্যুপুরী। রাক্ষস পড়িয়াছে দেশে। পাড়ায় পাড়ায় শ্রমিকের উত্তেজিত পদধ্বনি, দৃঢ় পদক্ষেপ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ্ শেষ হয়। তলব মিলে নাই। মালিকেরা মিলের সস্তা রেশন বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহা না পাইলে শীঘ্রই খুনাখুনি হইবে। শুনিয়া অমিত চিন্তিত হয়। মল্লিক দিনরাত্রি ছুটিতেছে। কলেজ আর বেশীক্ষণ করা চলে না তপনের। সবদিন বাড়িতেও ফেরা সম্ভব হয় না। তিনজনে বাসা বাঁধিয়া লয় ইউনিয়নের আপিসে, ছোটে কলিকাতার শ্রমিক দপ্তরে। রেশনের কার্ড যদি বা তপনেরা আদায় করিল,

মজুরেরা রেশন কিনিবে কি দিয়া? হপ্তার তলব অল্পই বাকি ছিল। যাহা পাওনা তাহাও তবু মিলে নাই। দোকানীরা মজুরদের আর বাকি তেল নুন চাউল দিবে কি?

জাফর সর্দার দোকানীদের নিষেধ করিয়া দিল,—সাবধান! সব মারা যাইবে। এবার আর খেলা নয়। মালিকেরা আগেই এই ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন। তাই এবার আর মালিকেরা আপস করিবেন না।

মজুরদের কাহারও ঘরে চাল-ডাল নাই। ইউনিয়নের ফণ্ড হইতে কতটুকু সহায়তা হইবে? নিকটের গ্রামে যাও, কৃষক বস্তিতে যাও, গৃহস্থদের বাড়ি যাও। যে করিয়া পার সাহায্য সংগ্রহ কর। অন্তত জন-সাধারণকে মিলের অবস্থা বুঝাইয়া বল—কেন তাহারা কাপড় পায় না। তাঁতে এত কাপড় বুনিতেছে মজুরেরা, কেন তবু দেশের লোক কাপড় পায় না, বুঝাইয়া বল। যাহা পার সংগ্রহ করিয়া আন তাহাদের নিকট হইতে।

কলিকাতার মধ্যবিত্ত বন্ধুদের বাড়ি ছোটে অনুরা, সুজাতারা, মঞ্জুরা, বুলুরা।

মিলের কাছাকাছি গ্রামে যায় পার্বতী। প্রথম প্রথম গেল অনুকে লইয়া। কি বলিতে হইবে পার্বতী বুঝিতে পারে না। তারপর একা-একাই চলিল পার্বতী—অনু ইস্কুলের কাজে গিয়াছে, উহা শেষ করিয়া আসিতে দেরি হইবে। তারপর মজুর-মেয়েদেরও দুই-এক জনকে পার্বতী সঙ্গে লয়—গ্রামে চাঁদা তুলিতে হইবে। হরতালের ফণ্ড শূন্য হইতেছে। বাড়ি-বাড়ি যাইতে হইবে, অন্তত ছেলেমেয়ের খাদ্য জুটাইতে হইবে। পার্বতীর স্বামীরও খাদ্য চাই—অন্তত দিনে এক বেলা। ছেলেটাকে সে বেলুড়ে দাদার নিকটে পাঠাইয়া দিবে। হাঁ, যেমন করিয়া হোক এক সপ্তাহ—দুইটা সপ্তাহ দাদা উহাকে বাঁচাক। মেয়েটাকে পার্বতী নিজেই লইয়া ফিরিবে; যেমন পায় খাওয়াইবে, না পায় খাওয়াইবে না। তবু কাজ করিতেই হইবে;—হাঁ, কাজ করিতেই হইবে।

ধার এখনো জোটে কেষ্ট মল্লিকের। তপনেরও জোটে—এতগুলি মজুরকে একেবারে না দেখিলে চলিবে কেন।

দোকানী পশারীকে কিছু নগদ দিতে পারিলে কিছুটা তাহারা বাকি দেয় এখনো। কারণ তাহাদের বরাবরকার ক্রেতা মজুর-মজুরানীরা। জাদু সর্দারকে অবশ্য দোকানীরা বলিবে—বাকি দেয় নাই। এখন সাহায্য না করিলে ভবিষ্যতে মজুরেরা আর তাহাদের দোকান হইতে কিনিবে কেন? আর একেবারে 'না' বলিবার উপায় কি আছে? লুঠ হইয়া যাইবে না দোকান? মংগলীর চোখ দেখিলেই বুঝা যায়—বেশি আপত্তি করিলে এখনি আগুন লাগিবে এই দোকান-পত্রে। হরতালীয়া মজুরদের পক্ষে তাহা অসম্ভব নয়। বরং এইখানে মংগলীর মতো ভয়ঙ্কর মেয়ে থাকায় তাহা খুবই স্বাভাবিক। মানুষ লইয়া খেলিতে জানে এই বিলাসপুরীয়া মেয়েমানুষটা। আগুন লইয়াও খেলিতে জানে। আশ্চর্য, কেমন করিয়া সে পাহারা বসাইয়াছে জাদু সর্দারের বিরুদ্ধে। জাফর শেখের দালালি কেমন করিয়া সে ধরিয়া ফেলিতেছে। চারিদিকে তাহার দৃষ্টি, চারিদিকে তাহার গতি। কলে ও সাহেবটা কে আসিয়াছিল? 'লৈবর আফিসার? সরকারের লোক?' যে-ই হোক মালিকদের কেহ। দালালির একটা না একটা ফন্দিতে সে ঘুরিতেছে। মংগলী চিনে ওই তিলিতলা চটকলের খুনী ইউনিয়ন বাবুদের। হাঁ, হা, লম্বা লম্বা কথা; তারপর লম্বা দৌড়। সাবধান! এই পাড়ায় কোনো চায়ের দোকানীর ঘরে এই তিলিতলার ওই সব লোকদের দেখিলে কিন্তু দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা দোকানীকে ক্ষমা করিবে না।

দুই সপ্তাহ গেল। এবার মালিকেরা মিলে তালা বন্ধ করিবে। তবু জাফর সেখ ও জাদু সর্দারের সাধ্য হইল না কাহাকেও মুখ খুলিয়া হরতাল ভাঙিতে বলে! গেল তিন সপ্তাহ। সত্যই তালা বন্ধ হইল মিলে। যেন এক বারের মতো জিতিল ইউনিয়ন। চোখে মুখে দর্প মংগলীর : কোথায় ম্যানেজার সাহেবের সাঙাতরা, কল চালাইল না তাহারা? মজুরদের তো খুব কারখানা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কল চালাইল না, তার পর?

কিন্তু কল না চলিলে মজুরদেরও যে দিন চলে না। চার সপ্তাহও গেল। উড়িয়ারা বাড়ি গিয়াছে কেহ কেহ—দেশে শীঘ্রই ধান উঠিবে। হিন্দুস্থানীরাও

সকলে নাই। বাঙালীরা আশপাশের গ্রাম হইতে কাজে বেশি আসিত; তাহারাও এখন নানা খানে চাষের কাজ করিতেছে। কিন্তু মাদ্রাজীরা করিবে কি?

কোয়ার্টারে যাহারা আছে তাহারা আরও উদ্বিগ্ন হইল। মালিকেরা ঘর ছাড়িবার নোটিস দিয়াছে। পার্বতী জানাইয়া দেয়—ঘর ছাড়ার কথাই নাই। আসুক মালিকেরা যদি পারে সিপাহি লইয়া, তারপর দেখা যাইবে।

মারামারি হইবে, লাঠি চলিবে, হয়তো বন্দুকও—ভয়ে কাঠ হইয়া যায় ভয় পার্বতীর পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্বামী। ভয় কি পার্বতীই পায় না? পায়। কিন্তু পাইলেই বা সে করিবে কি? সংগ্রাম করিবে না? তাহা ছাড়া উপায় আছে কাহারও আর বাঁচিবার? দাদা ছেলেটাকে আর রাখিতে চাহেন না। মেয়েটাকেই বা আর কত দিন না-খাওয়াইয়া না-পরাইয়া রাখা যাইবে? নিজের ও স্বামীরই বা এভাবে চলিবে কিরূপে? তবু তো পার্বতীর নিজের অবস্থা তত সঙ্গিন নয়। দোকানী এখনও তাহাদের ধারে তেল-নুন দিতে অস্বীকার করে নাই। অবশ্য তাহারা আর কত দিন ঐরূপ ধার দিবে? কিন্তু পার্বতী জানে না কোথায় আর সে যাইবে। অন্য কোনো কলে? অন্য কোনো কাজে? কোথায় তাহারা কাজ পাইবে? পাইলেও সেখানেও তো সংগ্রামই করিতে হইবে। তাহা হইলে এই সংগ্রামই বা ছাড়িয়া যাইবে কেন? সংগ্রাম ছাড়া পার্বতীর বাঁচিবার পথ কই?

পার্বতীর স্বামী বলে দেশে ফিরে চল। দুভিক্ষের বিভীষিকা তাহার মন হইতে এখন মুছিয়া গিয়াছে। তাহার পক্ষে এখন বরং একঘেয়ে, অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে এই কুলি-কোয়ার্টারের জীবন-যাত্রা। নানা জাতির ঘর, নানা ধরনের মানুষ,—বাঙালী এখানে আর কেহ বিশেষ নাই। পার্বতী কাজে চলিয়া গেলে দীর্ঘ সময় সে কোনরূপে উঠিয়া আসিয়া বাহিরের আঙিনায় বসে। দেখে এই কোয়ার্টারের জীবন-যাত্রা। তাহার সঙ্গে কথা বলিবার কেহ নাই, কেহ কথা বলিতে আসেও না। কুলিদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে তাহার ছেলে-মেয়ে খেলে। একটা কায়স্থ-সন্তান সে,

ভদ্রলোক। কি ভাষায় তাহার ছেলে-মেয়ে কথা বলে, কি ভাষা শিখিতেছে তাহারা? তাহার লজ্জা হয়। কি রকম চাল-চলন এই মাদ্রাজী ও হিন্দুস্থানী মেয়েগুলির! যদি দেখিত অমিত এই মেয়ে মজুরদের চাল-চলন! বিশ্রী! চরিত্রই বা ইহাদের কিরূপ? কিন্তু পার্বতীকে এই সব বলিবার জো নাই। মানুষের তো তবু চক্ষু আছে। এই মাগীগুলির কাহারও যে লজ্জা নাই শরম নাই, চরিত্রের বালাইও নাই,—তাহা পার্বতীর স্বামী বুঝিতে পারিতেছে। সর্বদাই তো দেখে এই বিলাসপুরীয়া মংগলীকে। এ কি মেয়েমানুষ? অথচ ইহাদের সহিত একত্র কাজ করিতে যায় পার্বতীও। কাজ করে, গল্প করে, একসঙ্গে মিটিং করে—বক্তৃতাও দেয় পার্বতী। ওই কেষ্ট মল্লিক; কে সে? তবু সে বলিলে আর কথা নাই—পার্বতীকে যেন কিসে পাইতেছে। পুরুষের মধ্যে, নানাজাতীয় পুরুষের সঙ্গে গা ঘেঁষিয়া বসে, পুরুষের পাশাপাশি মিছিলে চলে; এই বিলাসপুরীয়ার মতোই হয়তো পুরুষের সঙ্গে হাসে, হয়তো পরিহাসও করে। অন্তত সভায় উঠিয়া নাকি উহার মতোই সে বক্তৃতা দেয়—বলে তাহা পার্বতীর মেয়ে। বলে অন্যান্য সকলে—'পার্বতী, তুই খুব ভালো বলিস। কিন্তু মুখ বটে বিলাস-পুরীয়ার! কিছু আটকায় না মুখে।—মুখেও না চরিত্রেও না। আশ্চর্য মেয়ে!'

অস্থির হইয়া উঠে পার্বতীর স্বামী। না, কারখানায় জবাব যখন হইয়াছে তখন পার্বতীর এখানে আর পড়িয়া থাকিয়া কি হইবে? দেশে চলুক পার্বতী। দেশে দুই মুঠা তাহারা নিশ্চয়ই খাইতে পাইবে। অবশ্য অমিত ঠিক বলিয়াছে, দেশ 'পাকিস্তান' হইয়াছে। দেশের মানুষও দেশ ছাড়িয়া এদিকে আসিতেছে। অনেকে নানাস্থানে ভিড় করিতেছে। কেহ কেহ আশ্রয়-কেন্দ্রে স্থান লইয়াছে। বেশ, চলুক পার্বতী না হয় টিটাগড়ের সেই আশ্রয়কেন্দ্রেই,—দেশের লোক আছে সেখানে। হাঁ, আপাতত সেখানেই চলুক। তবু এই কারখানার ত্রিসীমানায় আর নয়। এখানে মানুষ থাকে? মানুষ ইহারা?—কিন্তু পার্বতীকে আসিতে দেখিয়াই তাহার স্বামী ভয়ে চুপ করে। আশ্রয়কেন্দ্রের কথা শুনিলে পার্বতী ক্ষেপিয়া যাইবে। সে কি

ভিখারী, না, সমস্ত মান-ইজ্জত খোয়াইয়াছে? নিজের পরিশ্রমে রোজগার করে সে। 'নিজের জোরে খাই। আমি কেন যাব আশ্রয়কেন্দ্রে? কাজ করব, খাব, খাওয়াব ওদের। অন্যের ভাবনা কেন আমার জন্য? এই হরতাল চলেছে বলে?—আমি তো ভাবি না।'

কিন্তু পার্বতীও ভাবে। অমিত পার্বতীকে দেখিয়াছে। সে জানে—পার্বতীর চোখে মুখে ভাবনা। না, শুধু পরিশ্রম ও ঘোরাফেরার শ্রান্তি তাহা নয়, সংসার ও ভবিষ্যতের ভাবনাও আছে। তবু উহার সহিতই আছে সেই মুখে একটা সংকল্পের দৃঢ়তা। এই চেতনা—সে পার্বতী, 'দেশলক্ষ্মী মিলের' মজুর ইউনিয়নের সে একজন। নিজের পরিশ্রমে সে পরিবার বাঁচাইয়াছে, নিজের মান বাঁচাইয়াছে। কাহারও নিকট হাত পাতে নাই সে—এই কলে কাজ পাইবার পর হইতে। অমিত দেখিয়াছে তাহার শান্ত গর্ব—'কারও কাছে হাত পাতি নি আর—কাজ পেয়ে অবধি'। কাহারও গলগ্রহ সে নয়—দাদার নয়, স্বামীর নয়, সমাজেরও নয়। সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী আরও বলিয়াছে, 'দোকানী তাই আমাকে বিনা প্রশ্নে তেল-নুন ধার দেয়। কিন্তু বুঝছি ওদেরও কেমন এখন সংশয় আসছে—আমি ধার শোধ করতে পারব তো শেষ পর্যন্ত? আমি বলি, 'না, না, ভয় কোরো না। বেঁচে থাকলে কাজ করব, ধার শোধ করব।' 'না, না,' বলে তারা, 'না,—তোমার কথা ভাবছি না পার্বতী মা। ভাবছি এই মাদ্রাজীদের কথা—।' 'কারও কথা ভাবতে হবে না—ইউনিয়ন যখন আছে, ইমান তখন থাকবে।'……

কিন্তু পাঁচ সপ্তাহ ছাড়াইয়া ছয় সপ্তাহও শেষ হয় যে। কলও খোলে না, কাজও শুরু হয় না। জাফর মিঞা বলে, আর আমরা কতদিন বসে থাকব? বালবাচ্চা নিয়ে মরছি যে।

কথাটা নীরবে শোনে, পরে সমর্থনও করে ওড়িয়ারা। তারপর হিন্দুস্থানীরা। তারপর আরম্ভ হয় মল্লিক ও তপনকে প্রশ্ন। মজুর মেয়ে-পুরুষের ডেপুটেশন সঙ্গে করিয়া তাহাদের আশা-উৎসাহকে জীয়াইয়া রাখিতে কলিকাতা যায় তপন ও মল্লিক। হতাশ হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসে। তপন

শোনে—শ্রমিক মন্ত্রী হস্তক্ষেপ করিবেন না। তিনি ট্রাইব্যুন্যালও বসাইবেন না। এই শ্রমশিল্পের বিরোধিতাকারী ও 'শিশুরাষ্ট্রের' বিরুদ্ধে নানা কুৎসা-রটনাকারীদের কথায় দেশলক্ষ্মীর মজুরেরা নাচিতেছে। আগে সেই মজুরেরা হরতাল ছাড়ুক তবে মন্ত্রী-বাহাদুর তাহাদের কথা শুনিবেন।

জাফর পরামর্শ দিল ইউনিয়নে, 'ডেকে আন মন্ত্রী-বাহাদুরকে। তাকে প্রেসিডেণ্ট বানাও। ওর সাকরেদ এই কথাই বলেছেন। মজদুর সঙ্ঘের দফতরে কাল এই কথা হচ্ছিল।'

'দেশলক্ষ্মী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট হবে ওই কানকাটা মন্ত্রীটা?'—রসিদ ক্ষেপিয়া উঠে। মংগলী হাসিয়া বলে, 'ওর মুরদ্ কত? আসতে বল না উহাকে এখানে জাফর চাচা, দেখবে তাকে মংগলী বিলাসপুরীয়া'। মাদ্রাজী, ওড়িয়া, হিন্দুস্থানী, বাঙালী কেহ মংগলীর কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস পায় না। কিন্তু উপায় কি? দুই মাস চলিতেছে হরতাল, তিলতলার চটকলের ইউনিয়নের 'বাবুরাও' এইদিকে ঘন ঘন আসা-যাওয়া শুরু করে। তাহারা হিন্দুস্থানীদের বলে, 'এ ইউনিয়ন তোমাদের ফাঁসাচ্ছে, বুঝছ না? কমিউ-নিস্টদের এমনি নিয়ম—হরতাল বাধিয়ে দেশওয়ালী মজুরদের ফাঁসিয়ে দেওয়া।'

খড়দহ-পানিহাটির গ্রামের মেয়েরাও ইদানীং পার্বতীকে বলে, 'তা তোমরা এখন মিটিয়ে ফেল না? মিলটা আমাদের বাঙালীদের; ওটায় কেন হরতাল করছ?'

মনে মনে পার্বতী ক্রুদ্ধ হয়—ওদের সব কিছুতে বাঙালী আর মাড়োয়ারী। মুখে পার্বতী বলে, কিন্তু আমবা বাঙালী মজুরেরাও না খেয়ে মরছি যে, দিদি। আমাদেরও যে জবাব দিচ্ছে কাজে।

তোমরা কমিউনিস্ট হতে গেলে কেন?

'কমিউনিস্ট!' সে আমরা হব কি করে? সে সব বিষয়ের জানি কী। বুঝি কী আমরা?

তবে হরতাল করছ কেন? এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে; কমিউনিস্টরা ছাড়া হরতাল কে করে এখন?

হরতাল করলেই দোষ আর ছাঁটাই করলে দোষ হয় না? হপ্তা কাটলে দোষ হয় না? বেতন কাটলে দোষ হয় না? আধ-পেটা খাইয়ে মানুষকে মারলে দোষ হয় না? কলে তালাবন্ধ করলেও দোষ হয় না?

গিন্নীরা আশ্চর্য হন। সেই মুখচোরা মেয়েটাও ফোঁস করে। সহজ কথা তাঁহারা বুঝিয়া ফেলেন—পার্বতী আর সেই ভদ্র মেয়েটি নাই। সেই শ্রীছাঁদ লজ্জা-সহবতও তাহার আর নাই।

গিন্নীরা বাড়িতে মেয়েদের-বউদের বলেন, ওর সঙ্গে এত গল্প কি তোমাদের? তারপর পার্বতীকে জানান, ওগো ভালোমানুষের মেয়ে, যাও। তোমরা কলে কাজ কর—কলের কথা আমরা বুঝি না। তোমাদের কাজও আমরা ভাল বুঝি না, তোমাদের এসব কাণ্ডও আমাদের ভালো লাগে না।

কলিকাতার নারী সমিতির মেয়েরাও আবার দুইদিন আসিল। দেশে-গ্রামের ভদ্রলোকেরা কিন্তু উদাসীন। গৃহিণীরা বসিয়া বসিয়া সবই শুনিল। কিন্তু চুপচাপ।

তপন ও অমিত অন্যান্যদের লইয়া কলিকাতায় বাহির হইল। ট্রেড ইউনিয়নের কর্তারাও কলিকাতায় বাহির হইয়া পড়ে। কাহাকেও মধ্যস্থ খুজিয়া বাহির করা চাই! এদিকে মালিকেরাও এখন কথা চালাইতে চায়। কারণ মালিকেরা বুঝে—ক্ষতি বড় বেশি বাড়িতেছে; একটা মিটমাট হইলে মন্দ হয় না। শুধু মন্ত্রীর উপর ভরসা করিলে জয় হইবে মন্ত্রীর; কলের যে ক্ষতি হইবে তাহা উহাতে পূরণ হইবে না। কলের ইঞ্জিন-ঘর নিবিয়া গিয়াছে; কারখানার আঙিনায় ঘাস গজাইতেছে; মরিচা পড়িতেছে লোহা-লক্কড়ে। কারখানা একদিন খুলিতেই হইবে, সেদিন এই ক্ষতি পোষাইবে কিরূপে? কতদিনে তাহা তখন পূরণ হইবে?

আরও এক সপ্তাহ তবু কথাবার্তায় কাটে, তারপর মিটমাট হয়। ঠিক হয়, কেহ ছাঁটাই হইবে না, কাহারও হপ্তা কাটা যাইবে না, হরতালের সময়কার বেতন ও দাবিদাওয়ার বিচার পরে ট্রাইব্যুন্যালে হইবে।

জিতিয়াছে কি ইউনিয়ন? নিশ্চয়ই জিতিয়াছে, জোর করিয়াই বলে তপন।

আবার জিতিয়াছে দেশলক্ষ্মীর বাহাদুর মজদুর!

অমিতের মনও স্বীকার করিয়াছে—বাহাদুর মজদুর! কিন্তু তাহাদের ক্ষতি রহিয়া গিয়াছে। তপন তাহাকে জানায়,—আর হারিলেই বা কি? সংগ্রাম বাদ দিলে শ্রেণী-সংগ্রামের থাকে কি?

তেষট্টি দিন পরে কল খুলিল। লাল ঝাণ্ডা লইয়া মিছিল করিয়া গলায় মালা পরিয়া সকলের আগে চলিল ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারি কেষ্ট মল্লিক; তারপরে পার্বতী আর মংগলী, রশিদ আর সুখারী, আর জঙ্গী কর্মীরা। মুখে লাল ঝাণ্ডার জয়, ইনকেলাবের ঘোষণা; জয়জয়কার দুনিয়া কী মজদুরের। জীবনে এমন দৃশ্য আর দেখিয়াছে তপন? জোয়ারের জল যেন শুষ্ক নদীর খাতে জাগিয়া উঠিল। কানায় কানায় ভরিয়া গেল কারখানার মড়া চরা। আর কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে মজদুরদের প্রাণ। 'বাহাদুর মজদুর দেশলক্ষ্মীর।'

দুই মাস মাত্র। ট্রাইবুন্যাল বসিবে— মন্ত্রী কিন্তু তার হুকুম দেন না। বরং হঠাৎ জবাব হইল এইবার রশিদের, আর মংগলীর! তেমনি হঠাৎ হরতালও আবার সঙ্গে সঙ্গে। অমনি আসিল লরি-ভরতি পুলিস। আসিল তিলিতলার কলের ভাড়াটে দরওয়ানরা; আসিল বারাকপুরের 'জয়হিন্দ' বাবুরা। এবার প্ল্যান ঠিক ছিল। মালিকেরা দেরি করিল না—কারখানার মধ্য হইতে পুলিসে-দরওয়ানে একযোগে লাঠি চালাইয়া মজুরদের বাহির করিল। মাথা ফাটিল মংগলীর ও কেষ্ট মল্লিকের আর আরও দুইজন মজুরের। আবার তালাবন্ধ, লক-আউট। কিন্তু তারপর দিনই পাল্টা-আক্রমণ মজুরদের। ফটকের দরওয়ানদের গায়ের জোরে ঠেলিয়া ফটক ভাঙিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল বারশ' মজুর। সকলের আগে পার্বতী, সুখীয়া, রশিদ। নিজেরাই তাহারা কাজ চালু করিয়া দিল, মজুরের কারখানা মজুরেরা দখল করিয়া বসিল। দুপুরে বাহির হইতে খাবার আনাইল। তখন মংগলী আসিল, মল্লিকও আসিল। দুপুর গড়াইয়া যায়—কিন্তু কেহ কারখানা ছাড়িল না, ছাড়িবে না। কারখানা কাহার যে তাহা বন্ধ করে

ম্যানেজার বা মালিক ? একটা তাঁত যাহারা চালাইতে পারে না তাহাদের কেন এত মালিকানার বড়াই ? যাহারা কল চালু করিয়াছে তাহারাই কল চালু রাখিবে ; কারখানা ছাড়িবে না।

লরি-লরি গুর্খা নামিল দুয়ারে, ফটক ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া বসিয়াছে মজুরেরা।

অমিত শুনিয়া শঙ্কিত হইল —কি হইবে ? এখন উপায় কি ?

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি গেল। কেমন অসোয়াস্তি বাড়ে মজুরদের—এইভাবে আর কত বসিয়া থাকা যায়—কারখানার মধ্যে ? সকালে মিলের বস্তিতে কোয়ার্টারে ফিরিয়া গেল একদল—বাহিরের নানাবিধ ব্যবস্থা চাই। মোতাহের ও তপন বাহির হইতে খাবার পাঠায়। উহার কিছু ভিতরে যায়, কিছু পুলিসে ধরিয়া রাখে। ভিতরের মজুরেরা আর পারে না। বেলা বাড়িতেছে। বাহিরে পুলিসের কর্তা ও মিলের কর্তাদের ব্যবস্থাও ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাড়িতেছে। ভিতরে ? তপন খবর পায়, ভিতরেও এখন যুদ্ধের জন্য সাজিতেছে মজদুর। কেহ আর বসিয়া নাই। মংগলী আবার ব্যস্ত। সে-ই বুঝাইতেছে কোন্ পথে আসিবে পুলিস, কোথা হইতে পুলিস লাঠি চালাইবে ; কোথা হইতে গুলি ছুঁড়িবে ; কি ভাবে বাধা ও ব্যারিকেড তুলিতে হইবে প্রত্যেকটি ঘরের দুয়ারে ; প্রত্যেকটা ঘরের ভিতরে—তুলার বস্তার আড়ালে আড়ালে। তাই ভিতরে একটা নূতন উত্তেজনা।

অপরাহ্ন তখন শেষ, ফটক খুলিয়া গুর্খা পুলিস-কারখানায় ঢুকিল। লাঠি চলিল, কাঁদুনে বোমা ফাটিল, শেষে গুলি তাহাও বাদ গেল না।......

অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে—কি হইল না-হইল কিছুই স্থির বুঝা যায় না।

দেখা গেল সাতজনের খোঁজ নাই। মংগলী ও মল্লিকেরও খোঁজ নাই ; গুলিতে আহত রশিদ, পার্বতী প্রভৃতিকে পুলিস গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহারা ? তিনদিনেও তাহাদের সংবাদ পাওয়া যায় না। কেহ বলে তাহারা সম্ভবত পুলিস হাসপাতালে ; পার্বতী

হয়তো মেডিকেল কলেজেই। শোনা গেল কে একজন মরিয়াছে হাসপাতালে। হয়তো মিথ্যা গুজব; তপনের নিজেরও ঘোরাফেরা বেশি করা সম্ভব নয়। তাহার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা সম্ভবত নাই; কিন্তু পুলিস তাহার খোঁজ করিতেছে। কিছুদিন বাড়িতে না থাকাই তপনের পক্ষে ঠিক। সে কলেজে যায়, সন্ধ্যায় মিলের নিকটস্থ বস্তিতে গিয়ে কেষ্ট মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়। হরতালটা চালু রাখিতে হইবে—পুলিসের দাপটে ত্রাসগ্রস্ত হইয়া যেন মজুরেরা না ভাঙিয়া পড়ে।

মালিক-মজুরের সংগ্রাম যথানিয়মে মজুর আর পুলিস-রাজের সংগ্রাম এখন।

গোয়েন্দা আপিসে তপনকে দেখিয়া অমিত তাই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই—তপন কি করিয়া কলিকাতায় আসিল ও এখানে ধরা পড়িল! কলিকাতায় সে আসিয়াছিল কবে? তারপর দেশলক্ষ্মী মিলের সমস্ত সংগ্রাম, তপনের এই কয় বৎসরের ক্ষ্যাপামি-ভরা অক্লান্ত প্রয়াস, ছবির মতো তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথায় সেই বিলাসপুরীয়া মংগলী—তপন যাহার উচ্ছৃঙ্খল দুঃসাহসকে মনে করে বিপ্লবী সাহস? দুঃসাহসের ঐশ্বর্যে মুক্তি না পাইলে যাহা দাবাদাবি করে সুরার পিপাসায়, দৈহিক কামনার সংকোচহীন নির্লজ্জতায়? কোথায় বা পার্বতী—'সাত চড়ে মুখে কথা ফুটিত না' যেই বাঙালী মেয়ের? যে কাজ করে, আর গর্বও বোধ করে কাজ করিতে। কোথায় বা কেষ্ট মল্লিক, আর সেই রসিদ—স্পষ্টভাষী, বুদ্ধিমান, মুসলমান যুবক—যে পড়াশুনায় নতুন আস্বাদন পাইয়া উৎসাহিত, কথায় ও কাজে বিচারশীল কিন্তু দৃঢ়সংকল্প, পৃথিবীকে নতুন চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে।—এ সকলকে ফেলিয়া—দেশলক্ষ্মীর হরতালের দায়িত্ব মাথায় যখন তপনের—সে ধরা পড়িল?

তপন, ধরা পড়লে কি করে?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

তপন জানাইল, কারখানার কাছে যেখানে রাত্রিতে থাকতাম সন্ধ্যায় সেখানে কাল সংবাদ এল—থানার লোকেরা সাজছে, রাত্রিতে হানা দেবে

সমস্ত অঞ্চলে। হয়তো এ অঞ্চলটা ঘিরে খোঁজাখুঁজি করবে মল্লিক আর মংগলীর জন্য। মল্লিক অন্যত্র চলল। মংগলীর দেখাই নেই— সে ওপারে চলে গিয়েছে। কাল আবার হোলির রাত্রি। তার তো রাত্রি সেখানে কাটিবে হল্লায়। আমি ভাবলাম বাড়ি গিয়ে ঘুমোই। দোলের রাত্রিতে বাড়িতে একটু উৎসবও আছে। বাড়িতেই গিয়েছিলাম। কিন্তু কেমন ভালো লাগল না। পুলিস খোঁজ করে গিয়েছে দুদিন আগে। আজ বাড়ি ফিরছি, তা নিশ্চয় জানবে, সকালেই এসে হয়তো পুলিস হানা দেবে।···বাড়ি থেকে তাই না খেয়েই চলে এলাম. রাতটা কলকাতা গিয়ে থাকব। আপনার ওখানে গিয়ে দেখি আপনি বাড়ি নেই। সংবাদপত্রের আপিসে প্রথম খোঁজ নিলাম—রশিদদের কোনো ·সংবাদ পাওয়া গিয়েছে কিনা, হাসপাতালের কোনো খবর আছে কিনা; কিছু জানা গেল না। বললাম, কাল বোধ হয় আমাদের কারখানা অঞ্চলে পুলিসের একটা তোড়-জোড় চলবে। কে একজন বললে, এ রকম কত গল্পই শোনা যায়। ট্রেড ইউনিয়ন আপিসে গেলাম না আর। কাগজের আপিসও তখন বন্ধ হচ্ছে। অগত্যা তখন বারান্দায় ঘুমিয়ে পড়লাম। শুনলাম— আপিসে এসে কারা নাকি কাল বলেছিলেন আজ কলকাতায় বড় রকমের একটা ধরপাকড় হবে।

আমি যে কাল এদিকে আসিই নি, তপন। বলিল অমিত। হোলির দিন। দোকান বন্ধ। সন্ধ্যায় একটু দেখাশুনা করতে গেলাম পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। দেরিও হয়ে গেল যেখানে গেছলাম। ভাবলাম বরাবর বাড়ি চলে যাই।···

কে জানিত ভাগ্যের এমন চক্রান্ত? জানিত কি তাহা ইন্দ্রাণী, জানিত কি অমিত? জানিলে আজ হয়তো তুমি ধরা পড়িতে না, অমিত। ইন্দ্রাণী তোমাকে কাল রাত্রিতে বিদায় নিতে দিত না।···

তপনও বুঝি ইহাই ভাবিতেছিল। হাসিল, বলিল, দেখুন, ভাগ্য মানবেন তো? কি মানবেন—'লাক্'? না, 'ফেট্'? দৈব, না, নিয়তি?

অমিতও হাসিল।—সবই মানি। আরও বেশি মানি—মঘা, অশ্লেষা, বারবেলা, দিক্‌শূল, হাঁচি, টিকটিকি, মাকুন্দোচোপা।—আর মনে মনে বলিল, আসলে মানি—ইন্দ্রাণী, সত্যই নিয়তির মতো যার আবির্ভাব। নিয়তিই যেন। কে জানিত? এতদিন পরে দেখা, গল্প-তর্ক তো হইবেই। আর কে জানিত গল্পে-তর্কে আমার জন্যই এই বন্ধন-রজ্জু রচনা করিতেছিল বসিয়া ইন্দ্রাণী।

কিন্তু শুধু ইন্দ্রাণী কেন? অমিতও। তর্ক ছাড়িয়া, গল্প ছাড়িয়া উঠিতে সেও চাহে নাই কাল সন্ধ্যায়। অমিতের অন্য কাহারও সঙ্গে দেখা হইল না আর।

কার মুখ দেখেছিলেন আজ সকালে?

সকালে আর কাকে দেখব? এস-বি সাব্-ইন্‌স্পেক্‌টারকে। সুদর্শন যুবক ইন্‌টেলিজেণ্ট, কালচারড্ ম্যান, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্-স্ত্রী!

তপন হাসিয়া উঠিল : এত খবর জানলেন কি করে?

না জানিয়ে তিনি পারেন নি বলে। ভদ্রলোক ভদ্রলোককে ধরতে এসেছেন, একটা কালচার আছে তো আমারও।—একই শ্রেণীর, একই শ্রেণী-কালচারের আঁতাত। আমিই কি তা জানতে পেরে খুশী না হয়ে পারি? না হয় করছে গ্রেফতার। কিন্তু লোকটা ভদ্রলোক।—স্ত্রী আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট্।'

তপন হাসিল। কিন্তু কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইল এবার দৃষ্টি।

অন্যদিকে আলোচনা চলিতেছিল, যাই বল অমন লাইব্রেরিটা! কত কষ্টের বই, কত যত্নে সংগৃহীত। কত দুষ্প্রাপ্য বই রয়েছে যা এদেশে আর পাওয়া যাবে না,—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রথম দিককার লুণ্ঠনের কত প্রমাণ-পত্র, আর সংগ্রহ করা সম্ভব নয় এই সব। মঞ্জু অমিতকে বলিল, বইগুলি ওরা কোনো পাবলিক লাইব্রেরিতে দিয়ে দিলেও পারে তো? নয় রাখত ন্যাশন্যাল লাইব্রেরিতে—...

অমিত হাসিল, বলিল, বলে দ্যাখো না।

...এক-একটা বইএর সঙ্গেও এক-একটা ইতিহাস জড়িত। সে ইতিহাসই কি ভুলিতে পারি কেহ আমরা? ভাবো সেই 'সী কাস্টমস্ অ্যাক্ট' ফাঁকি

দিয়া আনা পামে দত্তের 'ইণ্ডিয়া টুডের' কথা। খান দুই কপি মাত্র আসে তখন কলিকাতায়। দুই জন বিলাতের ছাত্র জাহাজ হইতে তাহা হাতে করিয়া নামে—যেন ডিটেকটিভ উপন্যাস। ··· ভাব—সেই মার্কিন সৈনিক বন্ধুদের দেওয়া মার্কিনী সেট লেনিনের সিলেক্‌টেড্ ওয়ার্কস।···পিটার-বিন-এর দেওয়া কড্‌ওয়েল-এর 'ক্রাইসিস্ ইন ফিজিক্‌স্'। আরাকানে পিটারের মৃত্যু হয়।

অমিত ভাবনায় ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ সে শুনিল তপন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'দেশলক্ষীর' ওরা জেনে যাবে নিশ্চয় আমি ধরা পড়েছি, কি বলেন? কিন্তু সংবাদটা 'কলেজে' দিতে পারা যাবে কি?

অমিত তাকাইয়া দেখিল আলোচনা অন্যপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। আড্ডা-ও-আমোদপ্রিয় সৈয়দ আলীকে ঘিরিয়া বসিয়াছে সকলে। গল্প জমিতেছে। উহারই এই প্রান্তভাগে বসিয়া তাহারা দুইজনেই উন্মনা, অমিত আর তপন। তপনের কথা শুনিয়া অমিত বলিল: শক্ত কথা। কেন? কামাই-এর কথা ভাবছ? দ্যাখা যাক না—কতদিন রাখে, কি করে ওরা আমাদের নিয়ে!—

তপন চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল, বাড়িতে ওরা বুঝে নেবে দু-একদিন পরেই। অবশ্য, কলেজে খবর দিলে ভাস্কর তা জেনে যেত, বাড়িতেও আর বেশি ভাবত না।

একটা নূতন বাতায়ন খুলিতেছে, তাহারই যেন আভাস পাইতেছে অমিত। দেশলক্ষীর হরতালের যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নয়। যেখানে খড়দহ-পেনেটির অধ্যাপক ব্রাহ্মণ গোলোক ভট্টাচার্যের স্নেহ-সদাচার-ঘেরা সাধারণ সংসার—সেই একান্ত পরিচিত আর অমিতের অতি-সামান্য পরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার দিকে এবার তপনের মনের বাতায়নটি খুলিয়া যাইতেছে [illegible] এখানে, এখন, প্রোলিটেরিয়েটের সংগ্রাম যখন বাধিয়েছে—এই গোয়েন্দা [illegible]দের নতুন করাঘাতে। সচকিত সহজ কৌ[illegible] [illegible]ই এই অ-সহজ [illegible]কে স্বাভাবিক, সহজ করিয়া তুলিতে[illegible] [illegible]মিতের। ...

...অমিত বলিল, একটু ভাবুন[illegible]না '[illegible]

তপন ক্ষীণ হাসি হাসিল। কথা বলিল না।

অমিত সহাস্য কটাক্ষে বলিল, কে বেশি ভাববেন বলে তোমার এত ভাবনা তপন?

এবার তপনও সলজ্জ স্নিগ্ধ হাস্য হাসিল। সেই কর্মোন্মাদ তপনের মুখে এই সলজ্জ হাস্য অমিতের নূতন লাগিল। কোথায় যেন নিজেকেও মনে হইল ইহার সহিত অপরিচিত—আর অংশীদার। জোর করিয়াই কৌতুকের কণ্ঠে আবার তপন বলিল, সংসারে আমাদের ভাববার লোক আছে, অমিতদা। আমরা তো বাউণ্ডুলে লক্ষ্মীছাড়া নই। স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, মা আছেন, বাবা আছেন, চাই কি বাড়িতে গাইগোরু পর্যন্ত আছে—না হয় গোবিন্দমূর্তির কথা ছেড়েই দিলাম—তিনি ভাবনার অতীত বলে।

অমিতও একটা বহু পরিচিত পৃথিবীর রসোপভোগ করে শত অভিজ্ঞতার কৌতুকে।—

হাঁ; গোবিন্দ ঠাকুরের কথা ছেড়ে দাও। তাঁর ভাবনা নেই, তুমি না থাকলেও তাঁর পুজো-নৈবেদ্য ঠিক চলবে—যতদিন অন্যেরা আছেন। দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে তাঁর যাবে-আসবে না। বরং তুমি থাকলেই তাঁর অসুবিধা হবার কথা। গোরুটারও জুটবে কিছু; কারণ, তিনি তো গো-মাতা। মুশকিল হবে—আর তাই ভাবনাও বাড়বে—বরং স্ব-মাতার; এবং পিতার। আর যখন মূর্খের মতো নিজের দাসখত লিখে দিয়েছ তখন তোমার শ্রীচরণের দাসীই বা ছাড়বেন কেন? তারপরে ছেলে আছে একটি? না, ইতিমধ্যে সেদিকে আরও সৌভাগ্য লাভ ঘটেছে?

কোথায় আর সে সৌভাগ্য হল? পড়ে গেলাম এসব পাল্লায়, না হল আর ধন-লাভ, না হল জন-লা[illegible]

ধন-লাভের ত্রুটিটাই [illegible] সেই বিচ্যুতিটা কত দূর গড়িয়েছে?

অমিতের কৌতুকের [illegible] আর একটু উ[illegible] আসিয়া লাগিয়াছে। তোমা[illegible] পনেরও উত্তরে ফুটিয়া উঠিতে [illegible]।

এইর[illegible] নিয়ম। [illegible]আর ততটুকু হালকা করিতে পারি

আমরা মনের গভীর চিন্তাকে? পারি না, কিছুতেই পারি না। নিতান্ত স্থূল-প্রকৃতি ছাড়া কেহ ভুল করিবে না আমার কথা, তপনের কথা। তবু হালকা সুরেই বলা ভালো এই গভীর কথা। হাঁ, হালকা সুরেই বলা চলে গভীর সত্য। কিন্তু সত্যই কি তাহা বলা যায়? লিয়ারের সামনে ফুলের কথা কি পরিহাস? জাকুস্‌এর কথাই কি হালকা? না, ভোগ-শ্রান্ত জীবনের তা বিরাগ? কিংবা ফলস্টাফই শেষ পরিচয় শেক্‌সপীয়রের? হ্যামলেটে নয়? প্রোসপেরোতে নয়? এই তো দেখিতে না দেখিতে তোমার চিন্তা কেমন গম্ভীর হইতেছে। কেমন গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে তপনের কথা।...

তপন বলিতেছিল, একটু বিচ্যুতি ঘটেছে বৈকি? মা ভেবেছিলেন—ছেলে হাকিম হবে। বাবা জোর করলেন—অধ্যাপক-গোষ্ঠীর ছেলে হবে অধ্যাপক। শ্বশুর মশায় এসে সিন্থেসিস্ করলেন—'ডি. এস-সি হোক, সরকারী কলেজে ভালো মাইনের প্রোফেসর হতে পারবে।" হাঁ, তখন গবেষণায় নেমেছি, অনেক ছিল তাঁদের স্বপ্ন। আমারও তাই অদৃষ্টে পত্নীলাভ তখনি ঘটল। শ্বশুর মশায় আমাদের সমাজের; তবে প্রোফেসরি ছেড়ে ইনস্পেক্‌টরি লাইনে গিয়েছেন। বরাবরই বিদেশে থেকেছেন। কাজেই, দেশের বাড়িতে তিনি অর্থোডকস্ 'ব্রাহ্মণ মহাসভা', বিদেশের জীবন-যাত্রায় 'লিবারল' হিন্দু, মানে, একালের 'হিন্দুমহাসভা।' গৌরী বিদেশেই মানুষ হয়েছে, হাঁ, তিনিই শ্বশুর মহাশয়ের কন্যা। বিদেশে সে ইস্কুলে পড়েছে, কিন্তু কলেজে যায়নি। পাশও করেনি,—পাছে আমাদের সমাজে বিবাহে অসুবিধা ঘটে। জুতো পায়ে দেয় না আমাদের বাড়িতে। তুলে রাখে বাক্‌সে—ট্রেন ছাড়লেই পরবে বাপের কাছে যেতে। আজকাল কোন্ ভদ্রলোকের মেয়ে খালি পায়ে চলে পথে ঘাটে? সকালে উঠে আমাদের বাড়িতে স্নান সারে, চা খায় না, ঠাকুরের ভোগ সাজায়। কিন্তু গোবর ছুঁতে তার হাতের আঙুল কেমন রি-রি করে! অন্তত সেমিজ-পেটিকোট না হলেই গৌরীর নয়। এদিনে তা একটু ব্যয়-সাধ্য; কিন্তু শ্বশুর মশাই তা চালিয়ে দিতেন প্রথম দিকে। আর এত দিনে

ব্রাহ্মণ সমাজেও ওসব পোশাক আর অচল নেই। না, আমাদের বাড়িতে তা নিয়ে কোনো কথাই ওঠে নি। উঠবে কেন? মায়ের বরং একটু গর্বও ছিল—তাঁর ছেলে ইংরেজি শিখে বড় লোক হচ্ছে; বউমা বিদেশে মানুষ হয়েছে; চালে-চলনে সভ্যভব্য; ছেলের উপযুক্ত সে বউ না হলে হবে কেন? বাবার আপত্তি হয়তো আগেও ছিল না। তা ভাঙতে শুরু করেছিল আমাদের যখন ইংরেজি পড়তে দিলেন তখনই। শ্বশুর মশায়কে বলেছিলেন, 'ও সব কিছু থাকবে না, জানি। সবই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে, কালে। তাই নিয়ম।' তবু তাঁর কালের যতটুকু নিয়ম আমাদের বাড়িতে চলছে গৌরীর তা পালন করতে হত। পালন করতে গৌরীরও কষ্ট হয়নি। কয়দিনই বা এঁরা? আর কয়দিনই বা সেও এই গৃহে? আমি ডি. এস-সি হব—শ্বশুর মশায়ের ধারণা,—কলকাতায় বা অন্যখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি চাকরি নিয়ে চলে যাব; কোনো একটা শহরে থাকব,—গৌরীও তখন আপনার অভ্যস্ত জীবন যাপন করবার মতো সুযোগ পাবে। আপনার মন-মতো করে ঘর সাজাবে, বিদেশে সংসার করবে, ইত্যাদি—সেই যা বলে 'মনে ছিল আশা'। আশাটা আমারও ছিল। 'অন্যায় নয়?'···তারপর, ওলট-পালট। জন্মাল স্বপন। আর, স্বপন জন্মাবার পর থেকেই গৌরীর শরীর খারাপ, কি সব অসুখ-বিসুখ জুটেছে। আমার সময় নেই, দেখতে পারি না। মা রাগ করেন। শ্বশুর মশায়ই একবার গৌরীকে নিয়ে গিয়ে কয়েক মাস চিকিৎসা করালেনও।

তপন একটু থামিল। পরে বলিল, কিন্তু চিকিৎসার কথা তো নয়; টাকা-কড়ি অভাব-অনটনের কথাও শুধু নয়। অভাব-অনটন আছে। কিন্তু একটা বড় কথা—বাড়িতে এমন একজনও লোক নেই যার সঙ্গে গৌরী মন খুলে কথা বলে। গৌরী বলে, 'বড় একা-একা'। অথচ আমিই বা করি কি? বললে সে বুঝবে না—কলেজ আছে, দশটা কাজ আছে। বরং এসব শুনলে রাগ করে। ভাবে আমি তাকে উপেক্ষা করছি—'কাজটাই বড়, আমি কিছু নই'।—উন্মনা হয়ে যায় তপন: কেমন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন; মেজাজও ক্রমশই বিগড়ে যাচ্ছে। ছেলেটাও একটা প্রোবলেম্

হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মা কেন অমন করে থাকে, সে বোঝে না। যতো এখন বড় হচ্ছে ততো দাদা-দিদির কাছে ঠাঁই নিচ্ছে; মাকে এখন কেমন ভয়-ভয় করে। হাঁ, আমাকে অবশ্য স্বপন পছন্দ করে। কিন্তু আমি বাড়ি থাকি কতক্ষণ? করিই বা কি? এই তো দুদিন বাড়ি যাই নি। কাল গিয়েছি সন্ধ্যায়, দেখলাম গৌরীও দুদিনে এমন গুম হয়ে রয়েছে যে, তাকে দেখলে আমারই ভয় হয়। স্বপন চুপে চুপে বললে, 'তুমি থাকবে না, বাবা? মা বড় রাগ করছেন।' ওদিকে বাবাও দেখা হতেই ব্যথার সঙ্গে বললেন, 'পুলিস তোমার খোঁজ করছে। তুমি বাড়ি নেই, বৌমারও বাড়াবাড়ি হচ্ছে।' মায়ের সঙ্গে তো শেষে ঝগড়া করেই চলে এলাম। মা রাগ করছিলেন, 'কী পেয়েছ তুমি? সংসারের কথা ভাবতে চাও না। বেশ, তা না হয় না ভাবলে।' তাঁদের দিন গিয়েছে; দিন যাক। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রের উপর এমন অত্যাচার কেন আমার? পরের মেয়ে, শেষটা আমার জন্য পাগল হবে নাকি?...

অনেক দূরে, অনেক দূরে সরিয়া যাইতেছে গোয়েন্দা আপিসের সেই প্রহরী-পরিবৃত গৃহের এই বন্ধু-বান্ধবেরা, সেই তর্ক-আলোচনা, অতীত ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। সরিয়া গিয়াছে 'দেশলক্ষীর' সেই মজদুর আন্দোলনের উদ্বেল তরঙ্গ, সেই জন-তরঙ্গের শিখর-বাহী তপন ও কেষ্ট মল্লিক, রশিদ ও সুখারী; মংগলী ও পার্বতী। উন্মুক্ত দুয়ারের মধ্য দিয়া এখনো দেখা যায় ছায়া-পরিবৃত বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন মধ্যাহ্নের লর্ড সিংহ রোডের আঙিনা ও প্রাচীর। কিন্তু তাহা ছাপাইয়া, তাহা আচ্ছাদিত করিয়া উদিতা হইয়াছে এক স্বল্প পরিচিত সংসারের কোনো একটি তরুণী বধূ 'গৌরী'—যাহাকে অমিত চক্ষে দেখে নাই, হয়তো দেখিবেও না; যাহাকে তপনের সহকর্মীরা কেহ জানে না, গণনার মধ্যেও আনে না; আর যাহাকে ফিজিক্সের ফার্স্ট ক্লাশ, ফিলজফি-পড়া ভাবোন্মাদ তপনের উন্মত্ত জীবন-সাধনার মধ্যখানে কেহ স্থান দেয় নাই, দিবেও না —তপনের এই কর্মযোগের মধ্যে সে অসংলগ্না, শূন্যাবলম্বিনী।

অমিতের দৃষ্টি কেন ইতিহাস পার হইয়া যায়।

কাব্যের উপেক্ষিতা নও তুমি, তুমি জীবনের উপেক্ষিতা। ইতিহাসের

ট্র্যাজিডি তুমি এদেশের নারী, বাঙালী মধ্যবিত্তের, বিদ্রোহীর মাতা, ভগ্না, জায়া। তোমারই এক প্রতিনিধি এই সামান্য বাঙালী বধূ, তপনের তরুণী পত্নী।…হয়তো সত্যই গৌরী সে, গৌরবর্ণা, সুন্দর মুখশ্রী…অমিত তাহাকে কখনো চক্ষে না দেখিলেও এখন দেখিতেছে। দেখিতেছে—তাহার চোখেও আহত অভিমানের ব্যথা, নিষ্ফল স্বপ্নের ক্ষোভ জ্বলিতেছে; জ্বলিতেছে অবজ্ঞাত যৌবনের দাহ। কিন্তু তাহা কি তপন জানে না—এই দীর্ঘশ্বাস কি সে শোনে নাই? না শুনিলে উহার প্রতিধ্বনি অমিতের কানে এ মুহূর্তে বহন করিয়া আনিল কে, গৌরী?…তপনের মুখের হাসির ওপারেও আমি অমিত দেখিলাম তাহার চোখের ব্যথিত অনুশোচনা? দেখিলাম; আর উহার মধ্য হইতেও পাঠ করিলাম তোমার কাহিনী, তোমার মুখচ্ছবি, তরুণী বধূ গৌরী! দেখিলাম, আর জানিলাম ইতিহাসের ট্র্যাজিডি। সেই ট্র্যাজিডি শুধু তুমি নও, সেই ট্র্যাজিডি তপনও। ইতিহাসের সৃষ্টি-শতদলে তাহার হৃদয়-নিংড়ানো রক্তের ছোপ লাগিতেছে,—লাগিবে, আরও লাগিবে। আর তোমার অশ্রুতে, তোমার দীর্ঘশ্বাসে, তোমার উচ্চারিত সাধ ও অনুচ্চারিত অভিশাপে মিলিয়া তাহার সেই সৃষ্টির একাগ্র পরম তপস্যা বারে বারে ব্যাহত হইবে, বারে বারে বিক্ষিপ্ত হইবে, তাহার আত্মদান বরাবর থাকিবে অসম্পূর্ণ।

তপনের উপেক্ষিতা গৌরী, তুমিই তপনের জীবনেরও অসম্পূর্ণতা।

অমিত বলিল, তাই তো তপন, ভাবনার লোক শুধু জোটাওনি, ভাবনাও জুটিয়ে নিয়ে এসেছ।

সত্যই মাথা খারাপ না হয়ে গেলে হয় গৌরীর!

বলিয়া তপন করুণ দৃষ্টিতে তাকাইল। তারপর কি ভাবিল; নিজের মন হইতে কি চিন্তা যেন ঝাড়িয়া ফেলিল। টান হইয়া বসিয়া বলিল, 'মিছে সেই ভাবনা।' দেখলাম তো 'দেশলক্ষ্মীর' অতগুলো মজুরের হরতাল; তাদেরই কি ঘরে স্ত্রী-পুত্র নেই? রশিদেরও পাকিস্তানের বাড়িতে আছে তার গরিব মুসলমান ঘরের অসহায় জেনানা,—একটি ছেলে হয়েছে, আবার ছেলেমেয়ে হবে। আর পার্বতীরও ঘরে রয়েছে তার অচল স্বামী, আর অসহায়

ছেলেমেয়ে। কিন্তু কোথায়, ভাবনায় তাদের কর্মশক্তি পরাস্ত হল না তো?

অমিত বুঝাইয়া বলিল, তারা মজুর—হু-হ্যাভ্-নাথিং টু লুজ বাট্ দি চেন্‌স্। আমরা মধ্যবিত্ত, মজদুর পার্টির হলেও মজুর নই—হু-হ্যাভ এভ্-রিথিং টু লুজ্, ইভ্‌ন্ দিস্ গিল্‌টেড চেন্,—মধ্যবিত্তের ফ্যামিলি লাইফ্ অ্যাণ্ড ফ্যামিলি লভ্! মোটা বাঁধনের থেকেও অনেক বেশি শক্ত এই মমতার বাঁধন। দ্যাখো না গৌরীর দশা। তাকে কি রশিদের কথা বলে বুঝোতে পারবে? না, পার্বতীর কথাই সে শুনে বুঝবে?

অমিত সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বলিল, না, সে যুক্তিতে তুমি তপনই গৌরীর ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছ? বলছ 'মিছে সেই ভাবনা?' কিন্তু জানছ কত মিছে তোমার কথাটাও।

তপন একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া স্বচ্ছন্দ স্বরে বলিল, সয়ে যাবে। প্রথম প্রথম খুব লাগবে ওদের। তারপর সয়ে যাবে।—না?

একটা ভরসা চায় তপন, ভরসা চায় অমিতদার নিকটে।

সম্ভবত,—বলিল অমিত। আর মনে মনে বলিল, সত্যই যদি তাহা হয়,—তাহাই যদি হয়? কিন্তু তখনো যদি তুমি আবদ্ধ থাক তপন, যদি তোমাকে জেলে বসিয়া বসিয়া দিন গুনিতে হয় মাসের পর মাস? তখন—তখন সব চাইতে বেশি লাগিবে তোমার মনে এই স্বাভাবিক সত্যটাই—'গৌরীর সব সয়ে গিয়েছে'—সহিয়া উঠিয়াছে গৌরী তোমার অদর্শন ও তোমার বিরহ, সহিয়া উঠিয়াছে তোমার শিশুপুত্রও তোমার অনুপস্থিতি, সহজ হইয়া গিয়াছে তোমার আপন জনের জীবন-যাত্রায় তোমার এই অনুপস্থিতি ও অনস্তিত্ব। তখন কি তোমার সমস্ত আগ্রহ, উদ্যম, উদ্যোগের মধ্যখানটা হঠাৎ ফাঁকা হইয়া যাইবে না, তপন?...

জীবনের উপেক্ষিতা তুমি গৌরী?...কিন্তু বোঝ কি—তপনের অসম্পূর্ণ জীবনের বেদনা, তাহার অসহায়তা?...আমাদের সকলের অসম্পূর্ণতা!

জীবন কাহারও হাতে অপমান সহিতে পারে না। তোমরা, এদেশের মেয়েরা, জীবনে যদিবা উপেক্ষিতা; আমরা তপনেরা অমিতেরা অসম্পূর্ণ।...

চার

বেলা বারোটা বাজিয়াছে। খাবার ব্যবস্থা হয় নাই এখনো। হইবেও না—যদি চেঁচামেচি না করা যায়।

অমিত বলিল, উদ্যোগী হও দিলীপ, যদি খেতে চাও। মঞ্জু, আধ ঘণ্টার বেড়ানো তো শেষ হয়েছে। এখন যদি উপোস থাকতে না চাও তাহলে একটু চেঁচামেচি কর।

শ্লোগান দোব? তা হলে শুরু কর, দিলীপ—

মঞ্জু শ্লোগানের জন্য উদ্যোগী হইল—"খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই।"

সৈয়দ আলী সাহেব তাস আনাইয়াছেন এক জোড়া। সিগারেটও কয়েক প্যাকেট সঙ্গে আনিয়াছেন। জানেন, জেলে ও-বস্তু দুর্লভ। প্রাণ ভরিয়া এখানেই তবে সেবন করা যাক। জন আটেক লোক আসিয়া খেলার চারি-দিকে একত্র হইয়াছে। বসিবার জায়গাও নাই। পুলিসের কর্মচারীরা খোঁজ-খবরও কেহ বিশেষ করিতেছে না। সিপাহীরা পাহারায় দাঁড়াইয়া আছে। শ্রান্ত, ঝিমন্ত, তাহাদের চোখেমুখে বিরক্তি। কাল রাত্রি হইতেই তাহারা অনেকে ডিউটিতে রহিয়াছে। এখনো দ্বিতীয় সিপাহী দল আসিতেছে না কেন?

দিলীপকে লইয়া একবার সৈয়দ আলী হাঁক-ডাক করিলেন। খেলা রাখিয়া উঠিয়া গেলেন বাহিরে—একজন কাহাকেও তাড়া দিতে হয়। স্নান নাই, আহার নাই, দুপুর হইয়াছে, বসিয়া বসিয়া বিরক্তি আসিয়া যাইতেছে। সৈয়দ আলী অমিতকেও টানিয়া সঙ্গে লইলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। পুলিসের বড় কর্তারা সেক্রেটারিয়েটে। মাঝারি পর্যায়ের একজন কর্মচারীকে পাওয়া গেল। তিনি তো একেবারে অবাক।—কি কাণ্ড! আপনাদের খাবার ব্যবস্থা করে নি! ছিঃ ছিঃ! ওরে কে আছিস—কি পেয়েছিস তোরা?—খাবার দিবি না বাবুদের? তা ডি-সি'কে বলেছিস?

দেখুন—বলেছে না বলেছে কিছু ঠিক নেই। বসুন আপনারা। আমি যাচ্ছি—এতগুলি রেসপেক্‌টেড্ লোক, তাদের খাবার দাবার কোনো ব্যবস্থা নেই! কি কাণ্ড! কি কাণ্ড!—ব্যবস্থা করিবার নাম করিয়া ভদ্রলোক সরিয়া পড়িল—আর দেখা গেল না। সৈয়দ আলী বলিলেন, না। ওতে হবে না। দলবল লইয়া তিনি ডি-সি'র খোঁজে গেলেন।

অমিত ফিরিয়া আসিয়া নিজ স্থানে বসিল। অন্যেরা ব্রিজে জমিয়া গিয়াছে ততক্ষণে। সৈয়দ আলী স্থানচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহার স্থান দখল করিয়া বসিয়া গিয়াছে এখন জন দুই তিন। তাহাতে কি? ফিরিয়া আসিলেই সৈয়দ আলীর স্থান হইবে। তাঁহাকে না হইলে খেলা চলে নাকি? খেলা কেন, পার্টিও জমে না। আড্ডা না জমিলে এদেশে পার্টি জমে? আর সৈয়দ আলী না হইলে আড্ডা জমে? খেলোয়াড়দের ঘিরিয়া অনেক বড় আরও এক দল খেলার উমেদার, দর্শক, পারিষদ। ইহাদের কলরব ও কলহে ঘর সরগরম। খেলোয়াড়দের অপেক্ষাও ইহারাই খেলায় বেশি মত্ত। কেহ কেহ চুপ করিয়া বসিয়া আছে অন্য দিকে। দুই একজন স্বতন্ত্র বসিয়া গল্প করিতেছে, আলোচনাও করিতেছে—কেন পুলিস তাহাদের ধরিয়াছে? সত্যই কি ধরিয়া রাখিবে? কতদিন রাখিবে? তপন বুলকনের সঙ্গে গল্প করিবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ির কথাটা সে ভুলিয়া থাকিতে চায়!

অনেকক্ষণ খেলাটা দেখিয়া-দেখিয়া তথাপি বুঝিতে না পারিয়া কানাই হাজরা লম্বা বেঞ্চটায় আসিয়া বসিল। একটু ঘুমাইবার চেষ্টাই করা যাক।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করিয়াছে কানাই হাজরা। তারপরে আবার ভুলুবাবুর সঙ্গেও গল্প করিয়াছে। শেষে দাঁড়াইয়াছিল খেলার নিকটে। ক্ষুধা পাইয়াছে। পেট জ্বলিতেছে। খাদ্য নাই। শোয়া যাক বরং কিছুক্ষণ।

অমিত বলিল: কি হল হাজরা-দা? ঘুমুবার জায়গা পাচ্ছেন না?

কানাই হাজরা লজ্জিত হইল। বলিল, আপনাদের বিলাতী খেলা, কিছু বুঝতে পারলাম না।

এবার তাহা হইলে অমিদা-র সঙ্গেই গল্প করা যাক। অমিত কানাই

হাজরার পুরনো চেনা লোক। সম্প্রতি দেখাশুনা বেশি তাহাদের হয় নাই।

কানাই হাজরার বয়স বছর চল্লিশ । কানাই দক্ষিণের লোক। দরিদ্র কৃষকের ঘরে সে জন্মিয়াছে। নিজের জমি বলিতে তবু কম ছিল না তাহার বা তাহার বাপ মহিম হাজরার। খানিকটা বন্ধক পাইয়া জমিদারের গোমস্তা-মহাজন হাত করিয়া বসিয়াছিল। কবে তাহা পুনরুদ্ধার হইবে তাহার ঠিকানা নাই। কখনো নিজের জমিতে চাষ করিত মহিম, কখনো অন্যের জমিতে ভাগ-চাষ করিত। কখনো মথুরাপুরের দিকে স্টেশনে ট্রেনে চাপাইয়া দিত ব্যাপারী ব্যবসায়ী ফড়িয়াদের জন্য জমির শাক-সব্জি, ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল। দরিদ্র কৃষকের সেই সাধারণ জীবন। কিন্তু তাই বলিয়া ভূমিহীন নয় মহিম। হিসাব সে মুখে মুখে বলিয়া দিবে—কয় বিঘা খাসে আছে,—অবশ্য উহার পাঁচ বিঘায় চাষ করা চলে না। বর্ষায় ভাসিয়া যায়। গুমাখালির নিচেকার খালটা গাঙের সহিত মিলাইয়া না দিলে এই জমির এই দশাই হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া জমিটা তো মহিম হাজরার হাতছাড়া হয় নাই; মহিমেরই রহিয়াছে। নিশ্চয়ই হিসাবে ধরিতে পারা যায়। আরও পুরো সাত বিঘা জমি সিংহ বাবুরা ভেড়ি কাটিয়া দেওয়ায় জলে ডুবিয়া যায়। উহাতে হাফিজ নিকারী মাছের ইজারা লইয়াছে। বহু টাকায় সিংহবাবুরা জমা দিয়াছে, আরও বহু টাকা হাফিজ লাভ করে। তাহার মাছের চালান কলিকাতায় যায়। মহিম হাজরাই কতবার সেই মাছের চুপড়ি স্টেশনে তুলিয়া দিয়াছে—তাহারই জমির মাছ, কিন্তু জল তো তাহার নয়, মাছও তাই তাহার নয়। ওখানকার পাঁচ-সাত শ বিঘা জমির এই অবস্থা। এই জমিটা তাই মহিম ছাড়িয়া দিতে চায়; মিথ্যা খাজনা গনিয়া আর লাভ কি? বাকি খাজনাতেই হয়তো ইহা চলিয়া যাইত। কিন্তু সত্যই কি সিংহবাবুরা বরাবর ভেড়ি কাটিয়া দিবেন? মহিম আশা করে তাঁহারা একাজ করিবেন না। তাই এখনো খাজনাপত্র দিয়া মহিম সে জমিও রাখিয়াছে। সে জমি মহিমেরই আছে।—'ভাগচাষী' বা 'ক্ষেতমজুর' তাহাকে বলিলে সে তবে রাগ করিবে না কেন? বারো বিঘা জমির মালিক সে—মহিম হাজরা।

বাপের সহিত কাজ করিয়া করিয়া কানাইও বড় হইয়াছে। ভাগ্যক্রমে কাজ পাইল সে মণ্ডলবাড়িতে। মণ্ডলেরা বড় গৃহস্থ। খাসে জমি অনেক। গোলায় ধান আছে, পুকুরেও মাছ আছে, তবে গোয়ালেই গোরু আছে বেশি। গোরুর সেবা মেয়েরা করে, কানাই মাঠে চরাইতে লইয়া যাইত। চাষের কাজেও কানাই ক্ষেতমজুরদের জলপান আনিয়া দিত। নিজেও এক-আধটুকু চাষে সাহায্য করিত। মণ্ডল কর্তারা ছোকরা কানাইকে ভাল-বাসিত। বাড়ির পাঠশালার ছোটখাটো কাজও তাই কানাইকে দিল। সেখানেই তাহার দুই-এক মাসে অক্ষরও শিক্ষা হইয়া গেল ; শুনিতে শুনিতে নামতা, কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া সহজেই মুখস্থ হইল। তাই বিদ্যালয়ে পরিদর্শক আসিলে কানাই কোনো কোনো দিন ছাত্র সাজিয়াও বসিত ; আবার তাহা ছাড়াও কোনো কোনো দিন হইত বলহরি পণ্ডিতের সর্দার পড়ুয়া। অক্ষর-জ্ঞান, সংখ্যা-জ্ঞান, কানাইর এইরূপে সেখানেই হইল। তারপর মহিম হাজরা অসুখে পড়িল, কানাই তখন ক্ষেতের কাজে লাগিল। আজ ক্ষেতে কাজ করে, কাল বোঝা বহিয়া লইয়া যায় মণ্ডলদের বরোজের পান, কিংবা দেয় কলার চালান। কানাই কলার চাষ ভালোই শিখিয়া উঠিল, উহাতেই তাহার হাত খুলিয়া গেল। কানাইরও মণ্ডলবাবুদের নিকট কদর বাড়িয়া যায়। বুদ্ধি আছে, কাজেও কুঁড়েমি নাই।

জোয়ান ছেলে, বড় হইতেছে—মহিমের অসুখ, কানাইর মাও চায় ছেলের বিবাহ দিতে। কিন্তু টাকা পাইবে কোথায়? শতখানেক টাকা না হইলে মেয়েই মিলিবে না ; তারপর খরচ-পত্রও আছে। সময় পাইলে অবশ্য বাপ-ব্যাটায় পরিশ্রম করিয়া টাকাটা তুলিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু মহিমের ব্যারাম বাড়িয়া যায়, সে কাজ করিতে পারে না, একা কানাই করিবেই বা কি? তবু বিবাহ তো করিতেই হইবে ;—জোয়ান ছেলে বিবাহ করিবে না? সেই সাত বিঘা মহিম বন্ধক রাখিল বিহারী ঘোষের কাছে—খাই-খালাসী বন্ধক। বিহারী ঘোষ সিংহবাবুদেরই এ মহালের নায়েব। সুদটা চড়া, কিন্তু টাকা বেশি নয়। আর ধানচালের বাজার এখন বেশ গরম ; এরকম দর

থাকিলে চাষীর তত ভয় কি ? জমি থাকিলে আয় হইবে, আর বন্ধকী জমি সুদে-আসলে খালাস করিতে কয় বৎসর দেরি ? তিন সালে বন্ধক শেষ হইবার কথা, দুই সালেও হইতে পারিবে। ততদিন কানাই না হয় একটু বেশি খাটিবে মণ্ডলদের ক্ষেতেই, মজুরি পাইবে, খোরাকি পাইবে। কলার চাষে মুনাফা ভালো দাঁড়াইলে মণ্ডলেরাও কি কানাইকে বঞ্চিত করিবে ? দরকারমতো হিসাবপত্রও কানাই রাখিতে শিখিয়াছে তাহাদেরই কৃপায় পাঠশালায়। ব্যাপারীদের সঙ্গে কাজে কারবারে, বোঝা-পড়ায় মণ্ডলেরা কানাইকে পাঠাইবে। অতএব, কানাইর ভাবনা কি ?

বিবাহ হইল। শত দুই ছাড়াইয়া খরচাটা শত আড়াইতে উঠিয়া গেল। আসিল কানাইর নয় বৎসরের বউ গঙ্গা—'নারাণীর মা'। নারাণী অবশ্য অনেক পরে জন্মে—ছ-সাত সাল পরে। কিন্তু তাহার আগে কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। সেই ছত্রিশ সাল গিয়া সাঁইত্রিশ সাল। দ্যাখ না-দ্যাখ কি হইল ধানচালের বাজারের ? দুই টাকা মণ ধানের দর নামিল ; তারপর সাত-শিকা ; তারপর দেড় টাকা ; শেষ এক টাকায়ও ঠেকিয়া থাকিল না। তিন সালে সমস্ত ওলট-পালট। আসল ছাড়িয়া বিহারী ঘোষের সুদও মিটানো যায় না। আগেকার বন্ধকী জমি তো কানাইর হাতছাড়া হইয়াছেই, এই জমিও যায়-যায়। বাকি জমিও এবার বন্ধক দিতে হইল ; মহিম তখন মরিতে বসিয়াছে—তাহার চিকিৎসা-পত্র দরকার। কিন্তু আগে মরিল তবু কানাইর মা—উনচল্লিশ সালে আশ্বিনের একুশে। আরও মাস দুই-তিন পরে মরিল মহিম হাজরা,—অঘ্রানের শেষ, উনত্রিশে অঘ্রান। তখন খাসে জমি রহিবে কি করিয়া কানাইর ? টাকা ধার করিতে হইল, সুদের হার এখন বেশিই হইবে। এইরূপ দুঃসময়ে টাকা কি চাষী সহজে ধার পায় ? তবু সামনেই ফসল উঠিতেছে, বাজারে সাচ্চা দাম পাইলে কানাইর ভাবনা আবার কি ? গত ফসলটা দাম পাইল না, আগামী ফসলটা নিশ্চয়ই দাম পাইবে—কানাই হাজরা নিজেকে আশ্বাস দিল।

পৃথিবীর কোথায় কোন চক্রান্তর ফলে কি ঘটিয়াছে কানাইর তাহা

বুঝিবার সাধ্য নাই। সালটা বাঙলা সাঁইত্রিশ—বণিক-শাস্ত্রমতে হয়তো ১৯২৯এর শেষদিক কিংবা ১৯৩০-এরই প্রারম্ভ। দুনিয়ার ডলার-পতিদের তখন চক্ষুস্থির। সত্য সত্যই কি তবে ধনিক-তন্ত্রের সপ্তডিঙা আর্থিক সংকটের ও বাজার-বিপর্যয়ের কালীয় দহে পড়িয়া গেল? এবং বাজার মন্দার এই ডুবাচরে আটকাইয়া পড়িবে বাড়তি-মালের বোঝাই নৌকা? ডলারের দেশে বিশ্বের আর্থিক সংকটের অনিবার্য আঘাত প্রথম লাগিল। ওয়াল স্ট্রীটের কোটিপতিদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটিতেছে। এক-এক ফুঁয়ে সাত রাজার ঐশ্বর্য উড়িয়া গিয়াছে। জমি আর ফসলসুদ্ধ ভরা-ডুবি হইতে লাগিল মার্কিন কৃষকের ভাগ্য। মন্দা, মন্দা, মন্দা। বাজারে মাল আছে, ক্রেতা নাই; ফসল আছে, চাহিদা নাই। ক্রেতা নাই যখন, তখন ডুবাইয়া দাও; চাহিদা নাই তো পুড়াইয়া ফেল গম, তুলা, ক্ষেতের ফসল; আগুনে-জলে নষ্ট করিয়া দাও কফি; সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও কমলালেবু। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কানাইর মতো; না পাইতেছে খাইতে, না পাইতেছে পরিতে। তাহারা হয়তো গম পাইলে বাঁচে, তুলা পাইলে পরিতে পায় কাপড়, কফি কমলালেবু পাইলে হাতে পায় স্বর্গ। কিন্তু মালিকের মুনাফা জোগাইয়া উহারা এই সব জিনিস কিনিবে কি করিয়া? আবার মুনাফা ছাড়া জিনিস ছাড়িলে যে মালিকের পক্ষে বাজার মাটি হইবে। অতএব জিনিসই নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত; না হইলে এই মাত্রায় মুনাফার হার বজায় থাকিবে না। তারপরই, ক্রেতা যখন নাই তখন মাল উৎপাদন কমাও; উৎপন্ন মালও নষ্ট করিয়া বাজারের ভার কমাও। সঙ্গে সঙ্গে ফসল কম চাষ করো, আর যাহা বা ফলে সেই উৎপন্ন ফসল পোড়াইয়া ফেলিয়া বাজার খালি কর। শেষে, দেশবিদেশের মাল আমদানিও কমাও, কাঁচা মালের চাহিদাও কমাও। কমাও ব্যবসা-পত্রের সমস্ত লেনদেন, কাজ-কারবার।...কোথা দিয়া তাই চটের চাহিদা কমিল, কোথা দিয়া কাঁচামালের রপ্তানি কমিল, কেন দেখিতে দেখিতে ধান-চাল গম-তিসি সমস্ত কৃষিজাতের দাম নামিয়া গেল? নামিল তো নামিল তাহা আর কেন চড়ে না?—দেবতার দয়ার অভাব নাই,—মাঠভরা ধান,

ক্ষেতভরা ফসল সবই আছে!—কিন্তু বাঙলা দেশের চব্বিশ পরগনার কানাই হাজরা ইহা কেমন করিয়া জানিবে—তাহার ভাগ্য শত লক্ষ নর-নারীর ভাগ্যের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে জন কয় ধনপতি সওদাগরের ব্যবসায়ের সওদা; তাহাদের মুনাফাদারির খেলার কাঁচা মাল; আর সে—কানাই হাজরা—না চাহিলেও হইয়া উঠিয়াছে ইতিহাসের বঞ্চিত-বিদ্রোহের এক ভাগীদার!

কানাইর মনে হইল এমন আকাল দেশে আর আসে নাই। এক কানাকড়ি তাহার হাতে আসে না, ধানচালের দাম আর বাড়ে না। দিন মজুরি করিবে নাকি কানাই? গরিব চাষীর ছেলে কানাই; ভাগচাষীর কাজ করিতেছে, মণ্ডলদের কলার চাষে মজুরি পাইয়াই খাটে; কিন্তু তাই বলিয়া জনমজুর হইবে নাকি শেষ পর্যন্ত? তাহার জমি আছে; খাইখালাসী বন্ধক মুক্ত হইয়া তাহা এই চার সালে তাহার হাতে আসিবারও কথা। কিন্তু বিহারী ঘোষ তাহা মানিবে না। হিসাব করিতে জানে বুঝি কানাই? খুব লায়েক হইয়াছে—দুইদিন পাঠশালায় গিয়া! বেশ, দেখুক কানাই কত ধান এই কয় বৎসরে উৎপন্ন হইয়াছে, কত হইয়াছে এই দুই বৎসরে কানাইর কর্জের আসল, আর কত কানাইর সুদ, তস্য সুদ। ধানের এই দামে সুদ আর তস্য সুদই এখন শোধ হয় না; তাহাতে আবার আসল।

বিহারী ঘোষ ঠিক করিয়াছে জমিটা আর কানাইর নিকট ভাগচাষে দিবে না; সে নিজেই চাষবাস করিবে—মুনিষ খাটাইয়া চাষ করিলে ধানও উৎপন্ন হইবে বেশি। নিজের গোলায় ধান উঠিলে সে ধান লইয়া ব্যাপারীরাও যাহা খুশি করিতে পারিবে না। তখন উচিত দর দিতে হইবে; না দিলে গোলার ধান ছাড়িবে না বিহারী ঘোষ।

কানাইর পক্ষে জমিটা হাতছাড়া হইয়া যায় যায়। একটা কিছু করা উচিত। খোশামুদি বৃথা হইল। কানাই কাঁদা-কাটা করিতে জানে না; করিলেও বিহারী ঘোষ গলিত না। মণ্ডলবাড়ির লোকেরাও কানাইর হইয়া বিহারী বাবুকে বলিয়া কহিয়া দেখিল; ফল হয় নাই।

মামলা করিবার জন্য কানাই দুই-একবার লাফ ঝাঁপ দিল, কিন্তু সে টাকা কোথায়? আইনের জোরই বা কই? মণ্ডলবাবুদের কাণ্ডজ্ঞান আছে; কানাইর বাড়াবাড়িতে বেশি উৎসাহ তাহারা দিল না। তাহাদেরও দুই একঘর চাষীর সঙ্গে এইরূপ গোলমাল বাধিয়াছে। মণ্ডলেরা ভালো লোক, স্বচ্ছল গৃহস্থ, ধর্মভীরু; কাহাকেও প্রাণে মারিতে চাহে না। পরের জমি আত্মসাৎ করিতে তাহাদের ইচ্ছা নাই। ন্যায্য টাকা পাইলে মণ্ডলেরা কৃষকদের জমি এখনই ছাড়িয়া দেয়। এই মন্দার দিনে কি সে-দিনের ধার আর কেহ পুরাপুরি সুদে-আসলে শোধ দিতে পারে? না, বন্ধকী জমি আর সেই ভাবে উদ্ধার করিবার আশা করিতে পারে? মণ্ডলেরা তাহা বুঝে। তাই দুই একজন খাতককে উল্টা কিছু টাকাও তাহারা দিয়া দিয়াছে, খাতকেরাও জমি মণ্ডল বাবুদের নিকট বিক্রয় করিল বলিয়া লিখিয়া দিল। বিহারী ঘোষ অবশ্য মণ্ডলদের এই পরামর্শ কানে তুলিল না। কিন্তু তাই বলিয়া কানাইর বাড়াবাড়িই কি ভালো? 'মামলা করিব' : না, মণ্ডলেরা তাহা ভালো মনে করে না।

এমনি সময়ে,—সে বোধ হয় বাঙলা বিয়াল্লিশ সালে,—বাধিয়া গেল 'কৃষক সমিতির' হৈ-রৈ। সিংহবাবুরা ভেড়ি কাটিয়া জমি ডুবাইয়া দেয়, উহা লইয়াই প্রজাদের আপত্তি শুরু হয়। মণ্ডলবাড়ির ছেলে গণেশ নতুন কলেজে পড়ে, সে কোমর বাঁধিয়া দাড়াইল—তাহাদের স্বজাতিরই অনেক গরিব চাষী সিংহবাবুদের এই লোভের দায়ে বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জমি ইস্তফা দিয়া কেহ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে 'লাটে'। গণেশ মণ্ডল হেমন্ত বাবুকে সামনে পাইল। হেমন্ত মাইতি তখন লবণ আন্দোলনে জেল খাটিয়া ফিরিয়াছে—এখন গঠনমূলক কাজ করিবে। অর্থাৎ সে ল কলেজে পড়িতে গেল; উকিল হইবে ঠিক করিল; এবং গ্রামের পাঠশালায় গরবি চাষা-ভূষাদের ডাকিয়া তালগাছ কাটিবার প্রয়োজনীয়তা, চরকা কাটিবার উপকারিতা ও অহিংসার পুণ্য বুঝাইতে লাগিল। এখন সেই সঙ্গে ঠিক করিল সিংহবাবুদের দৌরাত্ম্য হইতে প্রজাদের উদ্ধার করিবে—গণেশ

মণ্ডলও আছে সঙ্গে। মণ্ডলদের এই মধ্যম ছেলেকে জেলে হেমন্তবাবু সহকারী পাইয়াছিলেন। গণেশকে তিনিই তাহার গ্রামের কাজে লাগান আর তাহাকে আবার কলেজে আই-এ পড়িতে রাজী করাইলেন।

গণেশ মণ্ডল তাই কলেজে ভর্তি হইল। কাজে লাগিতে লাগিতে সে ঝুঁকিয়া পড়িল সিংহ বাবুদের বিরুদ্ধে প্রজার পক্ষে। চাষীদের মজুরদের 'সংগঠন' করিতে না পারাতেই যে স্বরাজ সম্ভব হইতেছে না, জেলে বসিয়া গণেশ এই আলোচনা অনেকের নিকট শুনিয়াছে। চাষীরাই তো দেশের শতকরা আশীজন। তাহাদের লইয়াই তো দেশ। কিন্তু এই সংগঠনটা কি ভাবে করিবে গণেশ তাহা তবু বুঝিল না। জানিত, সকলকে কংগ্রেস সভ্য করিতে হইবে, আরচরকা কাটিত বলিতে হইবে। কলেজে এখন শ্যামলের সঙ্গে গণেশের পরিচয় হইল। তাহারা তর্ক করিল, বলিল, কৃষক সমিতি গঠন কর। দুই একবার সিংহদের বিরুদ্ধে কথা বলিতেই কৃষকেরা নিজেরাই আসিয়া খোঁজ করিল মণ্ডলদের এই মধ্যম বাবুর। জেল-খাটা মানুষ, অনেকের জন্য অনেক কিছু করিবেন তাঁহারা,—এই গরিবদের জন্য কি করিলেন? 'সমিতি' করিতে হইবে? বেশ 'সমিতি' না হয় কৃষকেরা করিল। হাঁ, সভ্যও হইল কংগ্রেসের। চাঁদা দিতে হইবে? বেশ, পঞ্চায়েতের ট্যাক্স্ যখন আদায় হইবে তখন তাহাও যেন কাটিয়া লন মণ্ডলবাবুরা। কিছুই গণেশ ভাবিয়া পায় না। এখন তাহাদের করিতে হইবে কি? কলিকাতার বন্ধুদের বলিল, 'চল'।

মণ্ডলবাড়িতে সভা হইবে। নৃপেন রায় ও সৈয়দ আলীকে লইয়া শ্যামল আসিয়াছে। শুনিয়া কৃষকেরা অবাক। এই কথাই বুঝি তাহারা শুনিতে চাহিতেছিল, কিন্তু কেহ তবু শুনাইতে আসে নাই। তাহাদের আশা হইল, এবার একটা কিছু হইবে।

প্রশ্ন করিল, এখন করা যায় কি?

শ্যামল বলিয়া বসিল, কেন? ভেড়ি কাটতে দেবেন না।

আরও অবাক প্রজারা: সে কি করে হবে? দারোয়ান-পাইক আছে না বাবুদের কাছারিতে!

তারা কজন? আপনারা পনেরটা গাঁয়ের চাষী—এরা দুজন কি চারজন। আপনাদেরও তো হাতপা আছে।

মারামারি বাধবে যে!

বাধলে বাধবে।—সহজ কণ্ঠে বলেন সৈয়দ আলী। তারপর যোগ করিল—আপনারা নিজ থেকে বাধাবেন না।

ফৌজদারী হবে, থানা-পুলিস হবে।

নইলে দেওয়ানী করে জমি পাবেন নাকি? না, কাঁদা-কাটা করে এখন তা পাচ্ছেন?—বুঝাইয়া বলিতে চাহেন সৈয়দ আলী।

কথাগুলি নূতন, শ্যামলদের পক্ষে—পুঁথিতে পড়া। অসম্ভব রকমের নূতন কৃষকদের পক্ষে। কিন্তু অনেকে বৎসরের অভিজ্ঞতা, বৃথা কাঁদাকাটা, হাঁটাহাঁটি, প্রভৃতির ফলে সেই গরিব কৃষকদের মনে এই বোধ অনেকদিন আগেই ঠাঁই পাইয়াছিল। তাই কথাটার যাথার্থ্য ও যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ ছিল না। বরং নিজেদের মনের কথাটা তাহারা বলিতে পারিতেছিল না, এবার শুনিতে পাইয়া উহাকে নিজেদের কথারূপে চিনিয়া লইতে পারিল।

আর,—অমিত সাত বছর পরে জেল হইতে ফিরিয়া দেখিল,—আগামী দিনের সত্য যেন বর্তমানের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেছে।

অবশ্য তখনো সে সত্য অপরিচিত, দুর্বল, অনিশ্চিত-গতি। জন্ম যে লইতেছে তাহাই বা জানিবে কে? জানিবে তাহারা, যাহাদের মধ্যে সে সত্য জন্মিল, সিংহ বাবুদের হতভাগ্য প্রজারা: তারপর জমিদারের নায়েব বিহারী ঘোষের খাতকেরা, শোষিত-চাষীরা।

সেবার ভেড়ি কাটা লইয়া দাঙ্গা বাধিতে-বাধিতে তবু বাধে নাই। কিন্তু প্রজারা একজোট হইয়া দাঁড়াইল। সিংহবাবুরা প্রথম ভাবে নাই প্রজাদের এত সাহস হইবে। যখন জানিল, তখন নায়েব-গোমস্তা থানায় গেল। দারোগাকে সঙ্গে আনিল। সব স্থির করিয়া যখন সে প্রস্তুত, তখন গণেশ মণ্ডল হেমন্তবাবুকে গিয়া ধরিল—লইয়া আসিল ইনজাংশন। দেওয়ানীর

জোরে সাময়িক ভাবে ভেরি-কাটা বন্ধ রহিল। দাঙ্গা বাধিল না কিন্তু উহাতেই প্রজাদের বুকের সাহস তিনগুণ হইয়া গেল। চারিদিককার গ্রামের চাষীরা ভিড় করিয়া আসিল। গণেশ মণ্ডলের বাড়িতে তাহাদের দরবার লাগিয়াই আছে।—কলিকাতার বাবুদের ডাকিয়া 'মেঝ কর্তা' একটা ব্যবস্থা করুন এই সব গাঁয়ের চাষীদেরও।

মণ্ডলবাড়ির সেই বৈঠকে প্রথম হইতেই কানাই উপস্থিত থাকিত। মেঝ-বাবুর হইয়া সে বাঁশ বাঁধিয়াছে, চেয়ার টানিয়াছে,—সভা হইবে। কানাইর উদ্যোগ-উৎসাহ বাড়িয়া গেল।…অমিতের কানাইকে সেই প্রথম দেখা।

বর্ষা কাটিয়া পৌষ মাসে পৌছিতে পৌছিতে কানাই হাজরা গণেশের পাকা সাকরেদ হইয়া উঠিল। কলিকাতার বাবুরা বলিয়াছেন—জমির ধান তাহাদের। বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধেও জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইল তাহারা, বঞ্চিত কৃষকেরা। কিন্তু বিহারী ঘোষ তো শহর-বাসী সিংহবাবু নয়, পাকা লোক। সে ভালো করিয়া ব্যবস্থা করিল, থানা আগেই হাত করিয়া আসিল। জন-মজুরও ঠিক করিল, দারোয়ান-পাইকের অভাবও হইল না। তাই ছোটখাটো দুই একটা গোলমাল বাধিতেই থানার দারোগা মারপিট করিয়া দাঙ্গা ফ্যাসাদ থামাইতে গেল। কানাইও তাহাতে ধরা পড়িল; একসঙ্গে জন সাতেক তাহারা মহকুমার হাজতে বন্ধ হইল।

ধান-কাটার ব্যাপারে প্রজারা শান্তি-ভঙ্গ করিতে যাইতেছে, অতএব শান্তি ভঙ্গের দায়ে কানাইর বিরুদ্ধে মামলা হইবে। ঘরে তখন স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা; শ্বশুর তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ দিয়া আসিয়াছে। কি যে হইল, জেল-হাজতে বসিয়া কানাই বুঝিতে পারে না। জামিন পাইলে হয়। কিন্তু মহকুমার হাকিম তাহাদের তিন জনের জামিনের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। বাকি চার জনকে জামিন দিলেন। অনেক করিয়া কানাই মেঝবাবুকে বলিয়া পাঠাইল। গণেশও কম চেষ্টা করিল না। মোক্তার লইয়া জেলে সে দেখা করিল। কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইল, সদরে জামিনের জন্য আপীল করিবে। তারপর সংবাদটা গণেশই দিয়া গেল—কানাই নিশ্চিন্ত

থাকিতে পারে, তাহার একটি মেয়ে জন্মিয়াছে, ভালো আছে কানাইর স্ত্রী ও শিশুকন্যা। সে-ই কাতুর জন্ম।

আরও মাস খানেক পরে যখন জামিন পাইয়া কানাই ও তাহার বন্ধুরা জেল-হাজত হইতে বাহির হইল তখন তাহাদের উল্লাসের সীমা নাই। জেলের যাতনা কষ্ট শেষ হইল ভাবিতেই যেন তাহারা উৎফুল্ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা তাহারা বুঝিল—বিহারী ঘোষ আর করিবে কি? 'কথায় কথায় থানা-পুলিসের ভয় দেখায় ওরা। কিন্তু দেখলাম তো তার সবখানিই। ঘরে অন্তঃসত্ত্বা বউ, একা-ফেলে তাকে আসতে হল। এর বেশি আর কিই বা করবে জেলে?—দেখলাম তো তোমাদের জেলখানা।' কষ্টের স্মৃতিটা দিনে দিনে ঝাপসা হইয়া গেল, ভয়-ভাবনাও সঙ্গে সঙ্গে উবিয়া গেল—জেলের ভয়ই বা অত কি?

ঘরে ফিরিয়া কানাই দেখিল মেয়েকে—অতটুকু একটা নতুন মানুষ তাহার সংসারে। কেমন সে আশ্চর্য হইল, তাহার মজা লাগিল। ওমা, কেমন করিয়া তাকায়—আবার হাসেও! বউ বলিল, 'মেয়েটা অপয়া। জন্মিল যখন তখন বাপ জেলে,—ঘৃণা-লজ্জার কথা।' কানাই বলিল, 'অপয়া তো বউ তুই-আমি। তুইও পারলি না আমাকে ধরে রাখতে, আমিও পারলাম না পুলিসকে ফাঁকি দিতে। কিন্তু, গ্যাখ, মেয়েটা জন্মাল—আর জেলের ফটক খুলে গেল। হেমন্তবাবু বললেন, 'এই কংস-কারাগার থেকে আমাদের সকলকে মুক্ত করলে তো তোর মেয়ে, কানাই। ও-ই তো কাত্যায়নী।'

কাতুকে কানাই ছাড়িতে চাহে না আর। মামলা-মোকর্দমার হাঁকাহাঁকি আছে। কাজকর্মের জন্যও এদিকে ডাকে মণ্ডলের বাড়ির লোকেরা। গণেশ অতটা কানাইদের সাহায্য করিল; অন্তত মণ্ডলদের কলার চাষটায় কানাই একটু নজর দিক,—হাত লাগাক জন-মজুরদের সঙ্গে। হাঁ, নিজের ক্ষেতে তাহার আছে, চাষ-বাস আছে, কিন্তু তাহাতে কানাইর বৎসরের খোরাক হইবে না। আর ভাগচাষেও তাহাকে এখন বিহারী ঘোষ বা অন্য কেহ কোনো জমি দিবে না। থাকিতে হইলে তাহাকে মণ্ডলদের নিকটই

অনুগ্রহ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা অগৌরবেরও নয়। মণ্ডলেরা স্বজাতি ; বরাবরই তাহারা কানাইর মুরুব্বি। কানাই তো তাহাদেরই কৃপায় মানুষ। আর এখনো গণেশ কি তাহার জন্য কম করিল? কী দৌড়াদৌড়ি, ছুটোছুটি! ...সাই কি খরচ করে নাই? সে খরচপত্র দিতে হইবে বৈকি কানাইদের এবার ক্রমশ।

কিন্তু কোথায় তাহাদের সে টাকা? কলিকাতার বাবুরা বলিতেছেন, সমিতি দিবে। কৃষকদের একত্র কর, তাহারাই চাঁদা তুলিবে, নিজেদের মামলা-মোকর্দমার খরচ দিবে।

গণেশ বলে, ওনারা বোঝেন না। সমিতি কই? পুলিসের এই জবরদস্তির মুখে কেউ সভ্য হবে না। সব দূরে দূরে থাকে। অবশ্য গোপনে গোপনে সবাই আবার বৈঠকও করে।—জেলের ফেরত কানাইদের দেখিয়াই তাহারা ভরসা পাইয়াছে, 'এই তো কানাইরা ফিরে এসেছে। কি হাজরা, জেলে কষ্ট দিয়েছে নাকি?'

কানাই বলে, কষ্ট আর বিশেষ কি? খাটুনি আছে ; কিন্তু খেতে দিয়েছে—দুবেলা ভাত, নেহাত কমও নয়, তবে আবার কি চাই চাষীর? এক কষ্ট, বিড়ি-তামাক কিছু নেই। যেমন-তেমন তাড়িও এক-আধ ভাঁড় পাওয়া যায় না।

কিন্তু আর সমিতি করিয়া সভ্য হইয়া কি হইবে?

উৎসাহ লইয়া কানাই গ্রামে বাড়ি ফিরিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটার মায়া তাহাকে কেমন পাইয়া বসিতে লাগিল। বউও এবার বারণ করে। সে একলা মেয়েমানুষ ; এভাবে সংসার আগলাইতে সে পারিবে কেন? তিন মাস কানাই ছিল না, তাহার মধ্যে দেখুক না কত কি ঘটিয়া গেল। তাহার উপর জামিন মুচলেকার হুকুমও তো হইয়াছে ; ...কানাই তারপরে বেশি বাড়াবাড়ি করিবে কি করিয়া?

বাড়াবাড়ি থাকুক, কানাইর কাজের [illegible] ...লা। ক্ষেতে যায়, কোনো কাজে জোগান দেয় ; মণ্ডল[illegible] পীড়াপীড়িতে কলার চাষেও

হাত লাগাইতে হয়; কিন্তু ছুটিয়া আসিয়া সে ঘরে দেখে তাহার সেই ছোট্ট, কয়েক মাসের কাতুকে। ঘরের দাওয়ায় মাদুরে-কাঁথায় সেই এক রত্তি মেয়েটাকে দেখিতে বসিয়া কানাই আর উঠিতে চাহে না। কাজকর্মে কেমন মন লাগে না। জমিটা হাত-ছাড়া হইয়া যাইতেছে, ফসল তাহার ভাগে কম পড়িবে না? এই কমাস মণ্ডলেরা ধান ধার দিয়াছিল; ফসল উঠিলে তাহা সুদসুদ্ধ কাটিয়া লইবে। এই সব কথা যেন ভাবিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না ভাবিয়া পথ কোথায়? সংসার চলিবে কিরূপে? আগে দুইজন ছিল, তাহাতেই চলিত না। এখন আবার এই আশ্চর্য ছোট্ট মেয়েটা আসিয়াছে। অবশ্য উহার জন্য এখনো বিশেষ কিছু দরকার নাই, কিন্তু একদিন দরকার হইবে। কানাই উঠিয়া পড়ে দাওয়া হইতে,—কই কি কাজ আছে মণ্ডলদের বাড়িতে? চৈতালি ফসলের দিন গিয়াছে, বৈশাখের দিন আসিয়াছে। কানাই মহা উৎসাহে ক্ষেতের কাজে লাগিল। কিছুদিন কাজ করিয়াই কানাই আবার কিন্তু ঢিলা দেয়। সিংহদের ভেড়ি লইয়া আবার একটা গোলমাল পাকাইতেছে। গণেশ মণ্ডল তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়। কানাইও বোঝে কাজটা জরুরী। কিন্তু তবু বৈঠকে বেশিক্ষণ বসিয়া থাকিতে উৎসাহ পায় না। সেই ছোট্ট মেয়েটা করিতেছে কি? হয়তো ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাসিতেছে। অদ্ভুত সেই দেয়ালি। কানাই আর বসিতে পারে না। পালাইয়া আসে বৈঠক হইতে। খোঁজ করিতে গিয়া গণেশ দেখে কানাই নাই। গণেশ বিরক্ত হয়। মেঝ কর্তার নিকট হইতেও কানাই পলাইয়া পলাইয়া ফিরে।

বৎসর ঘুরিয়া আসিল। আবার বিহারী ঘোষের সঙ্গে ফসল-কাটা লইয়া কৃষকদের গোল বাধিতেছে! আর তো কানাই না গিয়া পারে না। বিহারী ঘোষ তাহার জমিটা গিলিয়া খাইয়া বসিয়া আছে, উহা উদ্ধার করা চাই। কিন্তু সকলের আগে গিয়া দাঁড়াইতে সে আর উৎসাহ পায় না। জামিন মুচলেকার মেয়াদ এখনো শেষ হয় নাই; ইহারই মধ্যে আবার ফৌজদারিতে জড়াইয়া পড়া কি ঠিক? তাহা ছাড়া আবার ছোট্ট মেয়েটার মুখ মনে

পড়ে। হাঁটিতে শিখিয়াছে সে, কথা বলে আধ-আধ, বলে, 'বাব্বা'। উহাকে ছাড়িয়া আবার জেলে যাইতে হইলে—পারিবে না তাহা কানাই।

আন্দোলন এবার জোর ধরিল না; তবু গোলমাল হইল। শেষ পর্যন্ত তাই হেমন্তবাবুকে মধ্যস্থ করিয়া চাষীরা একটা আপস করিয়া ফেলিল। কি করিবে আর? গণেশ মণ্ডলদের যে খাতকেরা তাহাদের বন্ধকী জমি নিজেরা লিখিয়া পড়িয়া দিয়া এতদিন খুশী ছিল, এখন তাহারাও সেই সব জমি দাবি করিতেছে—মণ্ডলেরা তাহাদের জমির মালিক কি করিয়া হয়? এ বড় বেয়াড়া আব্দার—বে-আইনী কথা। হেমন্ত মাইতিও বিরক্ত হন।

বিহারী ঘোষ অত্যাচারী মুনিব, জমিদারের সে নায়েব, আবার সে-ই মহাজনও। সেই সুযোগেই সে অত্যাচার করে, কৃষকদের জমি সে আত্মসাৎ করে। সেও তো বলে—'আইনতই কাজ করি, বে-আইনী কাজ করি কোনটা?' মণ্ডলেরা নিজেরাও চাষী; হাল-বলদ, গোলাপুকুরে তাহারা বিহারী ঘোষের অপেক্ষা বেশি ছাড়া কম ভাগ্যবান নয়। মহাজনিও তাহাদের যথেষ্ট; বন্ধকী জমি তাহারাও সেই সূত্রে কম আত্মসাৎ করে নাই। তাহারাও বলিতেছে, 'আইনতই কাজ করি। বে-আইনী কাজ করিলে লক্ষ্মী সহ্য করবেন না।'

এতদিন লোকে এই কথা শুনিয়াছে, তাহাতে বিশ্বাসও করিয়াছে।

কিন্তু অভাব বড় জ্বালা। সেই তাড়নাতেই প্রথম চাষীরা দাঁড়াইতে চাহিল বিহারী ঘোষের বিরুদ্ধে। দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেই কৃষকেরা দাঁড়াইতে গিয়া বুঝিল—'জমির মালিক যদি আমরা চাষীরাই, তবে আমার জমি মণ্ডলেরাই বা হাত করে কোন নিয়মে?' প্রশ্নটা উঠিল, ক্রমে তাহা কানেও পৌঁছিল মণ্ডলদের। দুই-একটা চাষী ধারে ডুবিতেছে। জমির ফসল উঠিলে এতদিনে বরাবর সুদের কিছুটা শোধ তাহারা করিতে আসিত। এবার আর তাহারা মণ্ডল-বাড়ির দিকে মুখ ফিরায় না। খবর পাঠাইলে বউ-ঝিরা বলে—'বাড়ি নেই'। পথে দেখা হইলে নিজেরা বলে—বাড়ি আসিয়া দেখা করিবে। তারপর পীড়াপীড়ি করিলে বলে—'ফসলের দামটা কি

এখন যে সুদ দিব ? ভালো দিন পড়লে সুদ নিজেরাই গিয়ে দিয়ে আসি। তা বলতে হয় না।' অর্থাৎ সময় মন্দ, এখন বলিলেও সুদ দিবে না।

মণ্ডলেরা বলে—জমিটা বেচে ফেল না তাহলে। মোকদ্দমা করলে তে সুদে আসলে সবই যাবে।

চাষীরা উত্তর দেয় না। বাহিরে গিয়া বলিতে বলিতে যায়, বললেই হয়? নিজের জমি নিজে চাষ করি, অন্যে তার মালিক হবে কোন ধর্মে ?

মণ্ডলেরা বুঝিতে ছিল,—এখন দেখিলও—বিহারী ঘোষকে ছাড়াইয় কৃষকদের কথাবার্তা আগাইয়া আসিতেছে, মণ্ডলদেরও বিরুদ্ধে প্রজার দাঁড়াইতেছে। গণেশের নির্বুদ্ধিতায় কি যে হইতেছে তাহা কর্তাদের আগেও বুঝিতে বাকি ছিল না। গণেশের উপর কর্তাদের কড়া হুকুম হইল—এসব উস্‌কানি আর নয়। সে কলেজে পড়িতে হয় পড়ুক; কলিকাতায় গিয় থাকুক। এখানকার কৃষকদের লইয়া এইসব বিরোধ পাকাইলে বড় কর্তাব তাহা আর সহিবেন না।

গণেশ হেমন্তবাবুর শরণ লইল। হেমন্তবাবু এখন উকিল; তিনি বুঝিলেন গণেশ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। এসব কৃষক লইয়া আন্দোলন এভাবে করিতে গেলে দেশে অরাজকতা আসিবে; মহাজন-জমিদারের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একত্র হইবে। হেমন্ত মাইতি নিজেই তাই বিহারী ঘোষকে খবর পাঠাইলেন, সহজেই তিনি মধ্যস্থ হইয়া বসিলেন। তারপর দুই পক্ষের অনেক সওয়াল শুনিয়া রায় দিয়া দিলেন—আইনজ্ঞ মানুষ, বে-আইনী কথ তিনিই বা বলিবেন কেন ?—বন্ধকী জমি-জোত যাহা আইনত যে পাইয়াছে সে তাহা পাইবে। তবে চক্রবৃদ্ধি সুদটা বেশ কিছু মাফ করিবেন মহাজনেরা। আর জমি? পুরোনো চাষীকেই যেন তাঁহারা আবার ভাগ-চাষে জমি বন্দো-বস্ত দেন। অবশ্য এটা আইনের কথা নয়, ধর্মের কথা। ধর্ম হইল অনেক বড় জিনিস। ধর্ম না মানিলে এদেশের থাকিবে কি ?

মণ্ডলেরা কথাটায় সায় দিল—ঠিক, অধর্ম তাহারা করিবে না। বিহারী ঘোষও কথাটা মানিয়া লইল—বে-আইনী কাজ সে করিবে না। কৃষকদের

পক্ষেও অনেকে সায় দিল—বাবুরা যখন বলিতেছেন। কেবল মুসলমান কৃষকেরা চুপ করিয়া রহিল। তাহাদের একজন বলিল, চাষীর ধর্মই হল চাষ। যতক্ষণ চাষ করি ততক্ষণ তো খোদার হুকুমমতো ধর্মপালনই করি। অভাবে পড়ি, ধার নিই;—মহাজন ফসল নেয়, গোরু নেয়, মালক্রোক আনে,—না নেয় কি? কিন্তু যাই নিক, জমি নেয় কোন ধর্মমতো?

ব্যাটাদের মাথায় এসব কে ঢুকাইয়াছে? সৈয়দ আলী বুঝি?—আরও বিশদ করিয়া হেমন্তবাবুকে তাই ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে হয়। কলিযুগে ধর্মের বড় দুরবস্থা। তাই ভালো ভালো লোকে বুঝিতে পারে না ধর্ম কি, অধর্মই বা কিসে? স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত বকরূপী ধর্ম বুঝাইতে পারেন নাই ধর্মের তত্ত্ব। বুদ্ধিমান লোকদেরই একালে ভুল হয়, চাষীদের তো ভুল হইতেই পারে।

ভুল যতটা সম্ভব তিনি তাহা দূর করিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমানেরা সম্পূর্ণ বুঝিল কিনা সন্দেহ। চুপ করিয়া রহিল, নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল।

কানাইও চুপ করিয়া শুনিয়াছিল, চুপ করিয়াই গৃহে ফিরিয়া আসিল। একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বরং বাঁচিল—এই বৎসর আর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপার নাই। আবার জেলে যাইতে হইবে না,—মেয়েটাকে ফেলিয়া আবার এখন জেলে যাইতে কানাই পারিত না। বাঁচা গেল; কিন্তু সে খাইবে কি? পরিবে কি? আর এত যে বরাবর বলিয়া আসিয়াছে—'আমাদের জমি আমাদের, কিছুতেই মহাজনের হবে না।'—তাহা কি তবে মিথ্যা? এইটাই কি ধর্মসঙ্গত কাজ হইল তাহাদের? কী ধর্ম? না, সে বরং বাবুদের কথাই শুনিবে। এক বৎসরও হয় নাই, কত চেষ্টা করিয়া গণেশবাবু জজ আদালতে তাহাদের জামিন আদায় করিলেন। অন্যায় কথা বলিবার মতো মানুষ তাঁহারা নন। করুক গজ-গজ [illegible] কানাই এখন অতশত তর্ক করিতে চাহে না। বেশ তো, দেখাই [illegible]ক—অন্তত আর একটা সাল দেখা যাউক।

সেই সালে অভাব বাড়িয়া গেল। গোলমাল রহমতদের গাঁয়ে লাগিয়া ছিল, অন্যান্য গাঁয়েও ছড়াইয়া পড়িল। সমস্ত থানায় একটা অসন্তোষ। চাষীরাই বা করিবে কি? অভাবের তাড়নায় প্রাণ যে তাহাদের আর টিঁকে না।

এবার গণেশ রাগ করিল। একটা আপস-রফা হেমন্তবাবু করিয়া দিয়াছেন, এক সাল যাইতে না যাইতেই কৃষকেরা তাহা ভাঙিতে চায়? এমন অধর্ম কাজে সে নাই। রাগ করিয়া বৈঠক হইতে গণেশ চলিয়া গেল। কানাইরও যাইতে ইচ্ছা করিল—গণেশ নাই, হেমন্ত নাই, কে তবে তাহাদের দেখিবে? কলিকাতার বন্ধুদের খোঁজ নাই। কিন্তু গণেশ গেলেও কানাই যাইবে কোথায়? খাইবে কি সে? কেবলি যে ধার করিতে হয়। মণ্ডলেরা তাহাকে যে ধার দেয়, যে হারে সুদে-আসলে তাহা আদায় করে, তাহাতে কানাইর ঘরে ফসল কমই আসে। ওদিকে আপস সত্ত্বেও বিহারী ঘোষ তাহাকে ভাগচাষী করে নাই, কানাইকে সে জমিতে ঢুকিতে দিতে রাজী হয় নাই। বলিয়াছে, 'কানাই বড় বজ্জাত, জমিতে একবার ঢুকলেই আবার বলবে জমি তার।' তথাপি কানাই সহিয়া আছে—তাহার বিশ্বাস গণেশবাবুরা তাহাকে দেখিবেন; চক্রবৃদ্ধি সুদটা মাফ করিয়া দিবেন, আপসের চুক্তিমতো জমিটাও ভাগ-চাষে তাহাকে দেওয়াইবেন। যদি তাহা না হয়?—কানাই ভাবিয়া পায় না তাহা হইলে কি হইবে? কে তাহাকে দেখিবে? কে তাহাকে বাঁচাইবে? শুধু তাহাকে নয়—সেই ছোট কাতুও তো আছে। এখন সে চলিতে শিখিয়াছে, বেশ কথা বলিতে পারে—একটা খেলার ঝুমঝুমিও তাহার চাই। তাহা না পাইলে কাঁদে। পাইলে ভাঙিয়া ফেলে। নতুন একটার জন্য আবার কান্না জুড়িয়া দেয়।

তখন ঘন ঘন বৈঠক বসিতেছে। এখন আর মণ্ডলবাড়িতে নয়,—ভিন্ন গ্রামে, চাষীদের পাড়ায়। এবার চাষীরা রুখিয়া দাঁড়াইবে। কিছুতেই আর সুদের নামে ফসল আদায় নয়, কোনো কথা আর শোনা নয়, কোনো দেনা আর তাহারা দিবে না। কানাই বৈঠকের ডাক শুনিত, যাইত; কিন্তু একটু পরেই পলাইয়া আসিত। বাড়ি ফিরিয়া ভয়ে ভয়ে থাকিত, বৈঠক

ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়া কাজটা ভালো করিতেছে না। দশজনের বৈঠক, সে তাহা ফাঁকি দিতেছে। কে জানে কি হইবে? কেমন অপরাধী মনে হইত নিজেকে। অথচ সাহসও পায় না যেন।

অগ্রানের প্রথম হিম পড়িতেই কিন্তু কেমন করিয়া কাতুর কাশি হইল, জ্বর হইল। জ্বরে বেহুঁশ মেয়ে। সত্যই তিন দিনের জ্বরে সে চলিয়া গেল। কানাই কাঁদিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। সত্যই তাহার অধর্ম হইয়াছে। মেয়ে তাহাদের মুক্তি দিতে আসিয়াছিল, সে যখন জেলে ছিল। কানাই জেলকে যেই মাত্র ভয় করিতে আরম্ভ করিল, মেয়েও তখনি অমনি তাহাকে ছাড়িয়া গেল। যাইবে না? সে যে স্বয়ং দেবী ছিলেন—কাত্যায়নী। এতগুলি গ্রামের এতগুলি মানুষের কাজ হইতে কানাই পলাইয়া ফিরিতেছে, আর দেবী থাকিবেন তাহার ঘরে?

দশজনের কাজে ফাঁকি দিলে দেবতা ছাড়েন না। অমিত জানে, এইভাবেই কানাই হাজরার সমাজ-বোধ পাকা হইয়াছে—সুস্থ এই ধর্মবোধ এদেশের, সমাজ-বোধ তাহাতে কানাই হাজরার সহজে জন্মিল। আর শুধু কানাই হাজরার কেন? কাতুর মায়েরও। দশজনকে ফাঁকি দিলে ধর্ম সয়? সয় না। তাই তো কাতু তাহাদের ছাড়িয়া গেল। তাহার পরে অনেক কিছু ঘটিল—দুবৎসর পরে নারাণী জন্মিল। কিন্তু তাহার পূর্বে কানাই তেতাল্লিশ-জন চাষীর সঙ্গে মাসের পর মাস মহকুমার হাজতে কাটাইয়া আসিয়াছে, জামিন মিলে নাই। পরের সালে বিনা জামিনে তাহার বউও আর দুজন চাষীর বউ ও চাষীর মায়ের সঙ্গে দাঙ্গার দায়ে সেই জেলে এক মাস কাটাইয়া আসিল—তখন নারাণী তাহার পেটে আসিয়াছে। জন্মিল সেই নারাণী। কিন্তু তাই বলিয়া কানাই হাজরার আর ভুল হইল না। অবশ্য নারাণীর মায়ের পক্ষে আর বেশি জেল-ফৌজদারির ধকলে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কাজ করিয়াছে, ধান ভানিয়াছে, সিদ্ধ করিয়াছে, ব্যাপারীদের কাছেও চাষীর বউ নিজে বহিয়া লইয়া গিয়াছে দরকারের মতো চিঁড়া, মুড়ি। তারপর যুদ্ধের দিনে বহু কষ্টে দিন কাটাইয়াছে। নারাণীকে মানুষ করিয়াছে। ঝোঁটামুটি

অবস্থা দেখিয়া মধুর সঙ্গে বিবাহ স্থির করিয়াছিল—বিবাহের পূর্বেই সেবারকার জ্বরে নারাণীর মা মরিয়া গেল। নারাণীকে বিবাহ দিল কানাই। এখন মধুদের বাড়িতেই নারাণী আছে। জামাই-শ্বশুরে জমিদার-মহাজনের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে এই কয় বৎসরে তাহারা ঝানু 'সমিতিওয়ালা' হইয়া উঠিয়াছে। কোন খালের জলে কোন ক্ষেত ভাসে, স্লুইস গেট হইলে কতটা জমি রক্ষা পায় কোন ইউনিয়নের, ভেড়ি কাটিয়া কোন জমিদার কতটা মাছের ব্যবসা ফলাইতেছে, গোমস্তা-মহাজনরা কেমন করিয়া কৃষকদের লুঠ করিয়া নিঃশেষ করিল, দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে কেমন জমি বিক্রি হইয়া গেল, কত ভাবে মরিল কতজনা, বাঁচিয়াই বা মরিয়া আছে কত ; ফুড্‌কমিটির ও প্রোকিউরিং-এর নামে গরিবের উপর লুঠ চলিয়াছে কিরূপ ;—হেমন্ত মাইতি এম, এল, এ, কতটা চোরা-কারবারের মালিক, গণেশ মণ্ডল হয়তো বা কোন্‌দিন মন্ত্রীই হইয়া বসিবে ;—তাহার ব্যবসা এখন চালে-ডালে-কাপড়ে-কেরোসিনে কত বড় ; গাঁয়ে গাঁয়ে জমিহারা কৃষকের সংখ্যা কত বাড়িয়াছে ; ভাগচাষীদের 'আধি' নানা ওজুহাতে কাটা পড়িতে পড়িতে শেষ অবধি কত সিকেয় গিয়া দাঁড়ায় ; জমিদারের খোলায় ধান তুলিলে আর সে ধানের কয় আঁটি যাইবে কৃষকদের ঘরে,—এক কথায় সমস্ত দক্ষিণ অঞ্চলের ছবিটা কানাই হাজরা আপনার নখাগ্রে বহিয়া বেড়ায়। কত বার অমিতও তাহা শুনিয়াছে।

হাঁ, সে 'কমরেড' হইয়াছে। সম্মেলন করিতে নেত্রকোণা গিয়াছে, হাজংদের দেখিয়াছে। দিনাজপুরে গিয়াছে, সেখানকার কমরেডদের সঙ্গে গল্প করিয়াছে। খুলনা যশোর,—কোন কৃষক এলাকায় সে যায় নাই ? তারপর আসিল 'তে-ভাগা'। গোটাতিনেক দাঙ্গার দায়ে তে-ভাগার সময়ে কানাই মাস কয় জেল খাটিয়াছে। এখনো সে প্রায় আধা-ফেরারী। গ্রামে গ্রামে গোপনে ঘুরিয়া বেড়ায়। শহরে অবশ্য প্রকাশ্যেই আসে কৃষক সভার আপিসে। উকিল পাকড়ায়, মামলা-মোকর্দমায় জামিনের ব্যবস্থা করে, ইশতেহার লেখায়, ছাপা কাগজ বহিয়া গ্রামে নেয় ; নিজে পড়ে, দশজনকে পড়িয়া শোনায় ; পার্টির কাগজের পাতা খুলিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া তাহা পড়ে ; না বুঝিলে সমিতির

আপিসের কাহাকেও ধরিয়া গলদ্‌ঘর্ম করিয়া ছাড়ে। ময়লা রংএর বেটে-খাটো এই মানুষটি এখন বোধ হয় চল্লিশের দিকে আসিয়াছে,—কৃষক সমিতির পরিচিত লোকদের সে 'হাজরা দা'। সভায় মিছিলে তাহার মোটা ভাঙা-গলা সকলে চিনে। তাহার খাঁদা নাক, ছোট চোখের তীব্র চাহনি সকলের পরিচিত। অমিত গত দশ বৎসরে তাহাকে কতবার কতখানে দেখিয়াছে। তাহার কথা, তাহার মোটা গলার স্লোগান শুনিয়াছে। কিন্তু এই সময়ে হাজরাদা, কলিকাতা আসিয়াছিল কেন? তাহা না হইলে নিশ্চয়ই ধরা পড়িত না।

অমিত বলিল, এখানে এসেছিলেন কোথায়, হাজরাদা?

আমরা আবার কোথায় আসব? আমাদের আপিসে।

কৃষক সভায়?

হাঁ, জেলা কৃষক-সভার আপিসে। তিনবার খবর পাঠালে ফর্ম পাঠায় না সম্পাদক। ওদিকে মেম্বর করার দিন যায়। ইউনিয়ন কৃষক-সভায় লোকেরা বলে, 'হাজরাদা, থাক্ তোমাদের ফর্ম। আমরা এমনিই তো মেম্বর আছি। এখন বরং এস, কাজটা কি তাই বল।' কাজের কি অভাব রে, বাবা, যে আমায় তা বলতে হবে? কিন্তু সভা করবে না, মেম্বর করবে না, তবে সমিতির কাজ চলবে কি করে? কাল এসে তাই সেক্রেটারিকে পাকড়ালাম। 'ওসব শুনব না—কাগজ পাই না, ছাপা নেই। যেখান থেকে পার দাও মেম্বর করার ফর্ম।'

তারপর?

সেক্রেটারি বললে—আজ ফর্ম আসবে ছাপাখানা থেকে। ছাপা হলে ইশ্‌তেহার নিয়ে আজ যাব। তাই রয়ে গেলাম একটা দিন। রাত্রিতে শুয়েছি, ভোর না হতেই ধাক্কাধাক্কি। ওঠ, ওঠ, পুলিস এসেছে। তারপরে তো এখানে বসে আছি। আপনারা তো বেশ গল্প জমিয়েছেন; কিন্তু আমরা চাষারা করি কি?

কেন? আসুন না, একটু ঝিমিয়ে নিই—খাবার যতক্ষণ না আসে।

খাবার দিবে—এ সম্ভাবনায় কানাই হাজরা একটু আশান্বিত হইল। ক্ষুধা পাইয়াছে। কৃষক মানুষ না খাইয়া পারে? কিন্তু তাহাকে ধরিল কেন?

অমিত একটু ব্যাখ্যা করিল। আটক বন্দী হিসাবে জেলে ধরিয়া রাখিলে কি কি আইনত সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাও জানাইল। হাজরাদা শুনিল, শুনিয়া মনে মনে বেশ প্রলুব্ধই হইল। তাই তো, দিন তাহা হইলে মন্দ কাটিবে না। কিন্তু কত দিন?

জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কতদিন ধরে রাখবে?

ঠিক নেই। যতদিন সরকারের খুশি!

হাজরাদা চমকিত হইল।—তার অর্থ? তাহলে এই যে, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে লড়াইর আয়োজন করছিলাম, তার কি হবে?

কি আর হবে, করবে ওরা যেমন করে পারে।

আমি থাকব না তাতে?

কি করে যাবেন—ধরে রাখলে?

জামিনও পাব না?

জামিন এ আইনে হয় না, হাজরাদা!

সত্য বলছেন, অমিতবাবু?

নইলে এই আইনের বিরুদ্ধে এত আমরা আন্দোলন করছিলাম কেন?

কানাই চিন্তাগ্রস্ত হইল। মুখে কথা নাই, কিছুক্ষণ পরে কহিল, তা হবে না, অমিতবাবু।

কি হবে না?

ও সময়ে জেলে বসে থাকা চলবে না। সবাই লড়বে, আর কানাই হাজরা বসে থাকবে জেলে? সে অধর্ম্ম হবে।

করবেন কি ধরে রাখলে?—অমিত উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে।

সে আমি কি জানি? আপনারা ভেবে ঠিক করুন। কিন্তু জেলে বসে থাকব না। কত কাজ পড়ে রয়েছে।

অমিত বলিল, কাজ আছে? তা জামাই দেখবে না?

হাজরা উত্তর দিল, সে তো দেখবে তার কাজ,—তা বলছি না।

কি কাজের কথা আবার তাহলে?—

কি মুশকিল! অমিতবাবুকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে তাহাও? হাঁ, মধু ক্ষেত দেখিবে, অবশ্য নারাণীর ছেলে-মেয়ে হইবে। না, নারাণী প্রথম পোয়াতী নয়। শাশুড়ী আছে শ্বশুরও আছে; বউকে তাহারাই দেখিবে। তবু বাপকে নারাণা এখন ছাড়িয়া থাকিতে চায় না। মা নাই, তাই বাপের উপরই তাহার সকল মমতা।

হাজরাদার মনটি কেমন করিয়া উঠে—নারাণী না জানি তাহার পিতার গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া কি করিবে? কোনো একটা বিপদ না ঘটিলেই হয়। এখনো·দেরি আছে নারাণীর প্রসবের, সামলাইয়া উঠিবে নারাণী। আর না হইলেই বা কি? নারাণী তো তাহার মাতার মুখে, পিতার নিকট কতবার শুনিয়াছে—কেমন করিয়া তাহার বোন কাতু জন্মিয়াছিল যখন কানাই জেলে, আর কেমন করিয়া সে বোন কাতু চলিয়া গেল তাহাদের চোখের সামনে দিয়া। তখন কানাই জেলে যায় নাই, যাইতে চাহেও নাই; কিন্তু রাখিতে পারিয়াছিল কি কাতুকে ধরিয়া? এমনিই ব্যাপার! ঠাকুর-দেবতাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

চাষীর ঘরের মেয়ে নারাণী, চাষীর ঘরের বউ। হাঁ, মধুও জামাই ভালো; দরকার হইলে সব করিবে। শ্বশুরের জমি-জমা যাহা আছে সে দেখিবে না তো দেখিবে কে? দরকারমতো সমিতির কাজও মধু করিবে। সে ভাগচাষী নয়, 'তে-ভাগাতে'ও করে না। নিজের জমি নিজে চাষ করে। ধানী জমি নয়, নানা শাক-সব্জীর, লাউ-কুমড়ো রবিশস্য নানা ফসলের। কিছু কলার চাষও আছে। জন-মুনিষ তাহারও লইতে হয়, মজুরি দেয়, মজুর খাটায়। তবে ক্ষেতের ফসল নিজেই মধু গোড়ের হাটে বহিয়া লইয়া যায়, বিক্রয় করে—সে স্বচ্ছল চাষী, গরিব চাষী বা ভাগচাষী নয়। তবু 'তেভাগায়' সেবার মধু সকলের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে। এবারও করিবে—অবশ্য নারাণী পারিবে না। না, সে পারিবে না এখন।

তাহার মা থাকিলে দেখিত অমিতবাবুরা। সেবার ফসল ক্রোক করিতে পিয়াদা যখন বসে দশ গ্রামের মেয়েদের সে-ই জড়ো করিল—নারাণীর মা। সেই দিনাজপুরের চাষী মেয়েদের মতো—তাহারাও নামিত যুদ্ধে। এখনো লড়াই করিবে অন্যেরা। চাষীর বউ, চাষীর মেয়ে, তাহারা বসিয়া থাকিবে নাকি? ইহা তো জানা কথাই—লড়িলে মরিতে হইবে। দেখিবে অমিতবাবু, দেখিবে চাষীর বউদের, চাষীর মেয়েদের সাহস···

অমিত কৌতুক বোধ করিতেছিল। 'নারাণীর মায়ের' কথায় হাজরাদার মুখ খুলিয়াছে, এবার আর সহজে থামিবে না। যথানিয়মে বলিবে—কেবল দিনাজপুরেই কি মেয়েরা 'তেভাগায়' সাহস দেখাইয়াছে? সাহস দেখায় নাই চব্বিশ পরগনার চাষী-মেয়েরা? বাঙলা সেই বিয়াল্লিশ হইতে কত জেলে গেল। ঝাঁটা লইয়া, ঠ্যাঙা লইয়া, ধান ভাঙিবার কাঠের ডাণ্ডা লইয়া কতবার তাহারা তখনি পুলিসকে, জমিদারের পাইককে তাড়া করিয়াছে। 'নারাণীর মা'—অমিত তো তাহার কথা জানে? জানে বৈকি—সহজ কথা তো নয়। শুনুক তবু আবার।

আবার অমিত তাহা শোনে—'নারাণীর মা' তের সাল আগে কেমন লড়াই করিয়াছিল: ভেড়ির ওদিক থেকে আসছে ছোট দারোগা। পুলিস তার সঙ্গে তিন জন। নারাণীর মা বলে—'তোরা আয়।' ধান ভানবার কাঠটা নিলে হাতে। মন্নুর মা, কানুর পিসি বলে, 'তুই থাক্ বউ পিছনে, আমরা যাই সামনে;—আমাদের বয়স হয়েছে। তুই এখনো সোমত্ত বউ।' নারাণীর মা বলে, 'হুঁ। তুমরা গতরে পার না, চক্ষে দ্যাখো না; আর আমি বসে থাকব?'—তারপর 'হৈঁই' বলে ছুটে বেরুল নারাণীর মা—হাতে সেই কাঠটা। ছোট দারোগা বলে—'ওমা! কে এল!' তিন-তিনটা পুলিস বলে—'আর যাব না।' নারাণীর মা বলে 'আয় নারে ডেকরারা'—

কানাই হাজরা থামিবে না। যাহা শতবার শতজনকে শুনাইয়াছে, তাহাই আবার শুনাইবে আরও শতবার আরও শতজনকে—নারাণীর মায়ের সেই বীরত্বকাহিনী।

অমিতও আবার শুনিতে লাগিল, শুনিল। আর শুনিতে শুনিতে তাহার মনে পড়িল—সেই কৃষক মা-বউদের কথা, স্বদেশী মেয়েদের কথা, গান্ধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ শত শত মহিলা-কর্মীর কথা—আর অনুর কথা, মঞ্জুর কথা আর ইন্দ্রাণীর কথা। ভাবিতে লাগিল—সত্যই তো, লড়াই তো করিয়াছিল তাহারা,—এই চাষীর ঘরের মেয়েরাও করিয়াছে। ইহারা ইস্কুলে-কলেজে-পড়া মেয়ে নয়; ভদ্র শিক্ষিত সমাজের মেয়ে নয়, গান্ধীজীর কংগ্রেসের ডাকেও আসে নাই। সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়ে, লড়াই করিয়াছে নিজেদের জমিজমার দাবিতে, নিজেদের দুঃখের জ্বালায়,—পুরুষের সঙ্গে দাঁড়াইয়া। হাঁ, মেয়ে তাহারা কেউ বা ভালো, কেউ বা মন্দ,—যেমন পার্বতী, বিলাসপুরীয়া মংগলী। পৃথিবীতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক নেত্রী বা কর্মীরাই বা কে তাহা ছাড়া অন্যরূপ? কেহ বা ভালো, কেহ বা মন্দ। শুধু রাজনৈতিক মেয়েরা কেন, সকল মেয়েরাই তো এইরূপ—কেহ বা ভালো, কেহ বা মন্দ। পৃথিবীর কোন্ দেশেই মেয়েরা অন্যরূপ? কিংবা পুরুষরা ভিন্নরূপ? তবু সত্য যাহা তাহা এই: পৃথিবীর এই বিপ্লবের আগুনে মেয়েরা যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে রুশ দেশে, চীনে, স্পেনে, আমরা সকলে তাহা জানি। কিন্তু জানি কি সকলে—ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে বাঙলা দেশের চাষীর ঘরের মেয়েরাও?—এ সত্যটা কি আমরা বুঝিয়া দেখিতেছি? তাহারা শিক্ষিতা নয়, বিদুষী নয়, দেশের নামে বড় কথা বলিতে পারে না। হয়তো নিজেদের কথা নিজেরাও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। জানে না—দুনিয়া-জোড়া বিপ্লবের মহামহীয়ান সাধনার মধ্যে বাঙলা দেশের অখ্যাত গ্রামের অবজ্ঞাত নির্যাতিত নারী-জীবনের মধ্য হইতে এই যে দুঃসাহসের স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল—কোথায় মথুরাপুরের কোন্ গাঁয়ের ভেড়ির কাছে, তারপর দিনাজপুরের কোন গ্রামে, না, হাজংদের কোন পাড়ায়, আর কাকদ্বীপ-তমলুকের কোন্ অজ্ঞাতনামা গ্রামে—কী ইহার অর্থ—কী ইহার ইঙ্গিত? কোন সমাগত-প্রায় ভূকম্পনের প্রথম অগ্নিগর্ভ, আভ্যন্তরীণ থর-থরি ইহা? আগামী দিনের কোন মুক্ত, আত্ম-মর্যাদাময় নারী-জীবনের প্রথম উদ্বোধন? ইহারা

তাহা জানে না, আমরাই কি জানি?—কানাই হাজরার মুখে সেই 'নারাণীর মা'দের গল্প যাহারা শুনি সকৌতুকে—একটু অবজ্ঞার সহিত, একটু অবিশ্বাসের সহিত, হয়তো বা একটু ভদ্র-বর্গীয় কৃপা ও কৌতুকের সহিত। এখনো আমরা বুঝি কি কী তাহার অর্থ?…বোঝ কি তাহা তোমরা, মঞ্জু?…বোঝে কি অনু?—আর বুঝিতে পার কি তুমি বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণী…

অমিত বলিল, কিন্তু নারাণী তো এখন পারবে না এসব কাজ, হাজরাদা।

কানাই হাজরা থামিয়া গেল। বলিল, আহা, আজ না পারুক কাল করবে। তা বলে চুপ করে বসে থাকবে নাকি চিরকাল?—

কানাইর কি মনে পড়িল। একটু পরে আবার বলিল, না, এটা কি বসে থাকার সময় আমাদের? আপনারা শহরে থাকেন, কত লোকজন, কত কর্মী এখানে! কিন্তু আমাদের ওখানে লোক কোথা? কে ইশতেহার বাঁটবে, কে মেম্বর করবে, কে বৈঠক ডাকবে? আর, এসব এখন না করলে মণ্ডলদের সঙ্গে পারব কেন? সরকারী চালডালের ব্যবসাদার পুলিসের জ্বালায় আমরা বাঁচব কিরূপে? এখন থেকে তৈরি না করলে এবারকার 'তে-ভাগার' লড়াই কি আর ঠিকমতো আরম্ভ করা যাবে? সেবার জমিদাররা জোতদাররা বেঁচে গিয়েছে। শুনেছে, তে-ভাগা আইন হবে, আগে থাকতেই তাই অনেকে ভাগ দিয়ে দিলে। এ সাল আমরা দোমনা হলাম—আপনারাও পরিষ্কার করে কিছু বললেন না। বললেন, 'যে-গ্রামে তে-ভাগা চায়, সে গ্রামে তে-ভাগা হোক; যারা চায় না তারা তা করবে না।' আপনাদের যেমন কথা—কোন গ্রামে আবার কোন চাষী জোতদারকে সাধ করে ধান তুলে দেয়? তে-ভাগা চায় না তা হলে কে? কিন্তু সমিতির একটা নির্দেশ চাই। একবার যখন তে-ভাগার লড়াই শুরুই করেছি,—এক সাল তা আদায়ও করেছি, তখন আবার অন্য কথা কেন? অমন লড়াই গিয়েছে সে সালে, কিন্তু এ সালে আপনারা চুপ করে রইলেন। ভাবলেন, 'কংগ্রেস রাজা হয়েছে, দেখি কি করে।'

কংগ্রেস রাজা হয়েছে, তাই জমিদাররা এ সাল জোর পেয়েছে। মন্ত্রীরা ওদেরই লোক। পোয়া বারো এবার জমিদার-জোতদারের। এসব বুঝেই তো এখন থেকে আমাদেরও জোর প্রচার চালাতে হবে, জোর সংগঠন করতে হবে—এবারের শীত কালে যেন আর জমিদারের খোলানে চাষীরা একজনও ধান না তোলে। নইলে কি এই মন্ত্রীরা আইন নিজে থেকে পাশ করবে? —কিছুতেই না।

কানাই হাজরার মুখ আবার খুলিয়া গিয়াছে—এবারের শীতের পূর্বেই কি কি করিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা সে কল্পনা করিয়া বলিয়া যাইতেছে। বসিয়া থাকা চলিবে না জেলে। এখনি কাজে লাগিতে হইবে তাহাকে। অমিত তাহার সঙ্গে কথায় যোগ দিল—কি করিবে আর? কানাই হাজরা ভুলিয়া গিয়াছে এ তাহার গ্রাম নয়; এটা তাহার সমিতির আপিসও নয়; কলিকাতার গোয়েন্দা আপিসের প্রায়-অন্ধকার গৃহ। কানাইর কল্পনা আগামী দিনের লড়াইর নামে এখনি ছুটিয়া চলিতেছে—সেখানে বিলম্বের কারণ নাই, সংশয়ের অবকাশ নাই…চাষীর সংগ্রাম আজ আরম্ভ হইয়াছে, আজ যদি নারাণীর মা থাকিত। সে একটা মানুষ ছিল, অমিত জানে তো। তবু কাজ আরম্ভ যখন হইয়াছে তখন আবার দ্বিধা কোথায়, মীমাংসা কোথায়? সময় নাই, সময় নাই হাজরাদার।…

পাঁচ

সত্যই খাবার আসিয়াছে। আর কানাই হাজরার চোখ-মুখ এক নিমেষে আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চাষীর ক্ষুধা!

কিন্তু কী খাদ্য? প্রত্যেকের জন্য শুকনো খান চারেক ছোট ছোট পুরি ও কিছু তরকারি; 'ওয়ার-ইকোনমির' ছোট একটি রসগোল্লা। কানাই হাজরা যেন বিমূঢ় হইয়া গেল—এক থালা ভাত-নুন-লঙ্কাও নাই!

একটু একটু বাঁটিয়া খাইয়া জলের অভাবে পড়িতে হইল। জল নাই, গেলাসও নাই। জল যদি পান করিতে হয় তাহা হইলে পথের একটা টিউব ওয়েলে চারজন-চারজন করিয়া গিয়া তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারিবে, অনুমতি হইয়াছে। তাহাতে অবশ্য পাহারাদারের কাজ বাড়িবে; কিন্তু কি করা? এতগুলি ভদ্রসন্তান এবং 'লেডিজও'। কিন্তু আপিসের এমন ব্যবস্থা যে জলও তাঁহারা পাইতেছেন না—জানাইলেন দপ্তরের সেই অপ্রতিভ খুদে কর্মচারীটি। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন: চা আসছে স্যর, একটু পরে। তিনি তো তাঁহাদের অমর্যাদা করিতে পারেন না।

টিউবওয়েলে জলপান করাটা মঞ্জুর কাছে যেন একটা উৎসব। পারিলে সে স্নানে বসিয়া যায়। বেলা আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে স্নান নাই, হাতমুখ ধোয়া নাই, এই চৈত্রের গরমে একটা ঘরে এতগুলি লোক চার-পাঁচ ঘণ্টা যে কি ভাবে কাটাইল, এতক্ষণ তাহা তবু মঞ্জুর মনেই হয় নাই। উড়িয়া গিয়াছে গল্পে, তর্কে, আলোচনায়—সকলকার সঙ্গে অবিশ্রান্ত কথায়। আহার আসিতে এবার মঞ্জুর তাহা মনে পড়িল। তাই, হউক রাস্তা, আর থাকুক পাহারা, মঞ্জুর স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণলীলা কোনো পাহারা মানিয়া চলিতে চাহিল না। জল ছুঁইতে পাইয়া তাহার আনন্দ, আঁজলা ভরিয়া পান করিতে আনন্দ, মুখ ধুইতে গিয়া শাড়ি-কাপড় ভিজাইয়া আনন্দ, আর সে আনন্দ

ঝাঁপাইয়া গেল বিজয়, দিলীপ, কান্তি ও তাহার বন্ধুদের জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া দিতে দিতে। একটা খেলা জমিয়া যায় সেখানেই।

অমিত হাসিল—মঞ্জুর নিকট সব কিছুই এখনো একটা খেলা—জলও, জেলও।···

ফিরিয়া আসিয়া অমিত একটা কেদারায় বসিল। এবার তাস লইয়া বসিল আর একদল। হাজরাদা এবার একটু ঝিমাইয়া লইবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। অমিত কেদারায় বসিয়াই ঝিমাইতে পারিবে।

ই ঠিক নেহি হ্যায়।

অমিত দেখিল তাহার পার্শ্বে বুল্‌কন্‌। তাহাকেই কি কিছু বলিতেছে বুল্‌কন্‌?

কি ঠিক নেহি হ্যায়, কমরেড বুল্‌কন্‌?

বুলকন জানাইল—সকলে আবার তাস খেলিতেছে কেন? খেলিতেছে তো কেবল ইংরাজী খেলা খেলিতেছে কেন? ইহা ঠিক নয়। দেশী খেলা হইল বিস্তি, টুয়ানটি-নাইন,—হাঁ সে খেলিত এক-আধটুক। কিন্তু তাই বলিয়া সারাক্ষণ তাস খেলা? 'ই ঠিক নেহি হ্যায়।'

গোরখপুর কিংবা আজমগড় জিলায় বুল্‌কনের ঘর। কিন্তু 'বঙ্গালী' বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিলে তাহাতে আপত্তি করে কেন লোকে? বিশ সাল সে বঙলা দেশে আছে—এই বঙলা মুলুকে আপনার রুটি কামাই করিয়াছে। সে বঙলায় কথা বলিতে পারে, জরুরত হইলে বঙলায় ভাষণ ভি দিতে পারে।

বুল্‌কন্‌ বলিত—'ঘর কাঁহা? যাঁহা মেরা কাম, উহা মেরা ধাম।'—মজদুরের আবার অন্য 'ঘর' কি।

অমিত বুল্‌কন্‌কে দেখিয়াছে সেই যুদ্ধের প্রথম দিকটায়; ট্রামের ইউনিয়ন তখন ইহারা গড়িয়া তুলিতেছে। ট্রাফিকের লোকেরা তখনো ইউনিয়নে আসিতে প্রায় চাহে না। ইউনিয়ন চলিত ওয়ার্কশপের মজুরদের লইয়া।

তখনো ইউনিয়নের জীবনে জোয়ার লাগে নাই। বুলকনের মতো ট্রাফিকের লোকেরা দুই-চারিদিন মাত্র তাহাতে যোগদান করিয়াছে; অন্যদের প্রাণপণ করিয়া বুঝাইয়া পড়াইয়া ইউনিয়নে আনিতে চেষ্টা করিতেছে। সে কি কঠিন প্রাণান্তকর প্রয়াস তাহাদের। বুল্‌কন্‌ তখনো ভালো করিয়া বাঙলা বুঝিতেও পারে না, বলা তো দূরের কথা। হিন্দীতেই কি কিছু বলিতে পারিত বুল্‌কন্‌? কোথায়, মনে পড়ে না অমিতের বুল্‌কন্‌কে তখন কিছু বলিতে শুনিয়াছে।...

সে দিনের সেই ট্রাম ইউনিয়নের ছোট ঘরে ট্রাম মজুরদের ছোট সভায় 'ডিউটি' শেষে তাহারা ছোট ছোট দলে আসিত। শ্রান্তমুখ, ঘর্মাক্ত কলেবর, খাকীর ইউনিফর্ম ও মাথার টুপি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। তবু তাহারা আসিয়াছে ডিউটির শেষে বিশ্রাম না করিয়া। মেসে গিয়া স্নানও সারিয়া লয় নাই, সরাসরি ইউনিয়ন আপিসে আসিয়াছে। সাড়ে পাঁচটায় মিটিং, ছয়টায় অন্তত আরম্ভ করিতেই হইবে। ট্রাফিকের কোন এক সেকশনের লোকদের আসিবার কথা। তাহাদের বুঝাইতে হইবে, ইউনিয়নে আনিতে হইবে; তাহারা যেন আসিয়া না দেখে বুলকনেরা নাই। কত করিয়া বুঝাইতে হইবে উহাদের। ভাঙা হিন্দীতে, ভাঙা বাঙলায় গলদঘর্ম হইত ইউনিয়নের ইংরেজী পড়া বাঙালী কর্মীরা। তাহারা জেল খাটিয়াছে; কালাপানি গিয়াছে। কিন্তু হায়, হিন্দী কেন শিখিল না? ইহারই মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইত দুর্গা দত্ত, অবধপ্রসাদ বা ইয়াকুব। তাহারা ট্রাফিকের লেখাপড়া-জানা শ্রমিক। কিন্তু বক্তৃতা করিতে শিখে নাই, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসও জানে না। রাজনীতির কথাও অতি অল্পই শুনিয়াছে ইতিপূর্বে। সবাই গান্ধীজীর কথা জানে; তাহা শুনিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়াছে, মনে মনে কংগ্রেসের আন্দোলনে প্রেরণাও অনুভব করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়াছে—ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শোষণেরই একটা অঙ্গ এই ইংরেজ ট্রামমালিকদের শোষণ, এই অত্যাচার, এই অপমান। কথাটা বুল্‌কনের মনে লাগিয়াছে। সাম্রাজ্য-বাদ কী, কে জানে? সে বুঝে এই ট্রামমালিকদের রাজত্ব। ম্যানেজার

ভুর্ণ সাহেবের অত্যাচার, ফিরিঙ্গি সুপারিন্টেণ্ডেন্টের জুলুম—ইহাই তবে সাম্রাজ্যবাদ ? আর ইহারই সঙ্গে কমরেড কালীর মুখে সে শুনিয়াছে 'শ্রমিকের এমন দেশ আছে যেখানে মালিকের শোষণ নাই, আছে শ্রমিক-কৃষকের স্বাধীনতা ; যেখানে বেকারি ও ছাঁটাই নাই, আছে কাজ-পাইবার স্বাধীনতা ; আছে তাই রুটির স্বাধীনতা, রুজির স্বাধীনতা, স্বাধীনতা মজদুরদের রাষ্ট্র-পরিচালনার।' কিন্তু যাহাই শুনুক, একটা সত্য বুঝিয়াছে—নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়া তাহারা কয়জনেই বুঝিয়াছে—দুর্গা দত্ত, ইয়াকুব ও বুল্‌কন্‌—শ্রমিকের 'একাই' চাই, ট্রাম শ্রমিককে 'একাট্টা' করিতে হইবে, মজবুত করিয়া ইউনিয়ন বানাইতে হইবে। তাহা ছাড়া তাহাদের বাঁচিবার পথ নাই—বাঁচিবার পথ নাই '৭১৩ নং' কনডাক্‌টার বাঙালী দুর্গা দত্তের, '১১৭৭ নং,' ইউ-পীর ব্রাহ্মণ অবধপ্রসাদ পাণ্ডের, '৯৫৬ নং' ড্রাইভার শাহাবাদের মুসলমান মহম্মদ ইয়াকুবের, আর বাঁচিবার পথ নাই '১৩০২ নং' কনডাক্‌টার আজমগড়ের বুল্‌কন্‌ লোহারের। ট্রামের কোনো শ্রমিকেরই বাঁচিবার পথ নাই,—'ওয়ার্কশপের' শ্রমিকের নাই, 'ট্রাফিকের' শ্রমিকের নাই, 'মিনিয়ালের' শ্রমিকেরও নাই।

কথাটা বলিতে বলিতে ইয়াকুবের উর্দু জবান যেন ধারাল হইয়া উঠিল। পার্শ্বের ঘর হইতে অমিত কান পাতিয়া শুনিয়াছে, দুয়ারের বাহির হইতে সংকোচে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়াছে,—হয়তো তাহাকে দেখিলে বাধা পাইবে বক্তা, মনোযোগ ভাঙিয়া যাইবে অন্যদের। তবু এমন চমৎকার যে ভাষা তাহারই কানে ঠেকিতেছে কী না জানি তাহার প্রভাব ঘরের উপস্থিত মজুরদের উপর ?...কিন্তু তাহা বুঝিবার উপায় নাই। শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কেহ শুধু চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে। কেহ বা ঘুমে ঢুলিতেছে। তবু কাহারও চোখ চক-চক করিয়া উঠিতেছে। একঘর পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের সেই ভিড়-বহুল ঘরের মধ্যে সেই মুখগুলি···একটা বৈশিষ্ট্যহীন দৃশ্যই অমিতের চক্ষে বেশি জাগে! ইহার মধ্যে কখন ড্রাইভ পাণ্ডে, সাচ্চা হিন্দীতে নিজের ভাষা তখন সে খুঁজিয়া লইতেছে। নিজের কানে অমিত

শুনিত দূরের পদক্ষেপ।…… আশ্চর্য, মানুষের এই আপন ভাষাকে আবিষ্কার!…

অমিতের জানিতে আগ্রহ জাগিত। বসিয়া বসিয়া অমিত কয়েকদিন যদি পাণ্ডের এই আত্মাবিষ্কারের প্রয়াসকে লক্ষ্য করিতে পারিত! ইহাতে পাণ্ডের পক্ষে শুধু ভাষা আবিষ্কার নয়, আসলে পাণ্ডের আপনাকেই আবিষ্কার। কর্মসূত্রের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি-সতেজ সাধারণ মানুষের সত্তার জাগরণ,—ভাষার মধ্য দিয়া সেই জাগ্রত চেতনাকে তারপর মেলিয়া ধরা; দশ-জনের সামনে সেই ভাষা রাখিয়া নিজেকে আবার গড়িয়া লওয়া সচেতন মানুষরূপে।

…এক-একটা মানুষের এই জ্ঞাত-অজ্ঞাত সাধনাও পৃথিবীতে কত বড় এক বিস্ময়। কত তাহার বৈচিত্র্য আর কত তাহার অভিনবত্ব! ইহারও মধ্যে কতখানি মহাকাব্যিক বীর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, মানুষ যেন ইতিহাসের এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সিলেবল্—অক্ষর!…অমিত মাঝে মাঝে তাহাই দেখিয়া চমকিত হইত। দুর্গা দত্তের বিপন্ন অসহায় অবস্থা সে দেখিয়াছে। কথা বলিতে হয়, বক্তৃতা করিতেও জানে। তবু সে জানে, সে বাঙলায় যাহা বলিল, তাহা বাঙলায় বলায় তাহার অধিকাংশ সহকর্মীরা উহার মর্ম বিশেষ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহারা বাঙালী নয়। অথচ দুর্গা দত্ত বাঙলা ছাড়া কিসে বলিবে? সে ফরিদপুর-ঢাকার লোক, হিন্দীর এক বর্ণও বলিতে পারে না। অথচ বাঙলা দেশে বাঙলাভাষী মজুর কোথায়? অবশ্য, আসিতেছে তাহারাও রবারের কারখানায়, ইঞ্জিনের ঘরে; আসিতেছে কাপড়ের কলে, রেলওয়েতে; আসিতেছে আয়রন স্টীলে, আসিতেছে ট্রামে ট্রান্সপোর্টে। ভিড় করিয়া আসিতেছে এখন পূর্ব বাঙলার মুসলমান, আসিতেছে পূর্ব বাঙলার হিন্দু। গ্রামের কারিগর-মিস্ত্রি, নিম্ন-মধ্যবিত্ত দোকানী-পশারী, গরিব কৃষকের পক্ষে গ্রাম ছাড়িয়া শহরের দিকে না আসিয়া আর উপায় নাই। কৃষিজীবীর সন্তানেরা তাই দলে দলে আসিতেছে। তবু এখনো গ্রামের মধ্যেই যেন বাঙালীর শিকড়, সে গৃহ ছাড়িতে চায় না।

অবশ্য, অমিত জানে, ভারতের প্রোলিটেরিয়ান্ যুগের আয়োজন বাঙলায়ও চলিয়াছে—আর এই সেই প্রোলিটেরিয়ান্ !

…এই কি প্রোলেটেরিয়ান ?…না। এখানে ইহারা দশমাস কাজ করে ; গৃহের দিকে চোখ থাকে। ছুটিতে দেশে যায়—জমি কেনে, গোরু কেনে, বলদ কেনে, খেতের কাজ ভাই-বন্ধুর সাহায্যে ব্যবস্থা করে। আবার ফিরিয়া আসে কলে,—মাসে মাসে গ্রামে টাকা পাঠায়। এখানে উপবাস করে, বস্তিতে কষ্ট করে দেশে সম্পত্তি বাড়ায়। জমিজমার অভাবে গাঁও ছাড়িয়া আসিয়াছিল—এখান হইতে টাকা কুড়াইয়া সেই জমিজমা বাড়ায়। তাই শেষে আবার সেই গ্রামে ফিরিয়া যায়, আবার 'খেতি' করে, আবার কৃষক হয়, হয়তো বা হয় 'কুলুক', পশ্চিমের খুদে 'জমিদার,' খুদে সাউকার,—বাঙলায় যাহারা ছোট জোত-দার,—মজুর খাটাইয়া জমি চাষ করে। কলের রোজগারের অর্থে স্বচ্ছল হইয়া ইহারাও খেতে মজুর খাটায়, গ্রামে টাকা খাটায়। ইহারাই আবার গ্রামের মজুর কিংবা খুদে খাতকের কঠিনতম শোষক হয়। কি করিয়া ইহাদের বলিব প্রোলেটেরিয়ান্ ?…

কিন্তু সত্যই সম্ভব কি এমন করিয়া ট্রাম মজুরের পক্ষে এই সৌভাগ্যলাভ ? সম্ভব এদেশেও আর ?…অমিত হিসাব করিয়া দেখিয়াছে এদেশে গ্রাম-জোড়া অগণিত দরিদ্রের জীবনযাত্রা কত নিকৃষ্ট। কলের যে-কোন মজুরের মজুরিই উহার তুলনায় একটা ঐশ্বর্য। কিন্তু এই দেশেও আর মজুরের পক্ষে খাটিয়া খাইয়া মজুরি বাঁচানো সম্ভব নয় ; সম্ভব নয় হপ্তার মজুরি হইতে দেশে জমি কেনা। ত্রিশের বাণিজ্য-সংকট ও মজুরি-কাটার পরে তাহা অসম্ভব। তথাপি সম্ভব যদি হয়, কয়জনের পক্ষে তাহা সম্ভব ? হয়তো যত জনের সম্ভব মার্কিন মুলুকে মজুর হইতে ম্যানেজার-মালিকের স্তরে উন্নতি-লাভের, যত জনের সম্ভব ইংলণ্ডে টমাস বা বেভিন্ হইবার,—মাত্র [illegible] জনের। অর্থাৎ ল ক্ষে একজনের।—ইয়াকুব, পাণ্ডে বা বুল্‌কন্, ইহারাই কি সেই ম্যাক্‌ডোনাল্ড্-টমাসের ভারতীয় বংশধর ? না, ইহারা [illegible] দিনের ভারতীয় বলশেভিক-দের অগ্রদূত ?…

অমিত তখনো বুঝিয়া উঠিতে পারিত না কাহাদের সে দেখিতেছে সেই ট্রেড ইউনিয়নের অন্ধকার ঘরে। কিন্তু জানিত দেখিতেছে একটা নতুন দৃশ্য, একটা নতুন জাতি, একটা সম্ভাবনা···শুধুই সম্ভাবনা যাহা এখনো। হাঁ, সম্ভাবনাই। দুর্গা দত্ত বাঙলায় বক্তৃতা করিলে তাহা কেহই বুঝে না। এখনো দুর্গা দত্ত নিজেও বাঙলায় ভালো বলিতে শিখে নাই। বলিতে গিয়াও দুর্গা দত্তের নিজেরই মনে পড়ে, সে শরৎ গাঙ্গুলীর মতো বাগ্মী নয়। সে মোতাহেরের মতো ক্ষুরধার বাক্যে মালিকের যুক্তি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিতে পারে না। নিজের কাছেই দুর্গা দত্তের নিজের কথা মনে হয় যেন দুর্বল, এলোমেলো। মার্কস-লেনিনের কথা তুলিয়া কালীবাবুরা যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের শ্রমিক রাজনীতির কথা বুঝাইতে থাকেন—তখন সে, দুর্গা দত্ত,—ট্রামের শ্রমিকদের '৭১৩ নং'—কালী ঘোষ ও মোতাহেরদের কাছে যে 'দুর্গাবাবু'—সেই জটিল তর্ক-যুক্তিতে যেন দিশাহারা হইয়া যায়। বড় অযোগ্য শিশু তাহারা তখনো। অবধপ্রসাদ ও ইয়াকুবও জানে এখনো তাহারা মার্কস বা লেনিনের বই এক বর্ণও পড়িতে পারে না। আর তাহা না পড়িলে কি বুঝিবে তাহারা শ্রমিক রাজনীতির? তাহারা শিশু—কি করিয়া নিজেদের সামান্য ইউনিয়ন চালনা করিবে? হিসাবপত্র রাখিবে, চিঠিপত্র লিখিবে, দাবিদাওয়া প্রণয়ন করিবে, প্রচার-পত্র তৈয়ারি করিবে; তারপর লড়াই ঘোষণা করিবে, লড়াই চালাইবে; আর মুখোমুখি হইবে মালিকের ও ম্যানেজারের—সাদা আর কালা বড় বড় সব 'বাঘা-বাঘা' মানুষের—ইহা কি তাহাদের দ্বারা কোনো কালে সাধ্য?

অমিতেরও এক-একবার সংশয় হইত। তবু সে দেখিত, সেই ঘর্মাক্ত, শ্রান্ত ট্রাম শ্রমিকের সাগ্রহ প্রয়াসের মধ্যেই একটা 'সম্ভাবনা'···দেখিত তাহা ইয়াকুবের মুখে, পাণ্ডে ও দুর্গা দত্তের মুখে, দেখিত বুল্‌কনের মধ্যেও। কিন্তু বুল্‌কন্ তখনো বক্তৃতা করিত না, করিবার কথাও ভাবিত না। সভার শেষে শুধু পুরুষালি সবল কণ্ঠে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করিত—স্বল্প ভাষায় সহজ বুদ্ধিতে।

সম্ভবত বুল্‌কন্‌ বছর পঁচিশের যুবক। একটু বেশি দেখাইত বয়স। কারণ, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা বুল্‌কন্‌ ইতিমধ্যেই অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছে। তবু সে তুলনায় বয়স বেশি দেখাইত না। কারণ বুল্‌কনের গায়ে আঁচড় পড়িলেও তাহার দেহ সে ঝড়-ঝঞ্ঝায় কিছুমাত্র টলে নাই! সে লোহারের ঘরের ছেলে। হাতুড়ি পিটাইতে পিটাইতে হাত শক্ত হইতেছিল, কিন্তু দেহ আরও শক্ত হইয়া গেল কুস্তীর আখড়ায় লড়িতে লড়িতে। পুরুষানুক্রমে তাহারা লোহা পিটিয়াছে, আর কুস্তীও করিয়াছে আখড়ায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গ্রামে আর দিন গুজরানো যায় না। কালাইটিকেরি লোহারদের মধ্যে বুল্‌কনের বাপই প্রথম নিকটের শহরতলীতে এক বড় লোহার সর্দারের শাকরেদি করিতে গেল। সকালের দিকে ঘর হইতে খাইয়া সে চলিয়া যাইত, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিত। ইতিমধ্যে যখন বুল্‌কন্‌ বড় হইয়া উঠিল তাহার দৌরাত্ম্যে তখন বাড়ির লোক অস্থির। ছত্রি ঠাকুরদের ছেলেকে পর্যন্ত সে উপহাস করিল। কুস্তীতে হারিয়া ঠাকুরের ছেলের অপমান বোধ হইয়াছিল। সেদিনে হইলে ঠাকুরেরা বুল্‌কনের রক্ত চাহিত। এদিনে লোহারেরা মাপি মাঙ্গিয়াই রেহাই পাইল। আর তাই বদমায়েস ও বেতরিবত বুল্‌কনের শাস্তি হইল—বাপের সঙ্গে সকালে বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হওয়া, শহরতলীর একটা ইস্কুলে গিয়া বসা; সারাদিন আবদ্ধ থাকা সেখানকার ক্লাসে। বেত খাইয়া, মারপিট সহিয়া ও মারপিট করিয়া তবু সেখানে বুল্‌কন্‌ সামান্য কিছু লিখিতে পড়িতে শিখিল। হাঁ, অঙ্কও শিখিল, ইংরাজিতে নাম লিখিতে, নাম পড়িতেও পারিল। এক কথায় ‘স্বাক্ষর’ নয় শুধু, বুল্‌কন্‌ ‘ইংরেজি-জানাও’ হইল। লোহারের ছেলে তখন বাপের সঙ্গে শহরতলীর লোহার দোকানের কাজে শাকরেদি করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহা বেশিদিন নয়। বুল্‌কন্‌ তখন পনের বছরের জোয়ান লেড়কা। একদিন আবার ঠাকুরদের এক ছেলের সঙ্গেই লড়াইতে লাগিল। নতুন ইংরেজি-শেখা ঠাকুরের ছেলে তাহাকে গাল দিয়াছিল ‘রাসকেল’ বলিয়া! ইংরেজি জ্ঞানে বুল্‌কন্‌ তাহার অপেক্ষা হীন নহে। সেও পাল্টা

গাল দিল 'রাসকেল' বলিয়া। তারপর যুদ্ধ। এবং যুদ্ধে ক্ষত্রিয় সন্তানের পরাজয় হইল। এবার বুল্‌কনের রক্তই ঠাকুরেরা চাহিলেন—ছত্রির ছেলেকে সে ইংরেজিতে গাল দিয়া বেইজ্জত করিয়াছে। আর,এবার বুল্‌কনের রক্তপাত করিবার ও তাহাকে নাকে-খত দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা করিল বাপ।

কিন্তু বুল্‌কন্‌কে পাওয়া গেল না।

বুল্‌কন্ পলাইল। শহর নয়, বনারস, কানপুর নয়, একেবারে কলকাতা। 'ঊ হামারা মুলুক তব্‌সে'—বুল্‌কন্ বলে।

বড় বাজারে কাজ করিয়াছে বুল্‌কন্—মাল তুলিয়াছে, মাল নামাইয়াছে, বেশিদিন তাহাতেও কাটে নাই। তারপর গিয়াছে লোহাপট্টিতে সেই কাজে। সেখান হইতে মল্লিক বাজারে। আর তাহার পর মোটরের কারখানায়। সেখান হইতে যায় সাহেবদের এক ছাপাখানায় কাজ লইয়া। শক্ত শরীর, ভারী মাল নামাইতে সে ভয় পায় না। যেমন কাজ, তেমন ছিল তাহাদের মজুরি; কোথাও অনিয়ম ঘটে না। একদিন দেরি হইলে মজুরি কাটা যাইবে; তেমনি আবার তলব দিতেও একদিন দেরি হইবে না। বেশ কয়েক বৎসর এই চাকরি চলে।—ছাপা-কাগজ পড়িবার অভ্যাসও এখানেই বুল্‌কনের পাকা হয়। ইংরেজি অক্ষর ছাড়িয়া ইংরেজি শব্দও সে পড়িতে শিখে। তাই কাজে ফাঁক পড়িত। সে ফাঁকি চোখে পড়িল একটা সাহেব ফোরম্যানের। আর তাই সে একদিন গাল পাড়িল। দ্বিতীয় দিন দিয়া বসিল বুল্‌কন্‌কে এক লাথি। তাহার পর যাহা হইবার তাহা হইল। বুল্‌কন্ হয়তো খুনই করিয়া ফেলিত,—অবশ্য খুন করিবার মতলব ছিল না। কিন্তু তাহার কুস্তী-গড়া দেহ, হাত, থাবা, বক্‌সিং-করা সাহেববাচ্চাকে এমন করিয়া ঘায়েল করিল যে, ভূলুণ্ঠিত সেই সাহেব পুঙ্গবের নাক ও মুখ দিয়া যে রক্ত পড়িতেছে, তাহা বুল্‌কনের খেয়ালই হয় নাই। সময়টা তখন খারাপ। বাঙালী-বাবুরা সাহেবদিগকে গুলি করিয়া মারে! তাই ছাপাখানার ফটকে তখন মোতায়েন থাকিত পাঠান পাহারা। নিশ্চয়ই সেদিন সে গুলি চালাইত, কেবল হুকুম পায় নাই। আর কাণ্ডটা প্রথম হইতেই নিজের সামনে

ঘটিতে পাঠান পাহারা দেখিয়াছিল। তাই সে মোটের উপর হৃষ্টচিত্তে সমস্ত ঘটনাটা দেখিল। অন্যেরা যখন বুল্‌কন্‌কে ছাড়াইয়া দিল তখন পাঠান দরওয়ান ফিরিয়া গিয়া ফটকে নিজের আসনে বসিল। বুল্‌কন্‌ তখন ছাপাখানার বাহিরে চলিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জানিতে পারিল—সাহেবরা তাহাকে ধরিবার হুকুম দিয়াছে, তাহার মতো ভয়ঙ্কর আততায়ীকে ধরিবার জন্য থানায়ও সংবাদ প্রেরণ করিয়াছে। আবার বুল্‌কন্‌ গৃহে ফিরিল।

আজমগড়ের গাঁও। মাত্র সাত-আট মাস রহিল ঘরে। বিবাহও করিল ইতিমধ্যে। ঠিক হইল কাজ করিবে নিকটের শহরে। কী কাজ সে না জানে? লোহারের, মুটের, মোটরের ক্লিনারের, ছাপাখানার ছোটখাটো কল চালাইবার কাজ, আরও কত কী সে এই পাঁচ বছরে করিয়াছে! বহু, বহু। মোটর বাস তখন ইউ-পীর পথে পথে শহরে গ্রামে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বুল্‌কনেরও মোটরের কাজ মিলিল এক বাসওয়ালার বাসের আড্ডায়। কিন্তু সেখানে কাজে মন বসিল না; সে শহরে তাহার মন টিকিল না। সে কলিকাতার মানুষ—কলিকাতার মায়া তাহাকে আকর্ষণ করিল। হাঁ, কাজই যদি করিতে হয় তবে কলিকাতায়। বুল্‌কন্‌ কলিকাতায় ফিরিল।

হরনন্দন সিংএর সঙ্গে আজমগড়েরই আখড়ায় পরিচয় হইয়াছিল; কলিকাতায় ট্রামে হরনন্দন কাজ করে। তাহার সাহায্যে বুল্‌কন্‌ প্রবেশ করিল ট্রামের কন্‌ডাক্টারের কাজে। বুল্‌কন্‌ লেখাপড়া জানে, কিছু ঘুষ তবু তাহাকে দিতে হইয়াছিল। সেই-সব হরনন্দন ব্যবস্থা করে; বুল্‌কন্‌ পরে শোধ করিয়াছে। ফিরিঙ্গি সাহেব দেখিয়াছিল তাহার জোয়ান চেহারা, চওড়া সিনা, লম্বা দেহ, শক্ত হাত, সবল পেশী, মোটা মোটা হাড়, চোয়ালের হাড়ে, মুখের পেশিতে, সমস্ত মুখের গড়নে, একটা সুস্থ শক্তিমান মানুষ। হয়তো বুদ্ধি তত তীক্ষ্ণ নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহে যে একটা তেজ ও মর্যাদাবোধের চিহ্ন আছে, তাহাতে ব্যক্তিত্বের একটা আভাস

ফোটে নাই কি ?···অগ্রাহ্য করিতে পারে নাই অমিতও তাই যখন সে প্রথম দেখিয়াছিল বুল্‌কন্‌কে। সেদিনকার আরও কত পরিচিত মুখ স্মৃতির পট হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের কাহারও মুখে শান্ত শ্রী ছিল, কাহারও মুখে ছিল বুদ্ধির আভা, কাহারও সাধারণ মানুষের সহজ সাধারণ মুখ—যাহার অন্তরালে থাকে কোনো না কোনো অসাধারণত্বের প্রচ্ছন্ন স্বাক্ষর,—কোথায় তাহারা চলিয়া গেল ? অমিতের মনে বুল্‌কন্‌ স্থান করিয়া রহিল কিরূপে ?···

ইউনিয়নের আন্দোলনের মধ্য দিয়া সে দিনের পর দিন শ্রমিক আন্দোলনের উৎসাহী উদ্যমশীল কর্মী হইয়া উঠিল, শুধু এই বলিয়া কি ? অনেকাংশে তাহা সত্য ; নিশ্চয়ই সত্য। না হইলে আরও কত কত মানুষের মতো চোখের অদর্শনে বুল্‌কন্‌ও মনের অচেনা হইয়া উঠিত, জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়মে স্মৃতির পরিধি ছাড়িয়া বিস্মৃতির দিগন্ত-জোড়া শূন্যে গিয়া পড়িত বুল্‌কন্‌। কিন্তু তাহা হয় নাই।

বুল্‌কন্‌ পূর্বাপর আপনার কার্যবলে অমিতের মনের আশা-ঔৎসুক্যের ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে আপনার অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া গিয়াছে। কত হরতালে, আন্দোলনে, কত মিছিলে, ট্রাম-ইউনিয়নের কত উদ্যম-আয়োজনে বুল্‌কন্‌ স্বাভাবিক ভাবেই আগাইয়া আসিয়াছে। আর অমিতের কেন, এমন বহু দিকের বহু সুহৃদের নিকট পরিচিত-নামা পরিচিত-কর্ম বন্ধু হইয়া গিয়াছে। তবু অমিতের মনে পড়ে বুল্‌কন্‌কে প্রথম যখন সে দেখে সেই বৎসর দশেক পূর্বে তখনকার কথা।—তখনো স্বল্পভাষী বুল্‌কন্‌ তাহার মনে একটা না একটা দাগ করিয়াছিল···ট্রামের উর্দি পরিধানে, দীর্ঘ ঋজু, দৃঢ়গঠিত দেহ ; মুখে চোখে কপালে একটা স্বাস্থ্য-মার্জিত তেজ ; আর চোয়ালে চিবুকে একটা শক্তি,—দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাস। এ মানুষ বুদ্ধিমান না হউক চরিত্রবান।···হাঁ, চরিত্রবান। —কী সেই চরিত্র ? না, তাহা অমিত জানে না। বুল্‌কন্‌ স্ত্রী মদ্য মাংস তৈল অলাবু সম্পর্কে পাঁজির বিধি-নিষেধ মানিয়া কতটা সচ্চরিত্রতার আদর্শ রক্ষা করে অমিত জানে না। কিন্তু স্ত্রী মদ্য মাংস অলাবু প্রভৃতি ওই মহা-মূল্যবান

উপাদানগুলি সব সমমূল্যের নয়। মানুষের চরিত্র-গঠনেও স্ত্রী মদ্য মাংসের সম্পর্ক বড় কথা নয়—নিশ্চয়ই প্রধান কথাও নয়। প্রধান কথা কি তবে, অমিত? সুস্থ জীবন-বোধ আর সুস্থ জীবন-যাত্রা? অথবা, প্রথম সুস্থ জীবন-যাত্রা আর তারপর সুস্থ জীবন-বোধ—অথচ এ দেশের সমস্ত জীবন-দর্শনে কার্যত তাহা স্বীকৃত হয় নাই। যা-ই হোক, স্ত্রী-মাংস-অলাবুর ভোগ দিয়া নয়, ত্যাগ দিয়াও নয়, অন্তত ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিছুতেই নয় সচ্চরিত্রতা।......

সেদিন অমিত এত কথা ভাবিবার হেতু দেখে নাই। দেখিয়াছে কত জনের মতো বুল্‌কন্‌কে এক ঘর ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে একজন ট্রাম শ্রমিক। কিন্তু দেখিয়া মনে হইয়াছে, ইহার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। ...এমন কত জনকে দেখিয়াই অমিত ভুল করিয়াছে। কর্মক্ষেত্রের বিচারে তাহারা টিঁকে নাই—জীবন সকলকে ঝাড়াই-বাছাই করিয়া লয়—লইয়াছে যেমন ইন্দ্রাণীকে, অমিতকে। কিন্তু শ্রমিকের শ্রেণী-সংগ্রাম আরও কঠিন পরীক্ষা-ক্ষেত্র;—আরও কঠিন তাহার ঝাড়াই-বাছাই। কত জন কত দীর্ঘদিন টিঁকিয়াও আর শেষ পর্যন্ত টিঁকে নাই। কিংবা টিঁকিবে না। কারণ, চরিত্র যত দৃঢ় যত সুগঠিত হোক, তাহাও পরিবর্তনীয়। কী তাহার ফুটিবে, কী তাহার ঝরিবে, কী তাহার থাকিবে চিরকালের মতো, কেহ তাহা বলিতে পারে কি? কিছুটা হয়তো বুঝিতে পারা যায়,—কিন্তু সে আভাসও মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে জীবনের বিচারে,—অথবা নিজের আলস্যে, আর নিজের চাতুর্য-বিলাসে, আত্ম-প্রতারণায়। তবু বুঝা যায় যাহা তাহা সেই 'সম্ভাবনা'।...

সেই সম্ভাবনাই দেখিয়াছিল অমিত বুল্‌কনের মধ্যে।—উহার বেশী কিছু নয়। সে সম্ভাবনা ফুটিতেও পারিত, ঝরিয়া যাইতেও পারিত। কিন্তু ঝরিয়া গেল না। যুদ্ধের পর্বেই ট্রাম শ্রমিকেরা হঠাৎ একটা ধর্মঘটে নামিয়া পড়িল। জয় তাহাদের স্বীকৃত হইল—এই প্রথম জয় তাহাদের ইতিহাসে। তারপর, সপ্তাহ খানেক পরেই আসিল দ্বিতীয় ধর্মঘট।—dizzy with success. প্রথম জয়ের নেশায় মাথা উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল

কি? নিশ্চয়ই হইয়াছিল কতকটা। ইউনিয়নকে ভাঙিবার জন্য সেদিন 'ফুট' খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল কত রকমের লোক, কত রকমের 'দালাল, নেতা।

বুল্‌কন্ এই লড়াইতেও নামিয়াছিল উৎসাহে। হাঁ, ইয়াকুব কি অবধ-প্রসাদের মত তাহার দ্বিধা ছিল না একটুও। না হয় না হইয়াছে বিজয়ের ফল-সংগ্রহ, না হইয়াছে ইউনিয়নের শক্তি সংহত; তবু লড়াই করিতে ভয় কি? কিন্তু ভয়টা বুঝিল সে ক্রমে 'দালালদের' কাণ্ড দেখিয়া। ইউনিয়নকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা প্রত্যেকেই সাধারণ মজুরকে নিজ নিজ কাগুজে ইউনিয়নের মধ্যে টানিয়া আনিতে চাহিতেছে, মালিকদের গোপনে-গোপনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে তাহারা ট্রাম ইউনিয়নকে এইভাবে বানচাল করিবে। মালিকেরাও অবশ্য তাই এই 'দালাল নেতাদিগকে' খানিকটা আপস করিবার মতো স্থবিধা করিয়া দিবে। তারপর মালিকেরই স্বপক্ষে, মালিকেরই বেনামীতে চলিবে দালাল-গড়া সেই নতুন ইউনিয়ন। দেখিয়া শুনিয়া বুল্‌কনের নিকট অনেক বড় বড় বাবুর বড় বড় বুলি ও মতলব সাফ হইয়া গেল। সাফ হইয়া গেল ধর্ম-ঘটের পরীক্ষায় অনেক পলিটিকস্। বুল্‌কন্ বুঝিল—পথ সীধা, রাহা এক। দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ট্রাম মজদুর তাই যখন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে আবার দোদুল্যমান—তখন বুল্‌কনের মনে আর কোন দ্বিধা নাই। হিট্‌লার তখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে মজদুর-কিষাণের বিরুদ্ধে—অবধপ্রসাদ অনেক বিচার করিয়া মানিয়া লইয়াছে, হাঁ, এখন ধর্মঘট নয়, কংগ্রেস নেতারা বলিলেও নয়। কিন্তু মনে-মনে অবধপ্রসাদ গ্লানিবোধ করিয়াছে—মজদুরের এই যুদ্ধনীতিতে স্বাধীনতার একটা স্থযোগ হারাইতেছে দেশ—। হিন্দুস্থানের মজদুর হিন্দুস্থানের আজাদীর মওকা গ্রহণ করিল না। কিন্তু বুল্‌কন্ তাহা মানে নাই। ধর্মঘটের স্বপক্ষে সে বরাবর, কিন্তু এখন এই ধর্মঘটের উস্কানি দিতেছে কে? সেই দালাল নেতারা। না, মজদুর-কিষাণ রাষ্ট্রে যখন ফ্যাসিস্ত দুশমন হানা দিয়াছে সকল মজদুরের তখন লড়াই করিতে হইবে ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধেই,—লড়াই চালাইতে হইবে সেই মজুর-কিষাণ রাষ্ট্রের স্বপক্ষে।

সাফ্ এই বাত্—সীধী বাত্।

তখন অমিত সেই বুল্‌কন্‌কে দেখিল নতুন চক্ষে। কথা এখনো বলিতে শিখে নাই বুল্‌কন্, কিন্তু চলিতে শিখিয়াছে আরও মাথা উঁচু করিয়া, আর চলে স্থির পদে। ইউনিয়ন আপিসে যাহা-যাহা বলে, বলে আরও দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। তাহার নিকট কোনো কথা ঝাপসা নয়—ধর্মঘট না হউক, লড়াই তো করিতেই হইবে ব্রিটিশ শাহান্‌শাহীর বিরুদ্ধে। "ছিন্" লইতে হইবে 'জাতীয় সরকার।'—কংগ্রেস না পারে, মজুরেরাই তাহা করিবে।

বোমাবাজির ও আকালের দিন আসিল। একটার পর একটা প্রয়াসের মধ্য দিয়া সংগ্রামের চেতনা ও শ্রেণী-চেতনার ধার যেন কমিয়া আসিতেছিল···কাজের মধ্যেও যেন তখন কাজ পায় নাই বুল্‌কন্।

তারপর যুদ্ধ থামিল। সঙ্গে সঙ্গে বাধিয়া গেল বড় হরতাল। এক মুহূর্তে বুল্‌কনের শুষ্কপ্রায় তেজ যেন জীইয়া উঠিল। তখন খোঁজ রাখে নাই অমিত তাহার, রাখা হয়তো সহজসাধ্যও হইত না। ঝড়ের মত তখন পাড়া হইতে পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় বুল্‌কন্‌রা—অমিত দেখে ট্রাম-শূন্য পথ, এসপ্লানেডের ফাঁকা কেন্দ্র যেন খাঁ খাঁ করে। মরিচা পড়িতে শুরু করিল দেড় মাসে ট্রামের ঝক-ঝকে লাইনের উপর। তারপর বিজয়ী ট্রাম মজতুর বিজয়গৌরবে বাহির করে ট্রাম কলিকাতার পথে। যুদ্ধান্তের বিপ্লবী দিনের উদ্বোধন করিয়া দিল যেন ট্রামের মজতুর—বিপ্লবী আলোড়ন যখন পর্যন্ত আসিয়া লাগে নাই এদেশের আর-কোনো প্রতিষ্ঠানের চেতনায়। তারপর? ধর্মতলার হত্যা, রসিদ আলি দিনের বিদ্রোহী-অভিযান, উনত্রিশে জুলাইর শ্রমিক মহোৎসব—'বাহাদুর ট্রামকা মজতুর।' কলিকাতায় কেন, সারা ভারতবর্ষে তাহারা আপনাদের এই প্রশংসাধ্বনি শুনিয়াছে—'বাহাদুর ট্রামকা মজতুর।' ছেচল্লিশের আগস্টের হিন্দু-মুসলমান হত্যায় আত্মহত্যা করিল না তাহারা, কলিকাতার মজতুর শ্রেণী; মরিল না তাহারা দেশ-বিভাগের ঝড়েও। মরিতে বসিয়াছিল বরং পরে নিজেদের দ্বিধায় সঙ্কোচে,—'দালালদের' সেই প্রথম দিন হইতে নির্মমভাবে ধ্বংস না করিয়া। ইউনিয়নের 'গলতি' হইয়াছে

সেখানে—কংগ্রেস আর সোশ্যালিস্টদের দালালও গুণ্ডাদের প্রথমাবধিই কেন দূর করে নাই ট্রাম-এলেকা হইতে? তাহা করে নাই অবশ্য হেড আপিসের বাবু-মেম্বর আর ট্রাফিকের বিহারী-হিন্দুস্থানী মেম্বরদের জন্য। উহারা বাবু জয়প্রকাশ বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নাম জপিয়া উদ্ধার পাইতে চায়। কিন্তু এই 'বাবুদের' ভয়ে মজদুর ইউনিয়নও হাত গুটাইয়া থাকিল কেন? 'হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী', ও-সওয়াল তুলিলেই হইল? লীগও তো তুলিত মজহবের সওয়াল? তেমনি এভি বিলকুল ঝুটা—এই 'প্রান্তিক সওয়াল' 'হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালী'।

কাহেঁ?—

কাহেঁ কি,—বুল্‌কন্‌ আপনার ভাষায় বলিতে থাকিত,—মজদুর কী কোই মুলুক নেহি হ্যায়—বিনা এক মুলুক,—হামারা সোভিয়েট-দেশ। 'আর যাঁহা মেরা কাম বঁহা মেরা ধাম। হাম বাঙ্গাল কা মজদুর হ্যাঁয়—ইউ-পী.কা কিষাণ, ইয়া লোহার নেহি হ্যাঁয়। হামি বাঙ্গালী আছি।—মনে পড়িতেই আপনার বাঙালীত্বের দাবি বুল্‌কন্‌ নিজস্ব বাঙলায় তৎক্ষণাৎ পেশ করিতে লাগিল।—হামি বাঙ্গালী আছি—বাঙলা বুলি বলি, বাঙলায় কাজ করি—

হাসিয়া উঠিত কমরেডরা অমনি বুলকনের কথায়। বুলকন্‌ও হাসিত, বুঝিতে পারে অনেকখানি সদিচ্ছা রহিয়াছে অন্যদের হাসিতে। বলিষ্ঠ মুখের দৃঢ় পেশীতে তাই একটি স্নিগ্ধ আভা দেখা দিত—চোখে আসিত একটি শিশুর সলজ্জতা।

বাঙালী বাবুরা বলিত,—কমরেড বুল্‌কন্‌, কেয়া, ঘরমে বলোগে ই বাত?

বেসক্।—পরক্ষণেই বুল্‌কন্‌ বাঙলায় জানায়,—বলেছি, হামি ঠিক বলেছি—হামি বঙ্গাল দেশে থাকি, বঙ্গাল ভাষা বলি, বঙ্গাল পার্টির মেম্বর,—হামি বঙ্গালী নহি তো কি?

এবার [illegible] হাসিতে বন্ধুরা বলে, কিন্তু ঘরের লোকেরা কি জবাব দেয় বুল্‌কন্‌?—[illegible] বাঙলা ভাষা শুনে।

লজ্জিত শিশুর হাসি পরিণত হয় যুবকের লজ্জায়, আর সকল দেহে জাগে কোমলতা। ঘরের লোকের কথা বলিতে এখনো লজ্জিত বোধ করে বুল্‌কন্‌। হাসিয়াই বলে, হামার ছোটভাই বলে:—'হামরা ভি আউধের আদমি, আবধী বলি, হিন্দুস্তানী পড়ি, হামরা তাই ইউ-পীর হিন্দুস্তানী আছি।

হাসিয়া উঠে সকলে। কিন্তু উহারা হাসিলেও উপহাস মনে করে না বুল্‌কন্‌। বলে, সাচ্চী বাত!—ঠিক কথা। ওরা ক্ষেতি করে, গ্রামে থাকে, আজমগড়ের কৃষক লড়াইতে সামিল হয় ওরা; ওরা হিন্দুস্থানী ছাড়া কি হইবে?

যাহারা কিষাণ তাহাদের ঘর আছে, দেশ আছে; যাহারা মজদুর তাহাদের ঘর নাই, দেশ নাই—বুল্‌কনের ইহা সহজ যুক্তি। অতএব বুল্‌কন্‌ বাঙলার মানুষ; আর তাহার বাড়ির লোকেরা ইউ-পীর হিন্দুস্থানী। বুল্‌কন্‌ যদি দেশে ফিরিয়া যায়?—যাইবে কি? না, সে যাইবে না। সে এখানকার মজদুর আন্দোলনের মধ্যে আপনাকে চিনিয়াছে, সে ঘরে ফিরিয়া গিয়া কিষাণী করিতে পারিবে না—তাহার ভাইয়ের মতো; লোহারের কাজও করিতে পারিবে না—আত্মীয়-কুটুম্বদের মতো। তবু যদি কোনোদিন ফিরিতে হয় ইউ-পী'তে, ফিরিবে।—মজুরের দেশ নাই। সেখানকার মজদুর আন্দোলনে যোগদান করিবে, কানপুরের মজদুর আন্দোলনে গিয়া জুটিবে—ইউসুফ যেখানে নেতা, মজদুর পার্টির কাজে লাগিবে, লড়াই চালাইবে, বস, মজদুর আপনা লড়াই হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

অতি অল্প হইলেও অমিত বুল্‌কনের এই সব কথা শুনিয়াছে। শুনিয়া হাসিয়াছে, আবার ভুলিয়াও গিয়াছে। একটা কথাই শুধু বুল্‌কন্‌ জানে—মজদুর লড়াই না করিলে মজদুর থাকে না; মজদুর মজদুর ছাড়া আর কিছু নয়, আর কিছু পরিচয় তাহার নাই।

সেক্‌শনের সংগঠক হিসাবে বুল্‌কন্‌ কাল আজিতে ট্রাম-[illegible] মেস্‌ হইতে খাইয়া আসিয়া ঘুমাইতেছিল পার্টির এই দক্ষিণ পাড়ার আপিসে—

আপিস থাকে তাহার জিম্বায়। রাত্রি শেষ না হইতেই দুয়ারে ধাক্কা পড়িল। দুয়ার খুলিয়া বুল্‌কন্ দেখে পুলিস। তখন বুঝিতেই পারে নাই কি ব্যাপার। এখানে আসিয়া ক্রমশ বুঝিল—বড় রকমেরই একটা হামলা চালাইতেছে মালিকী সরকার। দেখিয়া কিন্তু সে আশ্বস্ত হইয়াছে—ট্রাম শ্রমিক আর কেহই গ্রেপ্তার হয় নাই। বুল্‌কন্ উৎসাহিত হইয়াছে—'বাহাদুর ট্রামের মজদুর'। এবারও ঠকাইতে পারে নাই শত্রুরা তাহাদের।

বুল্‌কনের মনে এখন আপসোস জাগিতেছে—সে কেন পালাইতে পারিল না! একা সে, ট্রামের একটিমাত্র মজদুর, না জানিয়া ধরা পড়িয়া গেল; না হইলে ট্রামের মান আরও কত বাড়িয়া যাইত। প্রথম তাই মোতাহেরের নিকট বসিয়া বসিয়া নিজের লজ্জায় অনুশোচনা জানাইয়াছে বুল্‌কন্। মাস্টার সাহেবের নিকট জানাইয়াছে তাহার মনের বেদনা ও আপসোস—শুধু একজন লোকের জন্য ট্রামের বাহাদুর শ্রমিকেরা বলিতে পারিল না তাহারা সকলেই শত্রুকে ফাঁকি দিয়াছে। মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে—ট্রাম শ্রমিকের মধ্যে কে-কে এখন ভালো কাজ করিতে পারিবে। মোতাহেরের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছে কি করিয়া তাহাদের ইউনিয়নকে জীয়াইয়া রাখা যায়। কিন্তু মোতাহের সেই প্রসঙ্গ এখন ভাবিতে চাহে না। তাহার ভাবনা—কি হইল আয়রন স্টীলে? কি হইল চটকলের ইউনিয়নের? নানা লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল মোতাহের। তপনবাবু দেশবাসীর কথা ভাবিতেছে—হাসপাতালে যারা তাহাদের কি হইবে। দেখাই যাক না, সত্যই সকলকে ধরিয়া রাখে কিনা। খাবার খাইবার পর ফাঁক পাইয়া তপন এখন নিজেও জুটিয়া গিয়াছে এই তাস খেলায়। আর ইংরেজি-না-জানা বুল্‌কন্ তাই বাধ্য হইয়া এখন একা বসিয়া আছে। খেলায় মোতাহের বা সৈয়দ-আলীর উৎসাহ দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে। নিজে নিজেই বলিতেছে, 'ই ঠিক নেহি হ্যায়।'

ইহারা তবে কি করিবে?—অমিত তাহার নিকটে আগাইয়া বসে, জিজ্ঞাসা করে। বুল্‌কন্‌ও টান হইয়া বসে—কেন করিবার মত কি কাজ নাই?

দুশমন্ তো তাহার আক্রমণ পুরাপুরি আরম্ভ করিয়াছে, আর আমাদেরই করিবার কিছু নাই? স্রেফ্ তাস খেলিব? তপনবাবু পর্যন্ত তাস খেলিতেছে—

তপনের তাস খেলাই প্রয়োজন—গৌরীর ভাবনা তাহার মাথায় ভার হইয়া আছে।

অমিত বলিল, করবার নাই কে বলে? বরং করবার কাজ দশগুণ ছেড়ে শতগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এখানে বসে এখন আমরা কি করব?

পুছিয়ে,—বলিয়াই বুল্‌কন্ আবার বাঙলায় শুরু করিল, সে বাঙলার মজদুর যে,—সবাইকে পুছুন।—কে কোথায় ধরা পড়িল, কি ভাবে ধরা পড়িল, কার সঙ্গে ধরা পড়িল, কি কি ফেলিয়া আসিল বাড়ি। কোথায় কি কাগজপত্র ছিল; পুলিস কি কাগজপত্র পাইল,—মাস্টার সাহেব ছাড়া এক-জন কমরেডও বুল্‌কন্‌কে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে নাই। এই সব তথ্য সংগ্রহ করা উচিত। অমিত কর্মসূত্রে মজুরদের তত পরিচিত নয়। বেশ, অমিত সকলকে না জানুক, মোতাহের আছে। সৈয়দ আলী আছেন। কাহাকে সে না চিনে? 'দেশলক্ষ্মীর' এ অবস্থা—তপনবাবু করিতেছেন কি? সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই; কেহ সিগারেট পিতেছে, কেহ পান খাওয়াইতেছে। কিন্তু এইটা কি পান-সিগারেট খাইবার জায়গা, না, এই তাহার সময়?

অমিত বলিল, পরেও জানতে পাবেন, কমরেড্ বুল্‌কন্। হয়তো সকলকেই লালবাজারের হাজতে কিংবা আলীপুরের জেলে পাঠাবে।

ক্যায়সে জানতা হ্যঁায়?

অমিত অনুমান করিয়া বলিতেছে। কর্মচারীরা বলিল—এখনো ঠিক হয় নাই কিছু। কর্তারা ক্যাবিনেট মিটিং করিয়া ভাবিতেছে। ভাবিবে আর কি? ধরিবার পূর্বে বুঝি ভাবিবার সময় হয় নাই। ব্যবস্থা ভাবিতেও সেক্রেটারিয়েটের ও ক্যাবিনেটের কম সময় লাগিবার কথা নয়। অন্তত, একটা পুরা 'লাঞ্চ' উদরস্থ না করিলে মাথা ঠাণ্ডা হইবে না।

আউর হামরা লিয়ে ইধার পানি ভি নেহি মিল্‌তা হ্যায়?—ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল বুল্‌কন্। আমাদের জন্য এক গ্লাস জলও হবে না।

অমিত জানিত, তাই বলিল, ওদের আপিস আজ বন্ধ। তাই কিছু নেই, না হলে এখানে একটা কর্মচারীদের 'টিফিন'-ঘর আছে সেখানে চা ও জল পাওয়া যেত।

ছুটি আছে তো সে হামার কি? গিরিফতার করবার সময় তো ছুটি থাকে না। কেবল হামার রুটি-পানির বেলা ছুটি থাকে।—এইবার বুল্‌কন্ চটিয়াছে।

এই বুল্‌কন্‌কেও অমিত দেখিয়াছে,—অবশ্য অল্পই দেখিয়াছে। ভোটের দিনে যখন লাঠি ও ডাণ্ডার প্রহারে কমরেডরা আহত হইয়া ফিরিতেছিল, বুল্‌কন্ তখন অধৈর্য হইয়া উঠিতেছিল—গুণ্ডাশাহীর সঙ্গে মোকাবিলা না করিলে কিসের মজদুর তাহারা? কিন্তু 'মোকাবিলার' অনুমোদন সে তবু পায় নাই। তখন আপিসের বারান্দায় বাহির হইয়া গিয়া সে ক্ষুব্ধ নিম্ন স্বরে বার বার বলিয়াছে—'বাহা রে হুকুম। জিতনী অহিংসা উহী হামারা হাসিল করনা;—আর জিতনী গুণ্ডাবাজি উ মালককা জাহির করনা।' চোখে তাহার আগুনের ছটা; মাংসপেশী ক্রোধে ঘৃণায় কুঞ্চিত; রাগে গরগর করিতেছে। সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেও পারে না, কিন্তু সংযম হারাইয়া ফেলিবার মতো আত্মবিস্মৃতিও তাহার নাই। ঘরের এক কোণে বসিয়া তখনো অমিত হাসিতে চেষ্টা করিতেছিল—এই অসঙ্গতিই বুঝি জীবজন্মের কৌতুক—মুখে যাহাদের অহিংসার বুলি তাহাদেরই কার্যত শরণ গুলি!

অমিত বুল্‌কন্‌কে খানিকটা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই হাসিয়া একবার বলিতে গেল, তবু তো রুটি-পানি এখন মিলিয়াছে, কমরেড। সেদিনে ক্রান্তিবাদীদের এই এলিসিয়াম রোতে রুটি-পানি মিলা তো দূরের কথা, মিলিত অশ্রাব্য গালাগালি, ঘুসি, লাথি, ব্যাটারি শক।—

বুল্‌কন্ আরও ক্রুদ্ধ হইল, তা-ই এখনো সইতে হবে? মজদুর শ্রেণীরও কি এই 'খেয়াল'? এই রায়?

অমিত বুঝিল আর হাসিয়া উড়াইবার পথ নাই। তাই যথাসম্ভব স্থিরভাবে অমিত বলিল, তা নয়, কমরেড। বিশ শাল পরে আমরা এসেছি। জনতার শক্তি আজ অনেক বেশি। সাধ্য কি তা করে? তবে আপনারা শুনতে চাইছিলেন পুরানো দিনের অবস্থা, তাই একটা কথা বললাম।

বুল্‌কন্ শান্ত হইল।—ঠিক বাত! কমরেড অমিদাদা। আবার ঐসা হোবে, যদি হাঁমরা এখন থেকে লড়াই না করি। দেখো না, হল্লা করাতে খাবার আনলে। কিন্তু আমরা চুপ করলে চার চারটে পুরী আর ওই ঐসা বসগোল্লা দিয়ে পালিয়ে গেল। আর তারপর কিনা, হামরা বহিন ভী ওই রাস্তার কল থেকে পানি পিয়ে আসবেন—ইজ্জত থাকবে এইসা চললে?

ঐ নাম করে ওরা একটু ঘরের বাইরে বেরুতে পারল—রাস্তা দেখল, ওদের ভালোই লাগল।

সে মানছি হামি, কিন্তু গেলাস মিলবে না, পিয়ালা মিলবে না,—কাঁহে?

তালাবন্ধ রয়েছে যে ঘরে।

তবে তোড়ো তালা। বাহার করো কপাট ভেঙে গেলাস পেয়ালা—আবার সজোরে বলিল বুল্‌কন্।

পরিষ্কার বুল্‌কন্-এর সমাধান। তালা যদি বন্ধ থাকে ভাঙ তালা; কিন্তু গেলাস চাই, জল খাইতে হইবে। মজুরের স্পষ্ট, স্বচ্ছ, সরল সমাধান। ইহাই কি ঠিক সমাধান সেই সামান্য সমস্যাটার? না, ইহা হঠকারিতা?

অমিতের দ্বিধা বুল্‌কন্ বুঝিল। মুখের হাসিতে তাহা গোপন করা হয় নাই, হয়তো সকৌতুক সম্মতিতেও তাহা গোপন করা চলিত না বুল্‌কনের নিকট। কারণ কথা ও হাসির পিছনে মন ও মত দেখিবার মতো দৃষ্টি বুল্‌কন্ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে পাইয়াছে। নিশ্চয়ই 'অমি দাদার' কাছে তাহার কথাটা ঠিক মনে হয় নাই,—তিনি তাই কথাটাকে হালকা করিতে চাহিবেন।

বুল্‌কন্ শান্ত স্বরে তাই জিজ্ঞাসা করিল: কেয়া, ভুল বাত হোলো? . . .

অমিত নিজের বুদ্ধি সামলাইয়া লইতেছিল।—ভুল বাত নয়, কমরেড বুল্‌কন্‌। গেলাস, জল, সব চাই ; চুপ করে থাকাও উচিত নয়। কিন্তু কথা হল কোথায় কতদূর যাব ? এটা থানা,—থানারও বেশি, গোয়েন্দা আপিসের সদর দপ্তর। এখানে আমরা ওদের কবলের মধ্যে। এখানে ওদের শক্তি বেশি, আমাদের শক্তি কম ;—একটু থামিল অমিত। বুল্‌কনের দৃষ্টিতে প্রতিবাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। অমিত বুঝল, বলিল : কি ? একি ঠিক কথা নয় ?

ই ঠিক নেহি হ্যায়,—বুল্‌কন্‌ বেশ দৃঢ় স্বরে বলিল। তারপরে বন্ধুর মত অমিতকে বুঝাইতে লাগিল,—কাঁহে কি—হাম ষাট, চৌষট আদমি আছি,—ঠিক। উলোক বেশি আছে ; পাহারা খাড়া হ্যায়,—উস লোগংকো হাত মে বন্দুক হ্যায়—ই বিলকুল ঠিক। তব ভি এক বাত খেয়াল রাখনা। নিজের ভাষায় আরম্ভ করিল বুলকন্‌—পহিলে, দুনিয়াভর আজ মজদুরকী শক্তি জ্যায়দা হ্যায়।—বঙ্গালমে ভি হাম বঙ্গালকা মজদুর কমজোর নেহি। দোসরা জিত্‌না জোশসে হামরা লড়াই করব, উতনী জল্‌দি হামরাভি শক্তি বাড়বে। তিসরা,—জ্বলিয়া উঠিল বুল্‌কনের চোখ ঘৃণায়, অবজ্ঞায়,—কুত্তা হ্যায় ই-লোক-ডাণ্ডা দেখলাও, তবে মানেগা! আর আখিরী,—বুক চিতায় আপনারই অজ্ঞাতে বুল্‌কন্‌,—হাম কমিউনিস্‌ট্‌ হ্যায়, না ? হো থানা, হো জেলখানা,—হো মিটিংকা ময়দান ইয়া হো মালিককা কারখানা,—হাম কমিউনিস্‌ট খেয়ালসে-হি চলেঙ্গে, ডাট রহেঙ্গে, আউর লড়াই করেঙ্গে।

সপ্রশংস দৃষ্টিতে অমিত তাকাইয়া রহিল। যুক্তিতে কোথাও অস্পষ্টতা নাই। কিন্তু এই যুক্তি কি অমিত জানিত না ? না, মানিত না ? জানে মানে। কিন্তু তাই বলিয়া মানিতে পারে কি—এইখানে এখনি একটা মারা মারি শুরু করিয়া দিতে হইবে ? তাহা কি যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত ? না, উন্মত্ততা

কেয়া, ঠিক নেহি হ্যায় ?—জিজ্ঞাসা করিল সহাস্যমুখে বুল্‌কন্‌।

অমিত বলিল, বিলকুল ঠিক। কমিউনিস্টকা লিয়ে হর জায়গা লড়াইকা ময়দান। সহি হ্যায় ই বাত।

সহি হ্যায় ?—উৎফুল্ল মুখে বুল্‌কন্‌, তারপর বলিল—তব ?

তব—দোসরা দোসরা জায়গামে দোসরা দোসরা কায়দা হ্যায় লড়াইকা ইভি খেয়াল কীজিয়ে। রুশকা হজারও গাঁও আর ক্ষেতি ছোড় দিয়া লালফৌজ, পিছু হট গিয়া—কাঁহে, ক্যায়দাসে স্ট্যালিনগ্রাদমে খতম করেগা দুশমনকো।

বুল্‌কন্‌ এবার খুশী মনে বলিল : ঠিক। লিকিন সবসে পহলে কাম হ্যায়—লড়াইকা খেয়াল। আর ওই খেয়ালসে-হি ফিন্‌ কায়দাকা খেয়াল ঢুঁড়না। দেখিয়ে—দুশমন্‌ দের নেহি কিয়া।—আবার বাঙলায় আরম্ভ করিল বুল্‌কন্‌,—হামার আগেই হামার উপর হামলা করছে সে। এখন বাগড়োর হামার হাতমে নিতে হোবে—দের করা চলবে না। রক্‌ষা নেহি, পালটা আক্রমণ চালাতে হবে।—

অমিতের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই বুল্‌কনের মতে আসল কথা লড়াই—এই আসল কথাটা সে কোনো দিনই ভোলে নাই। অথচ লড়াইএর কায়দা সম্বন্ধে তাহাদের সুনিশ্চিত জ্ঞান নাই। লড়াই শুধু সাহসের কাজ নয়। অনেক বেশি ধৈর্যের কাজ। তাই কেহ কেহ মুশড়াইয়া গিয়াছে, কেহ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে, আর কেহ বুল্‌কনের মতো সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এই সত্যেই আসিয়াপৌছাইয়াছে,—লড়াই-ই শ্রমিক শ্রেণীর সত্য। কিন্তু অবস্থাটা বুল্‌কন্‌ তত ভাবিতে চাহে না, শিক্ষাও আমরা তাহাদের দিই নাই—

অমিত বলিল : ঠিক কমরেড, কিন্তু প্রথম ভ্যাখো পরিস্থিতির কথা—হালত কি ? তারপর জঙ্গ ও ট্যাকটিকসের কথা, অর্থাৎ কোন্‌ জায়গায় কোন্‌ কৌশল খাটবে, তা ভেবেছেন ?

এবার সন্তুষ্ট হইল বুল্‌কন্‌, শোচিয়ে। উ কম্‌রেড আপনারা ঠিক করবেন। তাই তো হামি বলছি। তা না আপনারা তাস খেলছেন। কি এখন কোরতে হোবে বলুন। আবভি হরতাল হোনা চাই আজ ;—ট্রামমে, রেলমে, পোর্ট ট্রাস্টমে, ডক্‌মে, লোহাকলমে, চটকলমে, হর কারখানামে, অফিসমে, কলেজ-ইস্কুলমে—হরতাল আব্‌ভি হোনা চাহি। আওর ইধর থানা ইয়া জেলখানামে হামরা ভি ঐসব শোর মচানা চাহি। ই হ্যায় আসলি বাত—

…'লা' দাস, লা' দাস তুজুর্ লা' দাস'—'হানো, হানো, হানো বরাবর,'—ফরাসী বিপ্লবের সেই আশ্চর্য মন্ত্রই কি বুল্‌কন্ জাহির করিতেছে। কোথায় সে তাহা শিখিল?

সতের শ' উননব্বুই নাই; আঠার শ আটচল্লিশও নাই।—না; আঠার শ একাত্তরও নাই—আজ উনিশ শ আটচল্লিশ!

যুগ,—যুগই যুগের মানুষকে জন্ম দিতেছে।

অমিত বলিল: কিন্তু আজ হরতাল করতে পারবে কি এখন কলকাতার মজদুরেরা? দেখেছেন আপনাদের ট্রামে কত ভাঙন ধরেছে।

বুল্‌কনের আলোচনা অন্য খাতে চলিল: সেই তো হামি বলেছি। গলতি হয়েছে আমাদের দু শাল ধরে। উ সাচ্চা 'দেশভক্‌ত্', 'ই আচ্ছা সোশ্যালিস্ট' এসব বলে বলে যত বদমায়েস আর বে-ইমানকে সুবিধা করে দিয়েছি। পহিলা থেকে উদেরকে মার দিয়ে ঠাণ্ডা করলে আজ উ-লোগ কি ট্রামে 'ফুট' ধরাতে পারত? হেড্ আফিসের 'বাবুরা' ইউনিয়ন থেকে ভাগত। দুচার মজদুরও ইধর-উধর ঘুরত। কিন্তু ট্রাম মজদুর আপনা দিমাক আর আপনা ইমান সাফ্ রাখতে পারত—লড়াই মে সব ভাই সামিল হোত। হোবে—এখনো হোবে। লিকেন লড়াই চাহি—উ কৌশিশ বরাবর কোরতে হবে।

'লড়াই, লড়াই, লড়াই'—বুলকন্ ইহাই বুঝিয়াছে। কিন্তু কত ক্ষেত্র কত রূপে যে এই মানুষের যাত্রা পতন-অভ্যুদয়ে অগ্রসর হয় তাহা বুল্‌কনেরা বুঝিবে না। তবু ইহারাই যুগের মানুষ—'ওরা কাজ করে'—আর এ যুগে ইহারাই সচেতন হইয়া লইবে সেই কাজের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব। এই বুল্‌কন্…ও কানাই হাজরা, রশীদ ও পার্বতী। আর কাহারা? তপন ও শ্যামল, অণু ও মঞ্জু, বিজয় ও দিলীপ, বিত্তহীন এই বুদ্ধিজীবীরাও নিশ্চয়ই। এই আগামী দিনের মানুষ গঠনই এ দিনের তাহাদের কাজ। লড়াই গৌণ, মানুষই আসল কথা।

একজন গোয়েন্দা কর্মচারীকে দেখিতে পাইয়া মঞ্জু ও ছেলেরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল—আধ ঘণ্টার কথা বলিয়া তাহাদের বাড়ি হইতে আনা হইয়াছে, ব্যবহার্য জিনিসপত্র কাপড়চোপড় সঙ্গে পর্যন্ত গ্রহণ করিতে দেওয়া

হয় নাই। এখন এ কি কাণ্ড? কাপড়চোপড় আনাইবার শীঘ্র ব্যবস্থা করুক। বেশ তো এখান হইতে ফোন করুক, বাড়ির কেহ দিয়া যাইবে।—গোয়েন্দা অফিসার ভয়ে ভদ্রতায় জানাইতেছে, আপনাদের কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে। তবে ব্যবহার্য জিনিসের জন্য নামঠিকানা আপনারা লিখে দিন—আমি সাহেবকে দিচ্ছি। তিনি ব্যবস্থা করবেন, বলেছেন।

নামঠিকানা লেখা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা বুঝিয়া শুঝিয়া লেখা উচিত; গোয়েন্দা আপিস এই নামঠিকানা লইয়া কাহার কি করিবে কে জানে? আর সত্যই লিখিয়া কিছু লাভ আছে কি? ইহারা কোনো কালে সত্য কথা বলে?

আপনার এখানে কি আছে, হাজরাদা?

আপনার কি আছে, কমরেড্ বুল্‌কন্?

ছিল সব, কিন্তু তাহা আপিস-ঘরে পুলিশ সীল করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

অমিত জিজ্ঞাসা করে, আপনার লোক কেউ নেই আর?

'আপনার লোক?' সে তো আপ্‌লোগ।

অমিত হাসিল। বলিল: বস্! শুধু আমরা? ঘরে কেউ নেই?

ঘর? সে ত পান শ মিল দূর হ্যায়···

কোথায়? কোন্ জিলা? কোন্ গ্রাম?

আজমগড়ের গ্রাম কালাইটিকি, শহর হইতে বেশি দূর নয়। হাঁ, বেশি বড় গ্রাম নয়, একেবারে ছোটও নয়।···ইউ-পী-র একখানা অপরিচিত গ্রামের ছবি দেখিতে থাকে অমিত।···তারপর জিজ্ঞাসা করে বাড়িতে কে কে আছে? কত টাকা পাঠাইতে হইত এইখান হইতে? এখন কি করিয়া চলিবে বুল্‌কনের পরিবার—স্ত্রী ও পুত্রকন্যার?

বুল্‌কনের কথা প্রথম একটু কুণ্ঠামিশ্রিত ছিল। তারপরে আসিল একটু চিন্তার ছায়া। তারপর কথা চলিল: কষ্ট হোবে উহাদের। ছেলেটাকে পড়াইতেছে বুল্‌কন্ শহরতলীর ইস্কুলে। বরাবর পড়াইবে। মেয়েটি ছোট— তাহাকেও পড়াইবে! পড়াশুনার বয়স হইতেছে তাহারও, কিন্তু তাহাকে

শহরে পড়াইতে পাঠানো এখন সম্ভব নয়। উহার মাও ছাড়িতে চাহে না, বুঝিবে না। আইমা আছেন, বুল্‌কনের মা; তিনি আরও শুনিবেন না। পুরানা জমানার লোক তাঁহারা। এই রকমই তাঁহাদের খেয়াল। আজকার ছুনিয়ার কিছু তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। বুল্‌কনের ছোট ভাইই বুঝিতে পারে না। একজন লোহারের কাজ করে, আর একজন কিসানী। কিন্তু বুল্‌কন মজছুর। সে জানে জমানা বুঝা চাই, ছুনিয়া দেখা চাই। কিন্তু কিছু লেখাপড়া না শিখিলে ছুনিয়া আজ সমঝিয়া ওঠা সহজ নয়। বুল্‌কন্‌ই তাহ' পারে না। হিন্দীতে বাঙলাতে লেনিনের কথার অনুবাদ না হইলে সে-ও কিছুই জানিতে পারে না। তবু তো সে কমিউনিস্ট, ইউনিয়ন করে, দশজন কমরেডের সঙ্গে সে কথা বলে, তাহাদের কথা শোনে—কত সুবিধা তাহার। কিন্তু কি করিবে তাহার ছেলে ভবিষ্যতে? নয় বৎসর তাহার বয়স। কিংবা বুল্‌কনের মেয়ে—পাঁচ বৎসর তাহার বয়স; তাহারা করিবে কি? বুল্‌কন্‌ তাহাদের ইস্কুলে পড়াইবে। যতটা পারে তাহারা ততটা শিখিবে। হাঁ, কাজ তাহারাও করিবে; মজুরের মেয়ে মজুরের আন্দোলনের কাজ করিবে—ইস্কুলে পড়িলেই বা কি? কিন্তু এখনো তাহারা ইস্কুলে পড়িতেছে না। ছেলে-মেয়েকে আনিয়া এখানকার ইস্কুলে পড়িতে না দিলে তাহা সম্ভব হইবে না। এইখানেই বুল্‌কন্‌ সেরূপ ব্যবস্থা করিবে, ঠিক করিয়াছিল। স্থির করিয়াছিল ছুইমাস পরে ঘরে যাইবে, ঘরের লোকদের কলিকাতায় আনিবে। চেতলা, কি টালিগঞ্জে কমরেডদের বলিতেছে একটা ঘর ঠিক করিতে। ঘর ভাড়া এখন কোথাও পাওয়া যায় না। তবু বুল্‌কনের তাহা পাইতে হইবে। কারণ, ছেলে-মেয়েদের পড়াইতে হইবে। বাঙলার মজুরের ছেলে-মেয়ে বাঙলায় পড়িবে না, তবে কি ইউ-পীর গাঁওতে কিসানী করিবে? কিন্তু এখন তাহারা কি করিবে? ছেলে-মেয়ের খরচপত্র কি করিয়া চালাইবে? ঘরে গোরু আছে, ছুধ দেয়। খেতির কাজও করিতে পারিত তাহার স্ত্রী। না করিলে এখন চলিবে না। কিন্তু কাজ সে করিবে কি করিয়া? অসুখেই সে পড়িয়া থাকে। অসুখের চিকিৎসা ঠিকমতো করা হয় নাই—গ্রামে বৈদ্য-

ওঝায় মিলিয়া গোলমাল পাকাইতেছে। পাখুরী হইতে পারে। কিন্তু বুল্‌কন্‌ শহরে আনিয়া চিকিৎসা না করাইলে কিছু স্থির বুঝিতে পারিতেছে না। এখন আর তাহা কবে হইবে কে জানে ?...উহার কষ্ট হইবে, খুব ভুগিতেছে গত দুই তিন মাস যাবৎ।...বোধ হয় আর ভালো হইবে না—দেরি হইয়া গেল। হাঁ, এবার মরিয়াও যাইতে পারে ...কে জানে কি হইবে ?...

মুখের চিন্তার ছায়ার সঙ্গে গলায় মমতা-ভরা দরদের স্বর লাগিয়াছে।—দৃঢ়দেহ, সবল, তেজীয়ান সেই মজদুর সৈনিকের আড়াল হইতে কথা বলিতেছে এই কে ? সেই চিরদিনের মানুষ—মমতায় দুর্বল, স্নেহে জীবন্ত, আর জীবন-বৈচিত্র্যে পরমাশ্চর্য সত্য।

এই মানুষই কি সবার উপরে সত্য ?—সর্বাপেক্ষা জীবন্ত সত্য ? না বড় সত্য সে, সকল মানুষের এই স্বচ্ছন্দ বিকাশকে সম্ভবপর করিবার জন্য যে মজদুর—উগ্র, লড়াকু মজদুর,—'বাহাদুর মজদুর'—তাহার আহ্বান জানাইতেছে—

'লা' দাস, লা' দাস, তুঝুর, লা' দাস।'

'সম্ভাবনা' কি এইরূপেই সত্য হইয়া উঠিবে ? প্রেমহীন হইলে শ্রেণী সংগ্রামেও মানুষ কি মানুষ হইতে পারে ?

ছয়

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী'।

সবিতা দেবী? সবিতা! অমিত কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। এখানে কি করিয়া আসিবে সবিতা? গোয়েন্দা কর্মচারী ভাবিল অমিত কথাটা বুঝিতে পারে নাই। তাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিল, বিজয়বাবুর মাসীমা তিনি। আপনাদেরও আত্মীয়া। ফোন পেয়ে বিজয়বাবুর জিনিসপত্র পৌছে দিতে এসেছিলেন; আপনার সঙ্গেও সাক্ষাতের অনুমতি হয়েছে।

খানিকক্ষণ আগে বিজয়ের ডাক পড়িয়াছিল—বাড়ি হইতে তাহার মা তাহার জিনিসপত্র পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছেন। বন্ধুদের বিজয় বলিয়াছে, মা নয়,—বিজয়ের মা জীবিত নেই,—মাসীমা। বন্ধুরা বলিয়াছে, খাবার নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়। আমাদের জন্য নিয়ে আসিস। কিম্বা,—আমাদের বাড়িতে খবর দিতে বলিস—কাপড়-চোপড় দিয়ে যায় যেন।

বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জু দুয়ার পর্যন্ত চলিল, বলিল, মাসীকে বোলো, বিজয়, বাড়ি থেকে আমাদের শাড়ি-ব্লাউজ দিয়ে যেতে।

বন্ধুরা কে বলিয়াছে, শুধু শাড়ি-ব্লাউজ মঞ্জু? পাউডার, স্নো, ভ্যানিটি কেস্?

নিশ্চয়ই। আরও দু-চার ঘণ্টা থাকতে হলে ওসব চাই বৈ কি। তোমাদের ছেলেদের না হয় 'গেজাতে' পারলেই হল—স্নান সাবান কিছুই চাই না।—বলিয়া মঞ্জু আবার আসিয়া তাহার পূর্বেকার জায়গাটিতে বসিয়াছে।

ততক্ষণে বিজয় চলিয়া গিয়াছে। কলরব থামিয়া যায়। যুবকদের ছোট সেই দলটি আবার নিজেদের কথা লইয়া জমিয়া উঠিয়াছে। কথা অপেক্ষা তাহাতে মঞ্জুর প্রতিবাদ ও দিলীপের তর্কই বেশি। কানাই হাজরার সহিত

কথা বলিতে বলিতে অমিত তাহার কথাতেই জমিয়া গিয়াছিল। অনেকদিনের পরিচিত তাহার এই চব্বিশ পরগনা, উহার মাঠ-ঘাট, গ্রাম জলা আর 'লাট'। তখন কয়জন ছিল সেখানে কর্মী। আর আজ সেখানে কানাই হাজরার মতো মানুষেরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহারাও অমিতকে এখনো ছাড়িতে চাহে না—অবশ্য কলিকাতায় দোকানপত্র, প্রকাশনের কাজ অমিতের এখন প্রধান কার্যক্ষেত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে কানাই হাজরারা ছাড়িবে কেন? 'আপনারা হলেন আমাদের গুরু। গুরু-মন্ত্র কানে গেল, তবে না উদ্ধারের পথ হয়?'

অমিত হাসিতে থাকে।—এখনো 'গুরু', 'গুরুমন্ত্র' ওসব কথা ছাড়লেন না, হাজরাদা'?

ও আমরা চাষীরা বলব। আপনারা বলেন কমরেড লেনিন, কমরেড স্তালিন। আমরাও নিজেদের বলি 'কমরেড'। কিন্তু ওঁরা হলেন মহাগুরু। আমরা তো ওনাদের মন্ত্র পেলাম আপনাদের মুখেই। আপনারাই কি আমাদের ছাড়তে পারেন—গুরুই কি ছাড়তে পারে শিষ্যদের?

সত্যই ছাড়িতে পারে না। অমিতও হাজরাদাদের ছাড়িতে পারে না। —অনেক দূরে আজ তাহার কর্মক্ষেত্র! দেহ ও স্বাস্থ্যের দায়ে অমিত ক্রমশ এই নিয়মিত জীবনযাত্রা ও ধারাবাহিক কাজকর্ম মানিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব পরিচয়ের ফলে এই বই প্রকাশের ও বিক্রয়ের কাজ গ্রহণ করিয়াছে। এখনো তবু কলিকাতার কোনো মজুর ইউনিয়নের কাজে যোগ দেয়। এই 'দেশলক্ষ্মী হরতালে' বেশ জড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজ অনেক দিন অমিত হাজরাদাদের দেশে পদার্পণও করে নাই। এইখানে তাহার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তথাপি অমিত আজ বুঝিতেছে তাহার জীবনের নানাদিকগামী শিকড় সেই জলা আর বাদা, ভেড়ি আর কলা-বাগানের মধ্যেকার এই মানুষদের জীবনের মধ্য হইতেও অমিতের জন্য প্রাণরস আহরণ করিয়া আনিয়াছে। অমিতের সত্তার মধ্যে উহা আনিয়া দিয়াছে মাটি-জল, কাদামাখা বাঙলা দেশের মানুষের প্রাণস্পর্শ, মানুষের কথা। সেই শ্রমজীবিক চেতনা,

সে জীবনের অক্লান্ত শ্রমপরায়ণতা, সর্বস্বান্ত, ও সর্ব-পীড়ন-অত্যাচার-জর্জরিত কৃষক-প্রাণের আত্মপরিত্রাণের নবজাত প্রতিজ্ঞা। গুরু কি পারে শিষ্যদের ছাড়িতে ?—তাহাদের মধ্যেই গুরুর জীবনের সার্থকতা। অমিতই কি পারে ভুলিতে হাজরাদের ? তাহাদের মধ্যে অমিত আপনাকে পাইয়াছে আর, তাহাদের জীবনে জীবন মিশাইয়া—আপনার সীমাবদ্ধ-সত্তার ঘূর্ণীস্রোত হইতে আপনাকে টানিয়া তুলিয়া—জন-সমুদ্রের জোয়ারে আবার আপনাকে মিলাইয়া দিতে পারিয়াছে।

সেই সীমাবদ্ধ সত্তার মধ্যে একদা তুমি আপন সীমাবদ্ধ স্মৃতি-চেতনা-আবেগে আলোড়িত ছিলে, অমিত।—বুল্‌কন্‌রা, রশীদরা, কানাই হাজরারা তোমাকে কি আর থাকিতে দিল সেখানে !···

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন সবিতা দেবী,'—প্রবহমান স্রোতের মধ্য হইতে হঠাৎ যেন অমিতের চেতনা জাগিয়া উঠিয়া একটা পুরাতন ঘাট আবার ছুঁইল।

অমিত উঠিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিল 'আপনাদের আত্মীয়া'—সবিতা? সবিতা কে হয় তাহার ? 'আত্মীয়া'—এই কথা কি অমিত জানিত ? কিন্তু বিজয়ের মাসী সবিতা, এই কথাও তো অমিত জানিত না। অবশ্য জানিবার কথাও ইহা নয়। বিজয় কলিকাতা-বাসী নয়। এলাহাবাদ না কোথায় বাহিরে পড়িত। অমিতের সহিত তাহার পরিচয়ও ঘনিষ্ঠ হয় নাই। অমিত শুনিয়াছিল রশীদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের সময় বিজয় ফটো তুলিয়া বেড়াইতেছিল ; পুলিশের গুলি লাগে তখন বিজয়ের হাতে-পায়ে—কলেজের পড়া তখন শেষ করিয়া সে নাকি বিলাত যাইবার অপেক্ষায় ছিল। তারপর হাত ভাঙিল, পা একখানা গেল, শুধু মানুষটা অটুট স্বাস্থ্যের জোরে টিঁকিয়া আছে। ফটো তোলা ছাড়িয়া বিজয় কবিতা লিখিতে শুরু করিল—তখন সে হাসপাতালে [illegible] ছাত্ররাজ্যে তাহার হকি খেলার প্রতিভা ছিল স্বীকৃত। অমিত তাহাকে তাই দুইচারবার দেখিয়াছে—কখনো সংবাদ-পত্রের আপিসে, কোনো শিল্পী-সভায় কিংবা সাহিত্যবৈঠকে। স্থির

প্রকৃতির, আত্মপ্রকাশ-কুণ্ঠিত, আত্ম-সচেতন যুবক :—আপনার দৈহিক দুর্বিপাক যেন উহাকে সচেতন ও সংকুচিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অপরিচিত গোষ্ঠীতে সে থাকে অপ্রকাশিত। অমিতের নিকটও সে এতদিনে সহজ হইতে পারে নাই।

কিন্তু সবিতা বিজয়ের মাসী নাকি? অমিতের সঙ্গেও সে দেখা করিবে। কিন্তু দেখা করিবার মতো এখানে ব্যবস্থা করিতে পারিল কিরূপে। ঔৎসুক্য আগ্রহ চিন্তা এক সঙ্গে অমিতের মনে দোলা দিতেছিল। গোয়েন্দা আপিসের সাক্ষাতের একটা ছোট ঘরে পৌছিতেই অমিতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—হাঁ, সবিতাই তো। বিজয় তাহার পার্শ্বে বসিয়া! টেবিলের অন্য দিকে আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক উপবিষ্ট—পাহারা-নিযুক্ত গোয়েন্দা কর্মচারী নিঃসন্দেহ।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। অভ্যাসমতো মর্যাদা দেখাইতে অমিদাকে? কিন্তু একি, সবিতা কাঁদিতেছিল নাকি? অন্তত চোখের পাতা এখনো যে কেমন ভারী হইয়া আছে—অমিতের জন্য? পাগল নাকি তুমি, অমিত?···

···যৌবনের প্রান্তে আসিয়া গিয়াছে কি সবিতা? ব্রজেন্দ্র রায়ের সেই কিশোরী কন্যা—অমিতের সঙ্গে এককালে যাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল।

সুমুখী, সুন্দরী, আদরপালিতা সেই সবিতা যেন ঝরিয়া পড়িয়া যাইতেছে। যাইতেছে কেন, গিয়াছেই বলো না, অমিত! মায়া হয় বলিতে? হয়; না হওয়াই আশ্চর্য। কাহাকে দেখিতে না মায়া হয়—যখন যৌবনের বরমাল্য গলায় শুকাইয়া আসে? দেহের তটে-তটে নামে ভাঁটার টান? মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক, যৌবন জীবনের তপস্যা। বিশেষ করিয়া মেয়ে-জীবনের। আর এ তো সবিতা।—সুগৌর দেহেও বুঝি আর ঔজ্জ্বল্য থাকে না। চোখের স্থির জ্যোতির উপর পড়-পড় বেদনার ছায়া। চুলের শ্যাম-গুচ্ছ আসিয়াছে ক্রমে হালকা হইয়া। আর [illegible], কপোলের তটে, কপালের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটি একটি কুঞ্চিয়া কালোরেখা পড়িতেছে। অর্থাৎ চল্লিশ।—চল্লিশ হইবে কি, সবিতা? না, অত না। চল্লিশ না হইলেও

পঁয়ত্রিশের প্রতিকূলে। সেই সুডৌল বাহু, সেই সুন্দর নিঁখুত চিবুক—মিলাইয়া যাইতেছে? না, প্রায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিংবা মিলাইয়া দিয়াছে বলাই ঠিক। সত্যই সবিতা তাহা নিজে মিলাইয়া দিয়াছে।…প্রথম যৌবনের বৈধব্যেই আপনার রূপকে অস্বীকারের ঝোঁক সবিতার প্রাণে জাগে। তখনো আমরা জেলে, তাহা দেখি নাই কিন্তু পরে তাহাকে প্রথম দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারি। তারপর আপনার সেই আত্মসংযমের গভীর সংকল্পকে সে সুদৃঢ় করিয়া তোলে। আহারে বিহারে, বেশভূষায়—এমনকি, গতিতে, কথায়, রুচিতে,—সকল রকমে হিন্দু বিধবা, শান্তশীলা শুদ্ধসত্ত্বা মেয়ে। ভারতীয় প্রাচীন-সভ্যতার পরিশীলনে সে হইতে চাহিল আরও দৃঢ়চিত্ত, নিয়ম-নিষ্ঠ, আদর্শবাদী মানুষ। না, না, মানুষ নয়—মানুষ হইতে পারিল কই সবিতা? আপনার আদর্শের তাড়নায়, এদেশের হিন্দু ঐতিহ্যের তাগিদে সবিতা মানুষ হইতে পারে নাই,—মানুষ হইতে সে চাহেও নাই।…একেবারেই কি তাহা চাহে নাই?—হাঁ, চাহিয়াছে। কিন্তু চাহিয়াছে আপনার অগোচরে আর আপনার অনিচ্ছায়…। আর, জানোই তো, সবিতা, জীবনেরে কে রোধিতে পারে?

রোধ করা যখন যায় না, অমিত তখন দেখিয়াছে—সবিতার বহুকুণ্ঠিত জীবন যে-কল্পনার মধ্যে দিয়া তখন প্রকাশের পথ করিয়া লইল। তাহাতে সবিতার জীবন আরও জটিল গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িল। আপনারই অগোচরে যে সরল মীমাংসায় আসিয়া সবিতা ঠেকিতেছিল তাহাও সবিতা জানিতে চাহিল না। শেষে যখন জানিল তখন আরও তাহা মানিতে চাহিল না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! একদিন অমিতের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল—আরও অনেকখানেই সেইরূপ কথা হইয়াছিল নিশ্চয়। কিন্তু অমিতের কথাটা তথাপি মনে আছে, যেহেতু অমিত ছিল তাহার পিতা ব্রজেন্দ্র রায়ের স্নেহভাজন বন্ধুপুত্র [illegible] যেহেতু অমিত ছিল দীর্ঘ কয় বৎসর জেলে বন্দী; তাহার [illegible] ছিল ব্রজেন্দ্র রায়ের [illegible] স্নেহ ভাবনা। তাই অকাল বৈধব্যের নিরাশ্রয় দিনে সবিতার কল্পনা ব্রজেন্দ্র রায়ের শুভাকাঙ্ক্ষার সূত্র আশ্রয় করিল,

—যেমন করিল—যেমন করিয়াছিল—অমিতের কল্পনাও দূর বন্দিনিবাসে সবিতাকে আশ্রয়। কল্পনার সে তাগিদেই কিন্তু আসলে সবিতার জীবন স্থির সুস্থ সহজ হইতে পারিয়াছিল—অমিতের ভাই মনুকে আশ্রয় করিয়া। মনু তাহার সতীর্থ বন্ধু তখন ; প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র দুইজনায়। জীবনের ছলনা সবিতার তখন চোখে পড়ে নাই, মনুরও চোখে পড়ে নাই। গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে এক মুহূর্তেই অমিতের তাহা চোখে পড়িয়া গেল। আর তারপর সে সত্য যখন উহাদের সম্মুখে অমিতা তুলিয়া ধরিল—এতবড় বিড়ম্বনা বুঝি মানুষের জীবনে আর ঘটে না। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! সবিতা মরিয়া যায় আপনার মনেই। তাহার মন জুড়িয়া বসিয়াছে অমিদাও নয়—মনু। মনু—তাহার অপেক্ষাও বয়সে যে মনু দুই-এক বৎসরের ছোট! অকুণ্ঠিত চিত্তে যাহাকে সে আপনার সুহৃদ করিয়া লইয়াছে—আর সেই সূত্রে নাকি আপনার করিয়া ফেলিয়াছে।—না, না, না।

জীবন যত বলিল, 'সবিতা স্বীকার করো, স্বীকার করো', সবিতা ততই জোরে অস্বীকার করিল, 'না, না, না'।

মনু কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গেল। সবিতাও অমিতদের নিকট হইতে আপনাকে দূরে সরাইয়া লইল। কিন্তু ব্রজেন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পরে আবার তাহাদের দেখা হইল। সবিতা বুঝিয়াছে—দূর কখনো দুস্তর হইতে পারে না। এই মাস বৎসর কাহাকেও দূর করিতে পারে নাই—মনুকেও না, সবিতাকেও না। সবিতা অমিতের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মসংগ্রামে সে ক্ষত-বিক্ষত, তবু সে অপরাজিতা। অমিদা—তাহার স্বর্গীয় পিতার স্নেহভাজন বন্ধু,—সবিতার কথা সে-ই বুঝিবে : জীবনে শুধু একটা পথেই মানুষকে সার্থক হইতে হইবে—গৃহ সংসার লইয়া, জীবনের এ কি জবরদস্তি? সহস্র তাহার পথ, আর কত বিরাট মানুষের জীবন, কত মহৎ সাধনা মানুষের। অমিতই এই মর্মের কথা ব্রজেন্দ্র রায়ের কাছে বলিত। সেই মহ[illegible]া সবিতা গ্রহণ করিবে —'বহুজনহিতায় চ বহুজন সুখায় চ'। তা[illegible]তো ভারতবর্ষের সা[illegible] ; উহাই তাহার পিতার চিরদিনকার প্রয়াস, আর তাহার আপন নিয়তির ইঙ্গি[illegible]।

অমিত বলিল মহতের সাধনা কোথায়? তুমি যা চাও, তাকে বরং মহাত্মা-জা।-র আরাধনা বলো, সবিতা

সবিতা বলিল, হাঁ, তাই। মহতের সাধক বলেই তো তিনি মহাত্মাজী।

অমিত বুঝিল সবিতা সত্যকে গ্রহণ করিতে চাহে না; কল্পনাই তাহার প্রয়োজন। একটা কল্পনা যদি ভাঙিয়া গিয়া থাকে সে বরং গ্রহণ করিবে অন্য একটা কল্পনা। কিন্তু গ্রহণ করিতে পারিবে না বাস্তব সত্যকে, জীবনকে। অমিত সবিতাকে কথাটা বুঝাইতে চাহিল, কিন্তু সবিতা বুঝিতে চাহিল না। বুঝিল না।

বুঝিবে না। হয়তো মনোবিজ্ঞানও মিথ্যা বলে না—সবিতা বুঝিবে না। তাহার আপনারই ভিতরে না-বুঝিবার স্বপক্ষে অনেক-অনেক বাধা জমা হইয়া আছে। তাই সে ছলনা ও কল্পনাকে চাহিবে, জীবনের বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিবে। চাহিবে ফ্যাণ্টাসি—চাহিবে না রিয়ালিটি। কিন্তু সেই বাধা কী? এদেশের বৈধব্যের সাধারণ সংস্কার! কোথায় কবে মরিয়াছে সেই প্রায়-অপরিচিত এক যুবক—বিবাহান্তেই যে ডাক্তারি পড়িতে বিলাত গিয়াছিল,—তথাপি সেই মন্ত্রপড়া সম্পর্কই সবিতার জীবনকে সত্যের সম্মুখীন হইবার সমস্ত শক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া দিয়াছে।···অবশ্য শুধু সেই কল্পনা নয়, মাত্র সে যুবকটিও নয়। সেই সঙ্গে আছে এদেশের জীবন-বঞ্চনার ঐতিহ্য, স্বাভাবিক প্রাণধর্মের বিরুদ্ধে ভারতের সমস্ত শাস্ত্রকারের ও সংহিতাকারের নির্বোধ ধিক্কার; আত্মসংযমের নামে কুৎসিত আত্মনিগ্রহ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহেই যাঁহারা দেখিয়াছেন পরম পুরুষার্থ···যাঁহারা পরস্ত্রীমাত্রকেই 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতে শেখান, আর দশ হাজার বৎসর তপস্যার পরে তপোবনের সুদূর প্রান্তে কোনো রমণীর পদার্পণমাত্র 'মদনজ্বালায়' আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়েন! মধ্যযুগের অচল জীবন-যাত্রার উপর আবার কলোনির পঙ্কিল পল্বল চাপিয়া পড়িয়াছে। এ দেশের জীবন হইতে জীর্ণ সংস্কারের এই অভিশাপ কবে মুছিয়া যাইবে? কবে আবার তাহার মেয়েরা, পুরুষেরা সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী হইবে?···কিন্তু এ দেশেই বা কেন, কোথায়ই

বা জীবন আজ সুস্থ সবল স্বাভাবিক—এই বিকারগ্রস্ত পৃথিবীতে? এখানে ফিউডাল সমাজের বিকৃত পাপ-বোধ, সেখানে বুর্জোয়া-সমাজের বিকৃত যৌন-বোধ—মানুষের জীবনে কোথায় সুস্থ সবল স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অবকাশ রহিয়াছে? মানুষ কিরূপে আজ মানুষ হইবে? Man is not Man as yet.

সবিতাকে অমিত আর বিশেষ বুঝাইতে চেষ্টা করে নাই। অমিত জানে সুস্থ সবল প্রাণময় জীবনযাত্রা এই দেশেও আসিবে; আসিবে পৃথিবীতে। আসিবে কেন? আসিয়াছে, তাহা অমিত জানে। ততক্ষণ —পৃথিবীতে না হউক—এদেশে সবিতারা আত্মছলনায় যদি শান্তি পায় পাক। কে তাহাদের রক্ষা করিতে পারে এই আত্মাঘাত হইতে?—একমাত্র মানুষের মূল্যবোধ, মানব-মহাযান।

মেয়ে-কলেজের চাকরি ছাড়িয়া বিনা-বেতনে বিধবাশ্রমের ইস্কুল পরিচালনা, হরিজন সেবা, অনাথাশ্রম পর্যবেক্ষণ, চরকা প্রচার, 'গ্রামোদ্যোগ', কংগ্রেসী মহিলাসংঘ, বুনিয়াদি শিক্ষা ও শেষে কস্তুরবা সমিতির স্বেচ্ছা-শিক্ষার্থিনী, শরণার্থিনী শিবিরের অবৈতনিক পরিদর্শিকারূপে সবিতা আপন রূপযৌবনকে এতদিনে প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ' তাহার জীবন; ইহাই ভারতের মহাযান।

দিন কয়েক পূর্বে সবিতা অমিতের খোঁজে আসিয়া বসিয়া ছিল; অমিতকে পায় নাই, অমুর ও সাধুর সঙ্গেই বসিয়া বসিয়া কথা বলিয়াছে। কাল অমিত সবিতাকে দেখিয়াছে একটা ত্বরিতগামী বাসে। কিন্তু ভালো করিয়া তখন তাহাকে দেখিবার সুযোগও হয় নাই। আজ সকালে তাহার কথাই তথাপি মনে পড়িয়াছে—হয়তো কালই ইন্দ্রাণীকে দেখায়। এখানে সবিতাকে দেখিয়া অমিতের এখন হঠাৎ মনে হইল—তাহাকে বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন, বড় বিষণ্ণ দেখাইতেছে। আপনার রূপযৌবন সবিতা প্রায় ক্ষয় করিয়া আনিয়াছে। কিংবা হয়তো ইহা তেমন কিছু নয়—চৈত্রের দ্বিপ্রহরে পথে বাহির হইয়াছিল—আদরপালিতা ভদ্রকন্যা,—সে তো অনু নয়, না, মঞ্জুও নয়,—তাই বুঝি এতটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে!

তুমি বিজয়ের মাসী, সবিতা ?—অমিত বসিতে বসিতে জিজ্ঞাসা করিল।
—দ্যাখো তো, জানতামই না আমি। বিজয় ভবানীপুরের দিকে থাকে জানি ; কিন্তু কি করে জানব—সে তোমার বোন-পো !

জানবার কথা নয়, দিদি মারা গিয়েছেন। বিজুও কলকাতায় থাকত না।
—সবিতা স্বাভাবিক নম্রতার সঙ্গে বলিল।

সে তো বুঝলাম। কিন্তু আমরা তো থাকতাম, তোমরাও থাকো। আর অমুর সঙ্গেও তোমার দেখা হয়—অন্তত সেদিনও দেখা হয়েছে। তোমাদের সেবা-মণ্ডলের মহিলাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা তো ছিল তাদের নিত্যকর্ম।
—কিন্তু কই তুমিও তাকে বিজয়ের কথা বলোনি, আর বিজয়ও আমাকে তোমার কথা বলেনি।

বিজয় লজ্জিতভাবে বলিল, আমি জানতাম, বলিনি।

বিজয় থামিল, কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিল। তারপর আবার বলিল, ভাবলাম আপনারা তো জানেনেই। তবু যখন কিছু বলছেন না, তখন না বললেই বা কি ?

অমিত, মনু ও সবিতাকে জড়াইয়া একটা জটিল সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, বিজয়ও তাহা জানে। তাহাতেই কি এই কুণ্ঠা ? না, বিজয়ের এই কুণ্ঠা তাহার আপনার মর্যাদাবোধ ? তাহার আপন পরিচয়েই সে পরিচিত হইবে।

অমিত হাসিয়া বলিল, কি আর ? না বললে বলা হয় না ; জানা-শুনাও হয়তো হয় না ! থাক, কিন্তু তুমি এখানে এলে কি করে, সবিতা ? সাক্ষাতের অনুমতি পেলে কার সাহায্যে ?

দীর্ঘ কাহিনী। সবিতা সম্পূর্ণ বলিল না। অমিত জানে বলিবে না। কিন্তু সবিতা যাহা বলে না, তাহা অনুমান করিবার মতো, বুঝিবার মতো চেতনা ও অভিজ্ঞতা অমিতের আছে। এতটুকু সে সবিতাকে চিনে—চিনে এই বাঙলা দেশকে,—সবিতা না বলিলেও অমিত বুঝিল সবিতার কাজ ও কথা।

ভোর না হইতেই পুলিশ বিজয়কেও আজ গ্রেপ্তার করিতে আসে

সবিতাদের বাড়িতে। বিজয় যে এখনো গুরুতর কিছু করে, তাহা তাহার মামা জানিতেন না। কবিতা লেখে, শিক্ষানবিশ সাংবাদিক হিসাবে কমিউনিস্টদের কাগজে লেখে, কাজ করে, 'সোভিয়েট-সুহৃদ' রূপে এখানে-ওখানে ঘোরে। কিন্তু কি যে পুলিশের রিপোর্ট তাহা কে বুঝিবে? সকাল না হইতে পুলিশ সেই বাড়িতে হানা দিল। শেষে বলিল, বিজয়কে একটু থানায় যাইতে হইবে।

'একবার আধ ঘণ্টার জন্য—।' না?—হাসিয়া অমিত যোগ করিল।

বিজয় হাসিয়া বলিল, না, আমাকে বলেছিল 'ঘণ্টাখানেকের জন্য।'

অমিত হাসিয়া বলিল, লোকটা গাল খাবে। আধঘণ্টা বলাই হল রুল্‌। কি বলেন, তাই না?—অমিত উপস্থিত গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্টরটির উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিল। লোকটা কেমন ওত পাতিয়া বসিয়া আছে! এই লোকটার অস্তিত্বও সবিতা বা বিজয় যেন বিস্মৃত না হয়, আসলে সেই উদ্দেশ্যেই অমিত তাহার দিকে তাকাইয়া এই প্রশ্নটা করিল।

ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইল। বলিল: আমি জানি না। আমি দপ্তরের ভারে; ছুটির দিনেও চার্জে রয়েছি। আপনাদের কথাবার্তার সময় বসতে বলছেন কর্তৃপক্ষ, তাই বসে আছি।

তাহার কথায় শুধু লজ্জা নয় কোথা দিয়া একটা ক্ষোভ ও নিরুপায়তা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

অমিত সবিতাকে বলিল, তোমরাও বোধহয় বুঝতে পার নি, 'ঘণ্টা-খানেকের' অর্থ কি?

সবিতা কি করিয়া বুঝিবে? এক ঘণ্টার পরিবর্তে দুই ঘণ্টা গেল। নটা বাজে। তবু বিজয় আসে না। 'তখন আমরা বাড়িতে বসে থাকতে পারলাম না।'

অমিত জানে এই 'আমরা' মানে সবিতাই, তাহার দাদা নয়। তিনি ভারতের স্বাধীনতা-লাভে চাকরি-জগতে বেশি উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। বিলিতী কোম্পানির এখন টনক নড়িয়াছে—ভারতীয় চাকরেদের পদমর্যাদা

দিতে হয়। শোষণ-স্বার্থ যখন সুরক্ষিত তখন ভারতীয়দেরও দিতে হয় মুষ্টিভিক্ষা। তাই কভিনেন্‌টেড চাকরিতে এখন মিস্টার রায় সুস্থির। পুলিশের গোলমালে তিনি মাথা দিতে পারেন না। তাহা ছাড়া, ন'টা বাজে যে, আপিসের টাইম হইয়া যাইতেছে মিস্টার রায়ের। ড্রাইভার এখনো গাড়ি বাহির করে নাই কেন? তিনি সে ব্যাপারের কারণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ড্রাইভারদেরও যেন এখন স্বাধীনতা—আসুক না আসুক, কিছুই বলিবার জো নাই।

বাড়ির অন্যান্য সকলেরই এইরূপ নানারকম বাধা আছে। কোন্ পরিবারে কাহার এত উদ্বৃত্ত সময় ও বিনামূল্যে কাজের দায়িত্ব আছে?—উহা বিধবা ভগ্নীর, কিংবা আশ্রিত-অনুগত ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্রদেরই কর্তব্য। অতএব—

সবিতা ভবানীপুর থানায় গেল। হাঁ, একাই গেল, বাড়ির নিকটেই তো।

অমিত অবশ্য জানে—ইস্কুলে কলেজে পড়া ভাইপোদের এই উদ্দেশ্যে সঙ্গে গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাদের পিতামাতা বাধা দিতেন। সবিতা নিজেও তাহাদের কাহাকেও গ্রহণ করা উচিত মনে করে নাই—পাছে তাহাদের ক্ষতি হয়।

থানার লোক প্রথমে কিছুতেই সবিতাকে বলে না। পরে একজন বলিল, 'আরে উনি কংগ্রেস সেবিকা।' তখন তাড়াতাড়ি বলিল, বিজয় সেখানে নাই, তাহাকে সেখানে আনাই হয় নাই। তাহারাই তখন গোপন পরামর্শ দিল—সবিতা লর্ড সিংহ রোডে খোঁজ করুক। সবিতা বাড়ি ফিরিল—লর্ড সিংহ রোডে ফোন করিবে। 'দেখি, সাধু বসে আছে দুয়ারে'—আর বলিল না সবিতা, চক্ষুতে তাহার অর্থসূচক দৃষ্টি। অর্থাৎ, সে জানিয়াছে অমিতের কথা, জানিয়াছে তাহার গৃহের খবর, অসুর ও শ্যামলের বিপদের কথাও।

দৃষ্টির বিনিময় হইল। অমিতের সস্নেহ দৃষ্টি বলিতে ত্রুটি করিল না—

সবিতা, অমিত তোমাকে চিনিতে ভুল করে নাই। তাহার সেই সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি স্বীকারও করিল,—সবিতা, অমিতের প্রত্যাশার অপেক্ষাও বেশি তুমি তৎপর, সচেতন, কৌশলী। অমিতের মমতাভরা দৃষ্টি মানিয়া লইল—সবিতা, তুমি অমিতদের আত্মীয়া।

সবিতার দাদা আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ফোনে লর্ড সিংহ রোড হইতে কিছু জবাব পাওয়া গেল না। শুধু কে বলিল, 'অফিসাররা এলে আবার ফোন করবেন—বারোটায়।'—দাদা চলিয়া গেলেন, কিন্তু দুশ্চিন্তা লইয়া গেলেন—বিজয়ের কি হইল কে জানে। তখন দশটা, সাধু বিশ্রাম করিবে। সবিতাও অন্য কাজে কিছুক্ষণ ব্যস্ত হইয়া রহিল—অর্থাৎ অমুর ও শ্যামলের সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য তাহাদের বন্ধুদের বাড়ি ছুটিল। 'নানা গোলমাল সবখানে—যেমন করেই হোক তবু নাগল পাব ছোট'র।' অতি সহজে অথচ অতি সাবধান সংকেতে সবিতা অমুর নাম বলিয়া যায়। অমিত সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক কি করিতেছে? হয়তো অত্যধিক চতুর লোক,—শুনিয়া যাইতেছে। কিছুই ভাব-ভঙ্গিতে ব্যক্ত হইবে না। কিন্তু, অমিত, তুমি ইতিপূর্বে বুঝিতে কি এতটা চাতুর্য, এতটা কুণ্ঠাহীনতা সবিতার সাধ্য?—অমিতের চক্ষুতে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল। সেই সদা-সংকুচিত সবিতা কেমন করিয়া প্রয়োজনের দায়ে আপন অভ্যাস ও ধারণাকে কাটাইয়া উঠিতেছে, আশ্চর্য নয় কি? তোমার সম্মুখেও সে আজ আর সদা-ভীতা, অস্বচ্ছন্দ মানুষটি নাই, অমিত। আর পুলিশের সম্মুখে সহজ ছলনা গ্রহণেও কুণ্ঠিতা নয় এই সবিতা—কোনো কারণে, কাহাকেও ছলনা করা যে মনে করিত অন্যায়,—আর নিজেকে ছলনা করাই ছিল যাহার নিয়ম, প্রয়োজন। সেকি সত্যই তবে বুঝিতেছে—কোথায় ছলনা অন্যায়, ছলনা কোথায় প্রয়োজন?...সে কি তবে মানিবে আত্মছলনায়ও কোনো কল্যাণ নাই? সে অমিতদের আত্মীয়া, মন্নুর সুহৃদ।

বারোটায় এই আপিসে ফোন করিয়াও সবিতার পক্ষে কোনো লাভ

হইল না। কে একজন কর্মচারী বলিলেন, কেহ কেহ লর্ড সিংহ রোডে আসিয়াছে বটে, কিন্তু কে কে তাহা বলা এখনো সম্ভব নয়। নামের তালিকা তৈয়ারি হইতেছে; সবিতা বরং পরে আবার তাহা জানিতে চেষ্টা করিতে পারেন। কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা হইলে বলিবেন।

সবিতা হতাশ হইল, প্রায় নিরুপায় হইল। একটা সংবাদও পাইবে না বিজয়ের?—সামান্য চা খাইয়াও যায় নাই বিজয়। একজন কংগ্রেস এম-এল-এ'র নিকটে যাইতে পারিত সবিতা। গান্ধীবাদী কুমুদ সরকার; —দাদাও তাঁহাকেই ধরিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সবিতা গম্ভীর হইল। মুখে বলিল, না। কারণ কংগ্রেসে তাহারা পরাজিতের দলে—গান্ধীবাদীরা কি করিবে? কুমুদ সরকার মন্ত্রীদের কাহাকেও হয়তো ফোন করিতেন, কিন্তু লাভ হইত না। মারোয়াড়ী ধনকুবেররা এখন আর খাদিপন্থী সেই দলের উপর ভরসা রাখে না।—খোদ মন্ত্রীবাদীদের সঙ্গেই ব্যবসায়ীদের কারবার। তাই মন্ত্রীদের নিকট কুমুদ সরকারদের কোনো প্রয়োজন প্রতিষ্ঠা এখন আর নাই। কুমুদ সরকার যে সত্যই কিছু করিতে পারিবে না, তাহা সবিতা জানে। তাহা ছাড়াও কুমুদ সরকারের সম্পর্কে সবিতা আর যাইবে না।

মিসেস সেন-চৌধুরীর কাছেই বরং গেলাম—সবিতা বলিল।

মিসেস সেন-চৌধুরী!—অমিতের কণ্ঠ হইতে সবিস্মিত উক্তি বাহির হইল।

হাঁ, মিসেস সেন-চৌধুরী! জানেন তাঁকে? আগেই একটা এন্‌গেজমেণ্টও ছিল। দিল্লী থেকে তিনি শরণার্থী-অধ্যক্ষতার ভার পেয়েছেন—। তাই আমাদের রিফিউজী ক্যাম্প চালনার বিষয়ে শুনবার জন্ম আমাকে আগেই ডাকিয়েছিলেন। কালই তিনি এসেছেন দিল্লী থেকে—জানেন বোধ হয়।

অমিত জানে।—না জানিয়া কাহার উপায় আছে? বাঙলা দেশে বাঁচিবে, সংবাদপত্র পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-চৌধুরী দিল্লী হইতে শরণার্থি-সেবার বিশেষ ভার লাভ করিয়া কলিকাতা ফিরিতেছেন? অবশ্যই ফিরিতেছেন তিনি দিল্লী হইতে এয়ার লাইনে। কারণ, তাঁহার সময় নাই,—

সময় নাই তাঁহার। আবার এখনি চলিয়াছেন পণ্ডিত নেহরু ও আচার্য কৃপা-লনীর নিকট রিফিউজী প্রোবলেম সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব বিবরণ পেশ করিবার জন্য—সিমলাতে। হাঁ, এয়ার লাইনেই কলিকাতা হইতেও চলিয়াছেন ;—তাঁহার সময় নাই।—কাহারও না জানিয়া উপায় আছে, তিনি দিল্লী হইতে ফিরিয়া—হাঁ, এয়ার লাইনে ফিরিয়া—কারণ, তাঁহার সময় একটুও নাই—তাঁহার বিবৃতিতে কালই কত অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন পূর্ব বাঙলার লোকদের ও দেশ-ত্যাগী-পূর্ববঙ্গবাসীদের ? সাধ্য কি, সংবাদপত্র পড়িবে, অথচ জানিবে না মিসেস সেন-চৌধুরী পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য আবার যাইতেছেন সিমলা ? হাঁ, এয়ার লাইনেই যাইতেছেন,—তাঁহার একটুও সময় নাই। না জানিয়া পারিবে কি তিনি কবে গিয়াছেন 'কুরুক্ষেত্র-ক্যাম্পে'—সেখানকার ব্যবস্থা বিষয়ে সাজেশ্‌শ্যান দিবার জন্য ?—অবশ্য ভিতরের খবর জানিলে জানিতে, সেই সাজেশ্‌শ্যান তাঁহাকে দিতে হইয়াছে সুকৌশলে। সুকৌশলে—কারণ, সেখানকার অধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষারা অ-বাঙালী, কংগ্রেসের 'হাই কম্যাণ্ডের' স্বপংক্তির মানুষ ; নয়াদিল্লীর দরবারের আশে-পাশে তাঁহাদের আত্মীয়বন্ধুর অভাব নাই। মিসেস্ সেন-চৌধুরীর কোনো কথা বলিবার অধিকার আছে কি সেখানে ? সাহসই বা কি ? হাঁ, মিসেস্ সেন-চৌধুরীর অধিকার ও সাহসের কথা ভাবিতে হয় সেখানে। কথা তিনি বলেন—কিন্তু তাহা বলিতে হয় সুকৌশলে।

অবশ্য মূলত সাহসের প্রশ্ন নয়, অধিকারের প্রশ্নও নয়। মিসেস সেন-চৌধুরী তাহা জানেন। উহার কোনোটারই অভাব তাঁহার নাই। 'সোসাইটিতে' তাঁহার আসন সুদৃঢ়। দুইপুরুষের বিলিতী কৌলিন্য তাঁহার। একালেই না হয় বিবাহ করিয়াছেন এক পুরুষের বিলাত-ফেরত আই-সি-এস্ মিস্টার সেন-চৌধুরীকে। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতেও মিসেস সেন-চৌধুরী কি ভারতবর্ষেই অদ্বিতীয়া নন ?—সিনিয়র ক্যামব্রিজের পরে তিনি লণ্ডনে পড়িয়াছেন সোশ্যাল সায়েন্স ; আর দুই দুইবার ট্রাভল করিয়াছেন কন্‌টিনেণ্ট, দেখিয়াছেন ল্যুভ, স্পোর্টস্‌প্ল্যাস্টে

শেষবার সেখানে হিটলারের বক্তৃতা শুনিয়াছেন, রোমে মুসোলিনির প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, রাস্তার পথ হইতেও ফিরিয়া আসিয়াছেন—মিস্টার সেন-চৌধুরীর জন্যই তাঁহার সেখানে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হইত না। তারপর ভারতবর্ষের কত শহরে রাজধানীতে পাব্লিক্ ওয়ার্কে ও উই-ম্যানস্ কাউনসিলে আপনার বিদ্যাবুদ্ধির, কার্যশক্তির-বলে নেত্রীত্বপদ তিনি গ্রহণ করিতেছিলেন। মিসেস সেন-চৌধুরীর স্থান ভাবীদিনে নারী-নেতৃত্বের শীর্ষ সোপানে প্রায় স্থির হইয়া যাইতেছিল। রানী রাজবাড়ে, কাপুরথালার কুঁয়ার-রানী, গাইকবাড়নী, বা প্রিনসেস্ নিলোফার—ইঁহাদের পরেই যাঁহারা এদেশের নারী-সমিতির চূড়াবাসিনী মিসেস সেন-চৌধুরী তাঁহাদের প্রতিযোগিনী ও সহযোগিনী। কুঁয়াররানী, গাইকবাড়নীরা তো কাউনসিলের কার্য পরিচালনা করেন না; সে ভার থাকে মিসেস সেন-চৌধুরীর মতো ইনটেলেক্চুয়াল-নেত্রীদেরই হাতে।—তাঁহার হাতে আসিতেছিল, আসিতও:—এমনি সময়ে ওলট-পালট শুরু হইল।

মিসেস সেন-চৌধুরী এই জিনিসটা এত ভালো করিয়া পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। অবশ্য বুঝিতে পারিলেও তাঁহার উপায় ছিল না। মিস্টার সেন-চৌধুরী আই-সি-এস;—কি করিয়া মিসেস সেন-চৌধুরী তখন কংগ্রেস-ওম্যান হইতেন? যদি তিনি একবার 'আগাস্ট বিপ্লবে' যোগদান করিতে পারিতেন;—হাঁ গা-ঢাকা দিতেন,—তাহাতে অসুবিধা হইত কি? অনারেব্‌ল স্যার হরকিসানের বাড়িতেও তিনি থাকিতে পারিতেন। মিস্টার সেন্-চৌধুরী সে সময়ে অনারবেল স্যার হরকিসনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন। আর মিসেস সেন্-চৌধুরীকে স্যার হরকিসান সাদরে রাখিতেন, তাঁহার দিল্লী বা সিমলার কোয়ার্টার্সে। কিংবা, না হয় আসিতেনই তখনকার মিসেস কুইনি সেন-চৌধুরী—মানে, বর্তমান শ্রীমতী রানী সেন-চৌধুরী—তখন আগস্ট বিপ্লবে তিন মাসের মতো একবার জেল ঘুরিয়া।—এমন কি অসাধ্য ছিল তাহা মিসেস সেন-চৌধুরীর পক্ষে? মোটেই অসাধ্য ছিল না। 'বিশেষ শ্রেণী' তাঁহার জন্য জেলে নির্দিষ্টই থাকিত। বিশেষত তিনি নিজেও বিলাতফের্তা।

সত্যই, মিসেস সেন-চৌধুরীর ইচ্ছাও ছিল একবার জেল দেখিয়া আসেন।—কে না জানে তিনি মনে প্রাণে সেই 'বিয়াল্লিশে' ছিলেন কংগ্রেসেরই পক্ষে? অবশ্য কার্যত ও প্রকাশ্যে তিনি তাহাতে যোগদান করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিতা রহিয়াছেন। বঞ্চিতা রহিয়াছেন মিস্টার সেন-চৌধুরীর চাকরির জন্য। বঞ্চিতা রহিয়াছেন এক ভুলে—আই-সি-এস সেন-চৌধুরীকে বিবাহ করিবার অদূরদর্শিতায়। তাই সেই বিয়াল্লিশে মিসেস সেন-চৌধুরীকে স্যর হরকিসানের মনোনয়নে ন্যাশনাল ওয়ারফ্রণ্টের একটা কর্ত্রীত্বপদ গ্রহণ করিতে হইল। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন নিজের জন্য নয়,—মিস্টার সেন-চৌধুরীর জন্যই—সেন-চৌধুরী তখন স্যর হরকিসানের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি। না হইলে মিসেস সেন-চৌধুরী তখন চাহিয়াছিলেন এ্যাসেম্‌বলিতে সদস্যার পদে মনোনয়ন। কলিকাতা কর্পোরেশনেই কি তিনি লেডি অল্‌ডারম্যান হইতে পারিতেন না, এবং পরে ফার্স্ট মেয়রেস্ অব্ দি ফার্স্ট সিটি? অন্তত একটা প্রাদেশিক এ্যাসেম্‌বলিতে মনোনয়ন লাভ না করিলে তিনি কিছুতেই স্যর হরকিসানকে তখন ছাড়িতেন না। কিন্তু তবু তাঁহাকে হইতে হইল ন্যাশনাল ওয়ারফ্রণ্টের ওম্যান সাব-কমিটির সেক্রেটারি,—ন্যাশনাল ওয়ার-ফ্রণ্টে উচ্চচক্রের উপদেশিকা। ইহাতে একটা ভুল হইল। কিন্তু ভুলটা হইল তাঁহার নিজের জন্য নয়—মিস্টার সেন-চৌধুরীর জন্য—তাঁহারই চাকরির খাতিরে, 'কুইনী' সেন-চৌধুরী মিস্টার সেন-চৌধুরীর পত্নী বলিয়া। সেই গোড়াকার ভুলের জন্য—সেন-চৌধুরীকে বিবাহ করায়, ভাটিয়া লালুভাই মেহতাকে বিবাহ না করায়। তাই যুদ্ধ থামিতেই তখন সব ওলট-পালট হইল, আর অমনি কোথা হইতে কুইনী সেন-চৌধুরীর আসন কাড়িয়া নারী-ভারতের নেত্রীত্বলোকে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল—মিসেস নাইডু, বিজয়লক্ষ্মী, অমৃতকুমারী এবং ক্যাপটেন লক্ষ্মী ও মিসেস স্বামীনাথন্; তারসঙ্গে যত মেহতা ও মেনন, যত ভাটিয়া আর পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী আর মাদ্রাজী,—বাঙলা দেশেও আসিল যত হেঁজিপেঁজি। কিন্তু আসিল কিরূপে? কংগ্রেসের কর্মী বলিয়া কি? কে তাহারা কংগ্রেসের কর্মী?—তবে বিদ্যার

জোরে কি? কে তাহারা লেখাপড়া শিখিয়াছে? কে তাহারা ইংরাজী বলিতে জানে?—তবে ইহারা নেত্রী হইল বুদ্ধির জোরে কি? কে ইহার বুদ্ধিমতী?—তবে রূপের জোরে কি? না, না, তাহা নয়। রূপের জোরে কিছুতেই নয়। কিছুতে নয়।

কুইনী সেন-চৌধুরীর জানা আছে—বাঙালিনী হইলেও রূপে তিনি অপরাজিতা। নিশ্চয়ই অপরাজিতা। হাঁ, তিনি উহাদের পার্শ্বে বসিয়া, মুখা-মুখি দাঁড়াইয়া, নিজেকে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন। উহারা কেহবা তাঁহার অপেক্ষা একটু গৌরাঙ্গী, কেহ বা বেশি সুমুখী, কিন্তু সর্বব্যাপিক ভাবে কেহ তাঁহার মতো 'চার্মিং' এবং 'স্মার্ট' এবং 'ইনটেলেক্‌চুয়াল' নয়। হাঁ, 'ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটি' এখনো বলে কুইণী সেন-চৌধুরীকে 'ফরেন আপিসের' ডিপুটি সেক্রেটারি কাপুর,—পাকা ফ্লার্ট কাপুর। কিন্তু তবু সত্য কথাই বলে, জানেন তাহা 'কুইনী' সেন-চৌধুরী। 'ইনটেলেক্‌চুয়াল বিউটিও' আর এখনো,—হাঁ, এখনো,—তিনি সযৌবনা। না জানিলে কেহ কি বলিতে পারিবে তিনি এই পঞ্চদশ-বর্ষীয়া 'বেবি' সেন-চৌধুরীর মাতা স্বয়ং সপ্তত্রিংশ-উত্তীর্ণা? কে জানে যে উনিশ শ এগারোতে তিনি জন্মিয়াছিলেন? আর তাই তাঁহার নাম 'কুইনী,' মানে, এখন প্রকাশ্যে জনসাধারণের নিকট 'রানী', (কিন্তু অন্তরঙ্গ বিলাত-ফেরতা মহলে 'কুইনীই')। না, নিজেকে বহুদিন কঠিনভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কুইনী সেন-চৌধুরী,—নয়া দিল্লীর প্রত্যেকটি আধুনিক ককটেল পার্টিতে, মেয়েদের প্রত্যেকটি সমিতিতে, বাপুজীর প্রত্যেকটি 'প্রার্থনা সভায়';—প্রতিদিন নিজেকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—প্রতিবার আরশির সম্মুখে দাঁড়াইয়া—মিনিটের পর মিনিট—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহার কেশ, তাঁহার চোখের কোণ, পেণ্ট্-মুক্ত ভ্রূ, রুজ-মুক্ত কপোল ললাট, ওষ্ঠরাগমুক্ত ওষ্ঠাধর, বসনমুক্ত বাহু, করাঙ্গুলি, চিবুকের তল, কণ্ঠ ও স্কন্ধ, বক্ষ ও কক্ষ—দেখিয়াছেন নিজেকে সম্মুখ হইতে, পিছন হইতে, অপাঙ্গে,—কিন্তু কে বলিবে তিনি দেড় মনের বেশি ওজনে? সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, কেহ তাহা জানে। 'স্লিমিং'

করিবার প্রয়োজন নাই, চিনি ছাড়িবার কারণ নাই, ক্রিম কমাইবার দরকার নাই—কুইনী সেন-চৌধুরী আরও কুড়ি বৎসরেও বুড়ী হইবেন না। আশ্চর্য তাঁহার শরীরের গড়ন, সুঠাম, সুডোল,—আর সুযৌবনা;—আবার ইনটেলেক্চুয়ালও। অতএব, অপরাজিতা মিসেস সেন-চৌধুরী রূপে যৌবনে তখনো, আরও অনেককাল রহিবেন অপরাজিতা; তবু আজ এখনি তাহা বিশেষ ভাবে সত্য। এখনি—এই উনিশ শ সাতচল্লিশে ও আটচল্লিশে। এখন এক-একটা বৎসর যেন এক-একটা বিষম সংকট-ধ্বনি তাঁহার নিকট— 'সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই কুইনী, সময় নাই।' হাঁ, চলিয়া যায় তাঁহার জলুষ, যায় তাঁহার যৌবন, যায় তাঁহার গৌরতনুর তনিমা।··· অনেক করিয়া এখন মেরামত করিতে হয় নিজেকে, মেরামত করিতে হয় প্রতিদিন, প্রতিবার বহুক্ষণ ধরিয়া প্রসাধনশালা হইতে বাহির হইবার পূর্বে··· কুইনীর সময় নাই, সময় নাই! 'দিল্লী দূরন্ অশত'···কোথায় এ্যাসেম্‌বলির সদস্যপদ, প্রদেশে মন্ত্রিত্বের পদ, বিলাতে ভারতীয় কোনো একটা দৌত্যাবাসের কর্ত্রীত্ব, ইউ-এন-ও বা জেনেভায় কোনো একটা ডেলিগেশনের নেতৃত্ব··· কোনোটাই এখনো সেন-চৌধুরী বা মিসেস সেন-চৌধুরী আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ, কুইনী, সময় নাই, সময় নাই! অতএব, যেমন করিয়া পার ওঠো, যাহাকে পার আশ্রয় করো, যাহা চাই আঁকড়াইয়া ধরো!··· গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় জোটো; নোয়াখালি উদ্ধারে ছোটো! 'আগস্টের স্বাধীনতায়' পতাকা তোলো; সেপ্টেম্বরে, পাঞ্জাব-হত্যার ব্যাপারে দিল্লী যাও; অক্টোবরে, বাংলায় ফেরো; নবেম্বরে, দিল্লী ছোটো; ফেব্রুয়ারীতে, রাজঘাটে·লোটাও। ওঠো, ছোটো, হানা দাও, ধর্না দাও, কাঁদো, নাচো!··· কিন্তু যাহাই করো সংবাদপত্রে সেই কথা সর্বাগ্রে ছাপাও। সংবাদদাতাদের সঙ্গে তাই খাতির রাখো; খাতির জমাও সংবাদপত্রের মালিকদের সঙ্গে; খাতির ফলাও সংবাদ এজেন্সির মুনিবদের সঙ্গে। চা-এ ডাকিয়া খুশী করো সংবাদপত্রের সম্পাদকদের, আর ফোনে ডাকিয়া কৃতার্থ করো নিউজ এডিটারদের, রির্পোটারদের! তারপর সাধ্য কি, ভূ-ভারতে কেহ তোমার

নাম না জানিয়া পারে? সাধ্য কি কেহ দেখিবে না তোমার ছবি—নোয়া-খালির গাঁয়ে, কিংবা বিড়লাভবনের ছায়ে; বেলেঘাটায় গান্ধীজীর বৈঠকে তাঁহার সম্মুখে, কিংবা শরণার্থী শিবিরের মধ্যখানে?—শুধু কি দেখিবে ওই শাঁকচুন্নি অমৃরিতরানীকে? কিংবা মেদ-মাংসল কউনসিলরকে? না, তাহারা রানী সেন-চৌধুরীকে দেখিবে,—এবং দেখিতেছে।

অমিতেরও সাধ্য কি তাই না দেখিয়া পারে? কিন্তু সময় নাই, সময় নাই, কুইনী সেন-চৌধুরী। তুমি মাদ্রাজী নায়ার নও, গুজরাতী বেনে নও, পাঞ্জাবী বৈশ্য নও, হিন্দুস্থানী কায়স্থও নও,—তুমি বাঙালী ব্যারিস্টারের মেয়ে মাত্র। অনেক অসুবিধা তোমার। গুজরাতে তোমার বাড়ি নয়, বোম্বাই-এ নাই ব্যবসা; ইনফ্লুয়েনস্ নাই দিল্লী-সিমলায়।—বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে সেন-চৌধুরীকে,—একটা জড়ভরত! আই-সি-এস। হাঁ একদিন তারাই ছিল রাজা—আমলারাজার দিনে! কিন্তু আজ তো তারা চাকর!—যে-কোনো কংগ্রেস-ম্যানের, যে-কোনো মালিকের দাপটে তারা অতিষ্ঠ। মিস্টার সেন-চৌধুরী অমিতদের অনুজ, ইউনিভার্সিটির একটা ভালো ছাত্র। চাকরিতে কো-অপারেটিভ লইয়াই তাই সে সন্তুষ্ট—কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটেই থাকে আবদ্ধ;—নয়া দিল্লীতে যাইতেও সে চাহে না, সাহসও পায় না। বোঝে না তাহার স্ত্রী কুইনীর ভবিষ্যৎ, বোঝে না তাই নিজের ভবিষ্যৎ।…তোমাকে তাই পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে, কুইনী, ভাটিয়া মিলমালিকের কন্যারা আর পত্নীরা, যত মাদ্রাজী পাঞ্জাবী এড্‌ভান্‌চারেস্‌রা,—তোমার মতো যাহাদের না আছে বিদ্যা, না আছে বুদ্ধি, না আছে রূপ—ও যৌবন…বিউটি অ্যাণ্ড ইন্‌-টেলেক্ট্।…সব থাকিতেও সব তোমার অনায়ত্ত, কিছুই তুমি পাইয়াও পাও নাই। —অথচ সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই তোমার।—কুইনী সেন-চৌধুরী নিকট এই সাবধানবাণী বহন করিয়া আসে প্রতিটি দিনরাত্র। তিনি জানেন সময় নাই; আর তাই সংবাদপত্র পাঠক মাত্রকেই জানিতে হয় তিনি শরণার্থী সমস্যায় কি করিতেছেন—এয়ার লাইনে ছুটিয়া;—ভারতীয় কনস্টিটিউশ্যান ব্যাপারে কি বলিতেছেন—সংবাদপত্রে লিখিয়া;—ভারতীয়

নারীর অধিকার রক্ষায় কি করিতেছেন—সার্কুলার দিয়া; গান্ধীজীর বিয়োগে কতখানি কাঁদিয়াছেন—সভায় বসিয়া; আর এখন গান্ধীজীর শেষ নির্দেশ মতো কি করিতেছেন বাঙলা দেশের শরণার্থীদের স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া। তাঁহার এগ্রো-ইকোনমিক সলুাসনের নোট, তাঁহার ম্যাস এজুকেশ্যনাল রিজিনারেশ্যান স্কিম, তাঁহার সোশ্যাল রিগ্রুপিং-এর প্ল্যান, আর গান্ধীয়ান ইকনোমিক্স অ্যাণ্ড ডায়েলেটিকাল ডিফারেনসিয়াল-এর গ্রাফ;—এই সব না জানিয়া উপায় আছে কাহারও? উপায় আছে অমিতদেরও? হায়, তবু মিসেস রানী সেন-চৌধুরী পাইলেন কি না হতভাগা বাঙলাদেশে এই গড-ড্যামড্ শরণার্থীদের কাজ। এজন্যই কি লণ্ডনে পড়িয়াছিলেন তিনি?··· কন্টিনেণ্টে ঘুরিয়াছিলেন? জীবন দেশের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন?

অমিত জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় দেখা পেলে মিসেস সেন-চৌধুরীর—এয়ারোড্রোমে?

এয়ারোড্রোমে? সেখানে কেন?—জিজ্ঞাসা করিল সবিতা।

ওঁর সময় নেই বলে—হয়তো দিল্লী যাচ্ছেন, কিংবা দিল্লী থেকে ফিরছেন।

কাল সন্ধ্যায় দুইটি ঘণ্টা ইন্দ্রাণীকে বসাইয়া রাখিয়া তাহাই জানাইয়াছিলেন মিসেস রানী সেন-চৌধুরী। বাঙলার শরণার্থী মেয়েদের তিনি একটা নার্সিং শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাই তিনি ডাকিয়াছেন সিস্টার ইন্দ্রাণীকে। কিন্তু কাল আর তাঁহার সময় হয় নাই—নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন মেলের মার্কিন সংবাদদাতার সঙ্গে ছিল, তাঁর 'টি'। ন্যাচারলি, তার পরে এখানকার 'পত্রিকা' আর 'স্টেটসম্যানকেও' একটা স্পেশ্যাল ইণ্টারভিউ দিতে হইল। কাজেই, সিস্টার ইন্দ্রাণী, রিয়েলি, কুইনী সেন-চৌধুরী, হ্যাজ নো টাইম—অ্যাব-সোলুইটলি নো টাইম। কালই যেতে হবে এয়ারে সিমলা—দিল্লী চলুন, সেখানেই কথা হবে।—আর ততক্ষণ অমিত একা বসিয়া ইন্দ্রাণীর বাড়িতে।

অমিতের কথায় সবিতা হাসিল। না সে প্রোগ্রাম ক্যানসেল করেছেন। কাল দিল্লী যাবেন না। ওঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছেন শ্রীভুজঙ্গ সেন আর আমাদের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী জগন্নাথ চৌধুরী,—মিসেস সেন-চৌধুরী

অন্তত ছ'দিন এখানে যেন থাকেন। একটা ক্যাম্প দেখবেন। তার সঙ্গে আলোচনা হবে মুখ্যমন্ত্রীর।

অমিত শুনিল: সবিতাকেও আজ দুপুরে মিসেস সেন-চৌধুরী ডাকিয়াছিলেন শরণার্থী শিক্ষাসদন গড়িবার স্কিম লইয়া। তখন কিন্তু বেলা একটা। সেন-চৌধুরী অবশ্য বাড়ি ছিলেন না,—সবিতাকেও অপেক্ষা করিতে হইল—লঞ্চে মিসেস গিয়াছিলেন ফার্পোতে। মারোয়াড়ী এক ব্যবসায়ী 'হোলি-লাঞ্চ' দিয়াছিলেন—কংগ্রেসের গবর্নমেন্টের মন্ত্রীদের নিমন্ত্রণ ছিল। সবিতা ভাবিল —মিসেস সেন-চৌধুরীকে বলিয়া বিজয়ের একটা ব্যবস্থা হয়তো করা যাইবে।

মিসেস সেন-চৌধুরী সবিতার কথা শুনিয়া প্রথম কিছু করিতেই রাজী হইলেন না। কমিউনিস্টদের তো গবর্নমেন্টের দমন করিতেই হইবে, তিনি করিবেন কি? লাঞ্চেও কথাটা উঠিয়াছিল। পুলিশের একজন বড় কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, মারোয়াড়ীদের এই কথা বলিতেছিলেন। সেখানেই মিসেস্ সেন-চৌধুরী শুনিয়াছেন কমিউনিস্টদের আজ ধরা হইয়াছে; তবে অনেককে নাকি পাওয়া যায় নাই এখনো—আর কিছু কিছু ছাড়িতেও হইবে কাগজপত্র দেখিয়া। রাশিয়া এখন রক্ষা করুক না ইহাদের? মিসেস সেন-চৌধুরীর কোন দরদ নাই ইহাদের জন্য। একবার তর্ক হইয়াছিল মিসেস সেন-চৌধুরী সঙ্গে উহাদের এক চাঁই-এর—মিসেস নাইডুর সম্মুখে। মিসেস নাইডুর নিকট তখন খুব আস্কারা পাইয়াছিল উহারা। মিসেস সেন-চৌধুরী উহাদের রাশিয়ান ইকোনোমিক্‌সের পক্ষে ওকালতি সহ্য করিতে পারিলেন না। উহা আবার ইকোনোমিক্‌স্? লণ্ডনের সোস্যাল সায়েন্সের ছাত্রী তিনি, কেইনসের নূতনতম লেখা পড়িয়াছেন। কি জানে এই সব ফ্যানাটিকরা ইকোনোমিক্‌সের? মিসেস নাইডু থামাইয়া দিলেন, না হইলে মিসেস সেন-চৌধুরী দেখিতেন মূর্খগুলির স্পর্ধা কত দূর যাইত।

সবিতা অনেক কষ্টে একবার বলিবার সময় করিয়াছিল, বিজয় তত বড় কেহ নয়। ইকোনোমিক্‌স্ সে জানে না। বিজয় খেলে ও কবিতা লেখে।

কবিতা লেখে ?—মিসেস সেন-চৌধুরীর চোখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিল। মিসেস সেন-চৌধুরী কবিতা পড়েন না। মিসেস সেন-চৌধুরী 'স্টেটস্‌ম্যান' পড়েন, 'লাইফ' পড়েন, 'ইলাস্ট্রেটেড্ লণ্ডন নিউজ' পড়েন, এখন 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স্' ও 'ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্‌লি অব ইণ্ডিয়া'ও পড়েন—আর পড়েন 'ক্রাইম্‌স্'।

সবিতা বুঝি সেই সব পড়ে নাই ?—মিসেস সেন-চৌধুরী বুঝাইয়া বলিতেছিলেন। সবিতার ভাগ্যক্রমে আসিয়া পড়িলেন শ্রীভুজঙ্গ সেন, অ্যাসেম্বলির এক কংগ্রেস হুইপ্, আর ব্রজনন্দন পালিত—ফিনান্‌স্ মিনিস্টারের প্রাইভেট দালাল।

কয়টা পারমিটের হোল্‌ডার ভুজঙ্গ সেন ?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

সবিতা উত্তর দিল না। অমিত জানে—কয়মাস পূর্বেও সবিতার অপরিসীম ভক্তি ছিল ভুজঙ্গ সেনদের উপর। না থাকিবার কারণ নাই। দেশের জন্য ইহারা জীবন দিতে গিয়াছিলেন, বাঙলা দেশে ইহাদের নাম দেবতার মন্ত্রের মতো। এরূপ এক-একটা নামের সঙ্গেই যেন জাতির এক-একটা জীবনের শিকড় জড়াইয়া আছে। সবিতা কি করিয়া বুঝিবে আসলে জাতির শিকড় ইহাদের সহিত জড়াইয়া নাই, জড়াইয়া আছে দেশের জনতার সহিত ; তাহারাই উহার প্রাণরস যোগায়। ভুজঙ্গ সেনকেও রস যোগাইয়াছে একদিন এদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। কিন্তু আজ একটা শূন্যচারী পরগাছা সেই ভুজঙ্গ সেন, সবিতা তাহা কি করিয়া বুঝিবে ?

ভুজঙ্গ সেনের আসিবার কথা ছিল—কাল রাত্রিতেই কথা হইয়াছে। আগমনের প্রকাশ্য কারণ পূর্ব বাঙলার শরণার্থী। কিন্তু নয়াদিল্লীতেই ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে মিস্টার অনিল দত্তের বাড়িতে মিসেস সেন-চৌধুরীর কথা হইয়াছিল।—'মিস্টার অনিল দত্ত—যাঁহার ওয়াইফ্ ও ব্রাদার ব্রিটিশ আমলের অত্যাচারে প্রাণ দেয়'। অমিত জানে তাহা—সুনীল আর ললিতা। কে জানে যে, অনিলের ভাগ্যোদয়ে তাহাদেরও দান মূল্যবান্ ? এখন [illegible] 'শাফ্লিং

এর' জন্য ক্ষতিপূরণ পাইয়াছেন মিস্টার দত্ত, কমার্স বিভাগের এক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি তিনি।

মিসেস সেন-চৌধুরী ও ভুজঙ্গ সেন উভয়কে মৃদু পরিহাসে দোষারোপ করিলেন। মিসেস্ সেন-চৌধুরীর বক্তব্য—ভুজঙ্গ সেন দিল্লীতে একটু চাপও দিতে পারেন না কি বাঙালীদের প্রতি সুবিচারের জন্য? এই তো, এত 'ফরেন সার্ভিসে' লোক যায়—একজন বাঙালীও কি যাইতে পারেন না রাজদূত হইয়া? কত মাদ্রাজী পাঞ্জাবী মেয়ে দিল্লীতে কর্ত্রীত্ব ফলাইতেছে, একজন বাঙালী মেয়েও কি নাই? 'ইউনেসকোর' সংস্কৃতি পরিষদে মিসেস সেন-চৌধুরী হিউম্যান রাইটসের উপর ও উওম্যান'স রাইটসের উপর বলিতে পারিতেন—ভুজঙ্গ সেন দেখিয়াছেন কি সেই নোট?

ভুজঙ্গ সেন বলিতেছিলেন—বাঙলার কংগ্রেসে শরণার্থীদের স্থান করিয়া দিতে না প্যারিলে কি করিয়া কংগ্রেস বাঁচে? কিংবা তাঁহারা কোনো 'কাজ' করিতে পারেন? তাই মিনিস্টার শ্রীজগন্নাথ চৌধুরী ও মিসেস সেন-চৌধুরীকে এখানে দুইদিন থাকিতে হইবে।

উভয়েই উভয়ের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ভুজঙ্গ সেন জানেন মিসেস সেন-চৌধুরী একটা ঘুঁটি; পাকিলে অশ্বও হইতে পারে। মিসেস সেন-চৌধুরী বুঝিতেছেন ভুজঙ্গ সেন আছে; কিন্তু জগন্নাথ চৌধুরীও একটা সূত্র—ছাড়া ঠিক নয়।

কি একটু আস্তে আস্তে কথা হইল ভুজঙ্গ সেনের সঙ্গে মিসেস সেন-চৌধুরী।

সবিতার হয়তো এবার ওঠা উচিত—কোনো একটা কথা বা চুক্তি সম্ভবত ইঁহাদের নিজেদের এখন ছিল। কিন্তু সবিতা উঠিবে কি করিয়া? তাড়াতাড়ি উঠিতে চায় বলিয়াই সে একবার মিসেস সেন-চৌধুরীকে বলিল,—একবার বিজয়ের সঙ্গে তিনি সবিতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন না? বিজয়ের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়ও যে সে সঙ্গে লইতে পারে নাই।

সবিতাকে বিদায় দিবার প্রয়োজন মিসেস সেন-চৌধুরী ও ভুজঙ্গ সেন

উভয়েরই ছিল। তাঁহাদের একটা পরামর্শ আছে। একটু পরেই সময় হইলে আরও দুই-একজন আসিবেন—সম্ভবত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী জগন্নাথ চৌধুরীও।

ওঁদের সময় ছিল না,—সবিতা বলিল সংক্ষেপে।

সময় যে তাঁহাদের নাই তাহা অমিত বোঝে। মিসেস সেন-চৌধুরী কিন্তু বিজয়ের ব্যাপারে হাত দিতে চাহেন না। না হইলে এখনি তিনি ফোন করিতে পারিতেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণ্ডলকে। আর বিগলিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল; 'মিসেস সেন-চৌধুরী—আপনি! ওঃ! ওঃ! তা দেখছি—দেখছি, এখনি বলে দিচ্ছি আমি···হাঁ, করব···।' হয়তো বা আধ-ঘণ্টার মধ্যে সেক্রেটারিয়েট হইতে পালাইয়া মিসেস্ সেন-চৌধুরীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইতেন শ্রীযুক্ত মণ্ডল। 'কাজটা হয়ে গিয়েছে মিসেস সেন-চৌধুরী? ··· হাঁ, হাঁ, আপনাকে তাই জানাতে এলাম।'···জানাইতে আসিবেন, এবং তাই শ্রীযুক্ত মণ্ডল বসিবেন। মিসেস সেন-চৌধুরীকেও সহিতে হইবে সেই উজবুকের সঙ্গে বাক্যালাপের যাতনা। তবু যদি কোনো লাভ হইত তাহাতে? কি করিতে পারে এই 'শেডুল কাস্ট' মন্ত্রী? নয়াদিল্লীতে ঘুঘু-বাঙালী মন্ত্রীরাই পাত্তা পায় না—জগন্নাথ চৌধুরী ও পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রীও থৈ পাইবেন কিনা ঠিক নাই। আর ওই শেডুল কাস্ট উপমন্ত্রী—ইংরেজিও যে বলিতে জানে না—করিবে কি সেখানে? কিন্তু কমিউনিস্টদের জন্য কেন কুইনী আপনার চান্‌স নষ্ট করিবেন? না, মিসেস সেন-চৌধুরী অত সস্তা মানুষ নন। তিনি এসব কাজে হাত দিবেন না। বরং ভুজঙ্গ সেনকেই বলা যাউক কিছু একটা ব্যবস্থা করিতে।

মিসেস সেন-চৌধুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করা যায় ভুজঙ্গবাবু? পারেন না কি কিছু করতে?

তিনি ভুজঙ্গ সেন—নয়াদিল্লীর অ্যাসেম্‌বলির ফোর্থ হুইপ। কী না পারেন তিনি?···তবে—

এই কমিউনিস্টগুলিকে গুলি করা দরকার··কিন্তু বলছেন যখন আপনি মিসেস সেন-চৌধুরী, আর তুমিও এসেছ সবিতা—.

ভুজঙ্গ সেন মাপিয়া দেখিলেন, সবিতার না হয় খাদি আর গ্রামোদ্যোগে নীরেট মাথা, কিন্তু বিমান-বিহারিণী মিসেস সেন-চৌধুরী নয়াদিল্লীতে উচ্চ-মহলে একেবারে তুচ্ছ নন। সেখানে মিসেস সেন-চৌধুরীকেও কাজে লাগানো যাইতে পারে। ফোর্থ হুইপ হইতে ফার্স্ট হুইপ, কিংবা একটা ক্ষুদে মন্ত্রিত্ব প্রথম ধাপেই,—এই সব কাজে একটা অ্যাসেট হইতে পারেন মিসেস সেন-চৌধুরী—এই ধারণা কি ভুজঙ্গ সেনেরই নাই? না থাকিলে তিনি মিসেস সেন-চৌধুরীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছেন কেন? ওই সব বজ্জাত শরণার্থীদের জন্ত?

কিন্তু ভুজঙ্গ সেনের অভিমানও আছে। সবিতা কি তাঁহাকে জানিত না? জানিলে সে নিজে ভুজঙ্গ সেনকে বলিল না কেন?…ভুজঙ্গ সেন রাগ করেন নাই, কিন্তু মনে ক্ষোভ পোষণ করেন। সবিতা কি তাঁহাকে এত দূর বলিয়া মনে করে?—তাঁহাদেরই পাড়ায় ছিল সবিতাদের ইস্কুল।

সবিতাকে অনুযোগ দিলেন ভুজঙ্গ সেন—কুমুদ সরকারের পাল্লায় সবিতা মিথ্যা মিথ্যা ঘুরিয়া মরিতেছে। এই খাদিগুলি অকর্মণ্য। অবশ্য ঠিকই ভাবিয়াছে সবিতা—বিজয়ের জন্ত ভুজঙ্গ সেন কিছু করিতে পারিবেন না। পারিবেন কি করিয়া? কাহার সহিত কথা বলিবেন ভুজঙ্গবাবু? তাঁহাদের চিনিবে কি এখন পুলিশের কর্তারা? চিনিত অবশ্য একদিন। কিন্তু তিনি এখন কংগ্রেসম্যান। 'মন্ত্রী নই, একটা সেক্রেটারিও নই—সেদিনের ভোঁতা টেরোরিস্ট।'

সবিতা লজ্জা পাইল। বলিল, তাই তো ভাবছিলাম এসব কাজে কি আপনারা যাবেন?

দেখা যাক্। সন্ধ্যা বেলায় বিলেল্লা প্যালেসে হোলির পার্টি আছে, দেখা হবে মন্ত্রীদের সঙ্গে। মিসেস সেন-চৌধুরীও থাকবেন তখন। তখনই বিজয়ের বিষয়ে কথা হবে পুলিশ মিনিস্টার দে-সরকারের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ভুজঙ্গ সেন বলিয়া দিলেন কি-কি জিনিস বিজয়ের দরকার হইবে—কাপড়-চোপড় সাবান, তেল, টুথপেস্ট, ব্রাশ। বিজয়ের জন্ত ভুজঙ্গ

সেনের বরাবরই মায়া ছিল। দুঃখ করিলেন—ছেলেটা কমিউনিস্টদের দলে পড়িয়া গোঁয়ার হইয়াছে। রাগ করিলেন,—ছেলেগুলিকে কেন ধরেছে গবর্নমেণ্ট? ধাড়ীগুলিকে ধরা দরকার। তা ধরবার নামগন্ধ নেই। কেবল দুই একটা পুরাতন বোকা ধরা পড়েছে,—অমিত, সৈয়দ আলী, মাস্টার সাহেব, —সব পুরাতন বদমায়েশ, কিন্তু গোবরে-ভরা নীরেট মাথা।

ভুজঙ্গ সেনকে আমার কথা বললে কেন?—অমিত হাসিয়া বলিল সবিতাকে।

সবিতা বলিল, আমি বলি নি কিছু।

তা হলে এখানে দেখার অনুমতি পেলে কি করে?

ওঁরা কেউ কিছু করলেন না। তখন আমিই এখানে এসেছি। এখানে এসে সরাসরি পুলিশকর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। ভুজঙ্গ সেনের কাছে আর যাব না। তার চেয়ে এরাই বরং ভালো।

এতটা স্পষ্টতা, কর্মোদ্যম যে সবিতার মধ্যে ছিল, ইহা অমিতের অজ্ঞাত। আশ্চর্য, কি করিয়া সবিতা আপন সংকোচ ও কুণ্ঠা কাটাইয়া উঠিল? সরাসরি একা এই গোয়েন্দা-দপ্তরে আসিয়া পড়িল—সেই সবিতা—'সাত-চড়ে কথা সরে না মুখে' সেই পার্বতীর মতোই। কিন্তু পার্বতী জীবিকার গরজে উদ্যোগিনী, শ্রমিকের দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় তাহার গরজ জন্মিয়াছে। সবিতার তাড়না কি? হয়তো বিজয়ের মায়া, হয়তো আপন প্রকৃতির দাবি। এবার কি আর সবিতা আপনাকে খর্বিত করিবে না, খর্বিত রাখিবে না?

সবিতা জানাইল, বিজুকে আপনি দেখবেন জানি—ওর খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম আছে। জানেন না বোধ হয় সেবারে গুলি বিঁধে অবধি ওর অন্ত্রের ক্ষত শুকোয় নি।

স্বল্প কথায় ও সহজ সাধারণ কণ্ঠে সবিতা জানাইল—তাহার কথায়, কণ্ঠস্বরে কোনোখান দিয়া যেন বেদনা ও বিক্ষোভের কোনো আঁচ না লাগে; —আর না জাগে তাহার কোনো আবেগ-স্পর্শে বিজয়ের মর্মে সেই বেদনা-

কাতর ক্ষতস্থলটির ব্যথা। তাই খুব সহজ ভাবে কথাটা বলিল।

অমিত বলিল, হাঁ, জানি—একটু আগেই খাবার সময় মঞ্জু বলছিল।

অমিতের নিকট কাহিনীটি অপরিজ্ঞাত নয়। সবই সে জানে। সেদিনও সকালেই বিজয় বাহির হইয়াছিল। রসিদ আলী দিবসের অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় দিবস। সকালেই পাড়ায় ট্রামও পুড়িতে আরম্ভ করে। বিজয় ক্যামেরা লইয়া চলিয়াছিল তাহার এক বন্ধুর সঙ্গে।

তাহারা ফটো লইতেছে—পোড়া ট্রামের, পথের ব্যারিকেডের, মিলিটারি ট্রাকের, উদ্দীপ্ত জনতার, উৎসাহী বালকদলের। হরিশ মুখার্জি রোডে গোয়েন্দার এক চর তাহাদের দেখিতে পায়। হয়তো সে বিজয়কে চিনিত না, কিন্তু তাহার সঙ্গী সেই বাস ইউনিয়নের সুরেশকে চিনিত নিশ্চয়। গলির মোড়ে খপ করিয়া হঠাৎ তাহাদের ধরিয়া ফেলিল এক ফিরিঙ্গী সার্জেণ্ট। প্রথমেই কাড়িয়া লইল ক্যামেরাটা। বিজয় আপত্তি করিতেই বলিল :

আই'ল্ শুট্ ইউ : গুলি করব।

গুলি করিবে কি ? ঠাট্টা নাকি ?—সত্যই বিজয়রা ভাবিয়াছিল বুঝি তামাসা করিতেছে। পরে মনে হইল—ভয় দেখাইতেছে।

ক্যামেরা দাও সাহেব।

খানিকদূরে রাইফেলধারী ছয়জন গুর্খা। সাহেবও রিভলবার লইতেছে। তথাপি বিজয়েরা কিছু বুঝিতে পারে নাই। বরং সুরেশ দমিয়া না গিয়া সাহস দেখাইয়া বলিল, ওসব রাখো সাহেব, ক্যামেরা দাও।

এই দিচ্ছি,—গুলি উঁচাইয়া তুলিতেই সুরেশ দুইলাফে পিছনে সরিয়া গেল। দৈবক্রমেই তাহার গায়ে গুলি লাগিল না। দুইজনে পিছন ফিরিয়া প্রাণপণে তখন ছুটিল গলির মধ্যে। পার্শ্ব ঘেঁসিয়া কি লাগিল একটা বিজয়ের বাম কবজিতে। পিছনে ফটফট শব্দ হইতেছে। পড়িয়া গেল সুরেশ ; তথাপি আবার উঠিল। বিজয়ও পড়িয়া গেল, এবার ডান উরুতে বিঁধিয়াছে কিছু। কিন্তু উঠিল। একটা ফটক-ওয়ালা বাড়ির হাতায় দুইজনে ঢুকিয়া পড়িল। আর পারে

না, বিজয় পোর্টিকোতে বসিয়া পড়িল। এবার সুরেশ কর শুইয়া পড়িল,—তখনো সে জানে না গুলি তাহার পার্শ্বভেদ করিয়া কিডনিতে গিয়া লাগিয়াছে। শুধু বোঝে। আর পারে না বুঝি সে। বিজয়ও আর পারে না—পা নিশ্চল, বাম হাতটা বুঝি চূর্ণ হইয়াছে, পেটেও লাগিয়াছে নাকি ?

শুধু দুইজন তাহারা দুইজনের দিকে তাকাইয়া। মনে হইল বিজয়ই বেশি আহত—রক্ত ঝরিতেছে তাহারই বেশি। 'জল', 'জল'—পিপাসার জন্য জল চাহিতেছে,—প্রথম সুরেশ তারপর বিজয়ও। কেহ তাহা দেয় না। চারিদিকের বাড়ি হইতে লোকে জানালা ফাঁক করিয়া ভয়ে ভয়ে দেখিতেছে।

সুরেশই বিজয়কে বলিল, 'আমরা বোধ হয় আর বাঁচব না।—আমরা !' —তখনো সুরেশ ভরসা দিতে চায় বিজয়কে। মরিলেও বিজয় একা মরিবে না। একজন সঙ্গী থাকিবে—সুরেশ।

বিজয় সেই শব্দটা শুনিল—'আমরা'।

জীবনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া চাই আমরা মরণের সম্মুখে কাহাকেও আপনার দোসর রূপে। জীবন আপনিই একটা মহারাজ্য। অফুরন্ত তাহার আত্মীয়তা। মৃত্যু শূন্যময়, মৃত্যু অনাত্মীয়, সেইখানে সকল পরিচয়ের শেষ-সীমা। তাই মৃত্যু এত বিভীষিকা। তাই তো জীবনের শেষ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আমরা বাহু মেলিয়া দিই—কাহাকেও কি আঁকড়াইয়া ধরিতে পাইব না? কোনো একটি সুপরিচিত হাত; কোনো দুইটি সবল সন্তান-বাহু; কোনো একটি ব্যথায়-বিস্ময়ে-ভয়ে কাতর নবীন দেহের উষ্ণ-স্পর্শ। তাহাও যেখানে নাই, চাই সেইখানে অন্তত কোনো একটি পরিচিত হৃদয়ের আশ্বাস—'আমি রহিলাম তোমার অন্তিম অংশভাক্, তোমার চরম আশ্বাস, তোমার জীবনান্তের সঙ্গী।'...হাঁ...অমিত, এই অবস্থাও মানুষের স্বভাব, এই আশ্বাস মানুষের প্রয়োজন...তোমারও, বিজয়েরও...

দুই ঘণ্টা পরে পাড়ার লোকেরা ফোন্ করিয়া অ্যাম্বুলেন্স আনায়—তাহাদের হাসপাতালে পাঠায়।

সেই রাত্রে সুরেশ কর মারা গেল। বিজয়কে অনেক কষ্টে বাঁচানো

গেল। হাতটা গিয়াছে ; পাটাও হাসপাতালের ডাক্তারদের দোষে যাইতে বসিয়াছিল। তাহারা যেন দেখিয়াও দেখে না,—সেপটিক হইল, দুই দুইবার কাটিল, শেষে অ্যাম্পুটেট করিবার কথা। কিন্তু পেটের ঘা'ই মারাত্মক হইতে-ছিল। বাড়ি হইতে পেনিসিলিন প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া তাহাকে রক্ষা করা গেল। অথচ পেটে ক্ষত হইয়াছিল সামান্য,—পার্শ্ব দিয়া গুলিটা ছিটকাইয়া গিয়া হাতে বিঁধে।

অমিত জানে, কেন সবিতা এ সম্বন্ধে বেশি কথা বলিল না। বিজয় এই আলোচনায় কুণ্ঠিত হয়। বিজয়ের জীবনে সমস্ত সৌভাগ্য ছিল। সে ভালো হকি খেলিত,—'স্মার্ট' ও স্বাস্থ্যবান—তাহার সঙ্গ সকলের নিকট লোভের বিষয় ছিল। আজ কি সে মানুষের শুধু কৃপার পাত্র হইবে? কিছুতেই না। সে এইজন্য তাহার পুরাতন সহপাঠিনীদের সঙ্গও সন্তর্পণে বর্জন করিয়াছে—একসময়ে তাহারা বিজয় বলিতে অজ্ঞান হইত। কিন্তু সে বিজয় আর নাই। বিজয়ও তাই আর নাই সেই সমাজে। বিজয় গম্ভীর হইয়া গিয়াছে।

সে অবধি বিজয়ের পেটে একটা ব্যথা প্রায় লাগিয়াই আছে। খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত নিয়মমতো করিতে হয়। ডাক্তার বলেন, হয়তো সেই গুলিরই ফল। সবিতা জানায়, যাহাই হউক, বিজয়কে যদি এখানে উহারা ধরিয়া রাখে, এই দিকে অমিতের একটু সাবধান হইতে হইবে।

অমিত সহজ ভাবে শুধু জানায়—তাহা দেখিবেই, সে জন্য ভাবনার কারণ নাই।

সবিতা একবার চুপ করিয়া রহিল, পরে স্থির দৃষ্টিতে বলিল, মনুকে সব কথা লিখে একটা চিঠি দিয়ে দিলাম।—

মনুকে?—অমিত বিস্ময় গোপন করিতে পারে না।

সবিতার পক্ষে মনুকে পত্র লেখার অর্থ কি, তাহা অমিত জানে। ইহা যে তাহাদের দুইজনার পক্ষেই দুইজনাকে প্রায় স্বীকৃতি। তাই অমিতের কণ্ঠ হইতে বিস্ময়োক্তি ফুটিয়া উঠিল: 'মনুকে!'

সে ছাড়া আর কে আছে? অনু আর শ্যামল তো নেই—এখন আসবেও না। তার সাহায্য না পেলে আমার চলবে কেন?

সবিতার চক্ষে অর্থসূচক দৃষ্টি ফুটিল, পরে সে চক্ষু অবনমিত করিল। তাহার বক্তব্য অমিতের বুঝিতে বাকি রহিল না। তথাপি বিশ্বাস হয় না—সত্যই সবিতা জীবনে আর একটি নূতন পৈঁঠায় এবার অবতীর্ণ হইবে!—জীবনকে সে কি স্বীকার করিবে? আত্মসংকোচনের মোহে, অধ্যাত্মবাদের ছলনায় আর কি সে আপনাকে ছলনা করিবে না?

অমিত অতটা আশা না করিয়া সাবধানে বলিল, ওদের ব্যবস্থাও হয়তো মনু সময় পেলেই করবে।—

সবিতা একটু তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, আমিও তো আছি।…

অমিত বুঝিল। বলিল, তোমার যে অনেক কাজ। কষ্ট হবে।

সবিতার দুই চক্ষুর মধ্যে অমিত এক আহত নিবেদন পাঠ করিল। তাই সে নিজেই আবার বলিল, কিন্তু কাজকে ভয় কি, সবিতা? অভীঃ।

গোয়েন্দা আপিসের ফাইল আর দপ্তর, পার্শ্বে একজন গোয়েন্দা উপবিষ্ট। প্রত্যেকের কথা চলে সতর্ক; অমিতও কথাটা ঈষৎ লঘু স্বরে বলিল। কিন্তু সেই কথায়, দুইটি চোখের তারায় একটা নতুন কৃতজ্ঞতা ও নতুন সংকল্প ঘনায়িত হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে অমিতের কষ্ট হইল না!…অভীঃ, অভীঃ, অভীঃ! আর কোনো কথার প্রয়োজন নাই। কোন্ কথার আর সার্থকতা থাকিতে পারে সবিতার জীবনে?

সাক্ষাতের সময় শেষ হইতেছে। বিজয়ের সহিত উঠিতে উঠিতে অমিত বলিল: তুমিই তবে এবার থেকে মনুকে দেখবে। দেখবে।—

সবিতা দাঁড়াইল: নিশ্চয়ই। সে আমার পুরোনো বন্ধু। এক সঙ্গে দুজনা পড়েছি। আমিই তাকে দেখব।

অমিত দাঁড়াইয়াছিল; সবিতাও থামিল। সে চক্ষে কি আর-একটা ক্লান্ত বিনীত স্বীকৃতিও দেখিল অমিত?…তাহা হয় না, তাহা হয় না। সবিতা তাহার জীবনকে,—তাহার ভাঙা-চোরা জীবনকে—জোড়াতালি দিয়া বাঁধিতে

চাহে না। যাহা হারাইয়াছে তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে না। যাহা হারাইয়াছে—তাহাকে হারাইয়াছে বলিয়াই সে স্বীকার করিবে; হারানোকে স্বীকার করিতে সে ভয় পায় না। সে ভয় পায় না, সে জয় চায় না—এই তো তাহার অনাসক্তি-যোগ। তাহাই সে গ্রহণ করিবে। সবিতা তাই মনুর ভার গ্রহণ করিবে, আর অনুর কাজও;—আর গ্রহণ করিবে জীবনকে—সহজ জীবন নয়, মহৎ জীবনকে। তাহা সবিতা-মনুর সংসার নয়, সবিতা-মনুর জীবন, ও শ্যামল-অনুর জীবন;—যে জীবনে আছে জীবনের বিস্তার;—তাহা গার্হস্থ্য নয়, কর্মযোগ;—বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ।

গোয়েন্দা অফিসার নিজ অধস্তন কর্মচারীকে বলিল, ওঁর সঙ্গে যাও, ফটক খুলে দিতে বলো।

সবিতা শেষবারের মতো বিজয়ের মাথায় হাত রাখিল। বলিল, অমিদাকে তোমার কথা বলেছ? বলো নি? তা হলে এতক্ষণ বললে না কেন আমাকে? ওঁকে জিজ্ঞাসা করতাম।—

বিজয় বাধা দিয়া বলিল, ঠিক হোক।

সবিতা কি ভাবিল, শেষে বলিল, যাই হোক বিজু, আমি কিন্তু ভয় পাই না।

বিজয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফটক পর্যন্ত চলিল।

'আমি কিন্তু ভয় পাই না';

…কি ভয় পায় না সবিতা? কোন জীবন-স্বীকৃতিতে ভয় পাইবে না সে? সহজ-জীবন স্বীকৃতিতে, না মহৎ-জীবন-স্বীকৃতিতে?—না দুইয়েতেই?

আমাকে চিনতে পারলেন না বোধ হয়, অমিতবাবু?

কে?—অমিত পিছনে ফিরিয়া দেখিল সেই গোয়েন্দা অফিসার ভদ্রলোক তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নিজেই সে বলিল, আমি চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী…

তথাপি অমিতের মনে পড়িতেছে না। চন্দ্রকান্ত জানাইলেন, আপনাকে একবার এ আপিস থেকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম—সে দশ বৎসর হবে প্রায়···

ওঃ। অমিতের মনে পড়িল, সেই গোয়েন্দা যুবক—স্পোর্টস্‌ম্যান বলিয়া যে চাকরি পাইয়াছিল, খেলার কথায় ছিল তখনো উৎসাহ·· সেদিনের কথা অমিতের মনে ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল।

অমিত বলিল, দেখুন, ভাবিই নি আপনি আছেন এখানে! তা এখন আপনি কী পদে?

ইন্‌স্পেক্টরের কাজে প্রমোশন পেয়েছি গত আগস্টে। অনেকে এ বিভাগ ছেড়ে দিলেন, তাতেই একটু সুবিধা হল। ডি. সি. বললেন—ইণ্টারভিউ নাও, ছাখো যদি অব্‌জেক্‌শান না থাকে। সবিতা দেবী যখন বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন উনি, কিছু ফলটল নিয়ে এসেছেন, তাতে মিছা বাধা দেবার আমার কি?

চন্দ্রকান্ত অমিতের পরিচয়কে মনে করিয়া রাখিয়াছে, আর তাই অমিতের সঙ্গেও সবিতার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।···আশ্চর্য!—অমিত না ভাবিয়া পারে না—কোন্ দশ বৎসর পূর্বেকার আধ-ঘণ্টার বা পনের মিনিটের একটি মানবীয় পরিচয়ও এই গোয়েন্দা দপ্তরের ধরাবাঁধা নিয়ম ও দুর্মতিকে ছড়াইয়া উঠে—এই নয়া স্বাধীনতার এত পরিবর্তনের এপারে আসিয়াও পৌঁছে,—যখন ভুজঙ্গ সেন তাহাদের পাইলে গুলি করে, আর মিসেস সেন-চৌধুরী হইলেন স্বাধীনতার বড় কংগ্রেস-কর্ত্রী—তখন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী—কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের আই বি ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিস,—সে আবার অমিতের পরিচয়কেও মনে করে একটা স্মরণীয় জিনিস, গর্বের কথা।···

অমিত সহাস্যে বলে, খেলা-টেলা আছে তো এখনো, চন্দ্রকান্তবাবু?

খেলা? সে কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, অমিতবাবু। আপনিই দেখি তবু মনে রাখেন—আমি একদিন ছিলাম স্পোর্টস্‌ম্যান।

অমিত বলিল, খেলা যে আশ্চর্য জিনিস। মস্কো 'ডাইনেমোর' কথা

তো শুনেছেন। 'স্পোর্টস্ প্যারেড' দেখেছেন? দেখে আস্‌বেন—সিনেমায় মস্কোর 'স্পোর্টস্ প্যারেড্'। মনে হবে—হয় আপনার জন্মানো উচিত ছিল অ্যাথেন্‌সে, নয় এ যুগের মস্কোতে—তা হলেই স্পোর্টস্-ম্যানের জীবন সার্থক।

কেমন একটা সম্মিত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি গোয়েন্দা ইন্‌স্পেক্‌টার চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর মুখে। সে আর খেলোয়াড় নাই, শরীর ভারী হইয়াছে, মাংসল হইয়াছে, সুডৌল হইয়াছে, একটা নিশ্চলতার ছাপ পড়িতেছে তাহার শক্ত মজবুত দেহে। তবু এই অমিতবাবু,—এত বৎসর পরেও মনে করিয়া রাখিয়াছেন একদিন সে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীও ছিল স্পোর্টসম্যান। সে খেলিত···একদিন সে ভালো খেলিত—সে পরিচয়টা তাই চন্দ্রকান্তের মনেও আজ জাগিয়া উঠিতেছে।

বিজয় আসিয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তও বিদায় লইবে। অমিত বলিল, একটি ছেলে হয়েছিল না আপনার তখন?—সেদিন যেন কি কাজ ছিল তার? কেমন আছে সে? আর ছেলেপিলে কি আপনার?

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী সপুলক আনন্দে বলিলেন, আপনার তাও মনে আছে? সেদিন হয়তো তার ভাত ছিল। এখন সে বালিগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ছে। আরও দুটি মেয়ে, একটি ছেলে হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো আছে সব। সবাই এখানে। আর কি, দেশ তো পাকিস্তান হয়ে গেল। যা বলেন, আপনারা লীডাররা আমাদের তুলে দিলেন লীগের হাতে। সর্বনাশ হল বাঙলা দেশেরই।···দেখুন এখন—। আচ্ছা, নমস্কার। ফলমূল জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত বিদায় লইল। দশ বৎসর আগেকার পনের মিনিটের পরিচয় একটা নূতন আলোকে ভাঙিয়া চুরিয়া আবার নূতন হইয়া উঠিতেছে।··· মিথ্যাও নয় তবে সেই পনের মিনিট—সেই পরিচয়—সেই মানুষ···

দুইজনে বন্দিগৃহের দিকে চলিতেছিল। বিজয় ধীরে ধীরে বলিল, মাসী এবার এগিয়ে এলেন, অমিদা।

··তোমারও তাই মনে হল, না?—আসতেই হবে, বিজয়। জীবন সম্বন্ধে যাঁরা সীরিয়াস্ সাধ্য কি তাঁরা অস্বীকার করবেন এই শতাব্দীর জীবন-পথ?

জীবন সম্বন্ধে যাহারা সীরিয়াস্...অমিত নিজেই আবার আবৃত্তি করিল।

পঁয়ষট্টিজনের সেই গৃহে পৌঁছিয়া গিয়াছে অমিত। প্রশ্ন আসিতেছে—বিজয়কে ঘিরিয়া ধরিয়াছে দিলীপ, মঞ্জু, বিজয়ের বন্ধুরা। হর্ষোৎসবও পড়িয়া গিয়াছে—বিজয়ের মাসী খাবার দিয়া গিয়াছেন। সেই সবিতা রায়? হাঁ, হাঁ, সেই 'খাদি গ্রুপের সবিতা রায়'...সুজাতার বিস্ময় আর কৌতুক একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠে।

অমিত নীরবে শুনিতে থাকে। গান্ধীপন্থী সবিতা রায়—সত্য। কিন্তু 'জীবন সম্বন্ধে সে সীরিয়াস'...। জীবনে যে সীরিয়াস সে কি করিয়া নিজেকে বঞ্চিত করে? জীবন সম্বন্ধে যে সীরিয়াস সে কেন তথাপি আত্মপ্রকাশে এতটা সংকুচিত থাকে? সবিতা সংকুচিত, তথাপি জীবনের মহৎ প্রকাশের অভিযানে সে আজ আগাইয়া চলিল। না, ইহাও সবিতার আপনার হইতে আপনাকে গোপনেরই একটা পন্থা? প্রকাশের পন্থায় মিশাইয়া যায় সবিতার পলায়নেরও পন্থা।—হয়তো তোমার মতো, ইন্দ্রাণীর মতো।

অন্ধকার হইতেছে। অমিত ঘরের এক কোণে এবার চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তোমার মতো...ইন্দিরার মতো...জীবনের পূজার নামে জীবন হইতে পলায়ন।

এমনি সময়ে কাল ইন্দ্রাণীর জন্য অমিত অপেক্ষা করিতেছিল তাহার গৃহে। আজ এই মুহূর্তে ইন্দ্রাণীকে তাহার মন হইতে দূরে সরাইয়া রাখাও সম্ভব হয় না।...এই শতাব্দীর জীবন-পথ আত্মনিগ্রহে নয়, ইন্দ্রাণী বুঝিয়াছিল—যাহা সবিতা মানে নাই! বিদ্রোহেও নয়,—বুঝিয়াছে তাহা সবিতা—ইন্দ্রাণী যাহা বোঝে নাই।—

আর তুমি কি বুঝিয়াছ অমিত.. কি ই বা পাইয়াছ?

গ্রামোদ্যোগ আর বুনিয়াদি শিক্ষা লইয়া মনে মনে সবিতা পূর্বেই সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, তাহাতে ভুল নাই। ইহা তো মানুষকে ভালো করিবার নামে মানুষকে আফিম খাওয়ানো। যেটুকু বুঝিবার বাকি ছিল তাহা সম্পূর্ণ

হইয়াছে এই কয় মাসের স্বাধীনতার পরে—গ্রামোদ্যোগীদের বাণিজ্যোদ্যোগ দেখিয়া আর হোমরা-চোমরাদের কংগ্রেসাগ্রহ দেখিয়া।

সবিতার কাজের মোড় ঘুরিতেছে। তাহার পথের মোড় ঘুরিল। সে পথটা সে জানিত বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ। কিন্তু বহুজনের সেই পথ চলে জীবনের সংগ্রাম-ক্ষেত্রের দিকেই; অথচ সবিতা চলিতে চায় সংগ্রাম হইতে দূরে দূরে নিভৃতে নিরালায়, ছায়ায় ছায়ায়। আজ সেই পথই সবিতাকে শত সহস্রের কোলাহলমুখর যুগান্তরের এই পথের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। চিরদিনের ভয় কাটাইয়া, সংকোচ কাটাইয়া, সবিতা—আত্মগোপন যাহার ধর্ম, আত্মবিলাপ যাহার নিয়ম—একা আসিয়া দাঁড়াইল এই গোয়েন্দা আপিসে অমিতের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী! সে শুধু কি বিজয়ের মায়ায়? চেষ্টা করিয়া দেখা করিয়া গেল সে অমিতের সহিত,—শুধু কি অমিত-মন্নুর প্রীতি-প্রেমে? দেহের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন স্বচ্ছন্দ নির্ভয় সবিতা বুঝি আর কোনো দিন ছিল না। তথাপি নিজের ভাগ্য লইয়া বোঝাপড়া করিতেও চায় না আর সবিতা—আর কিছু জিনিয়া লইবার লোভ নাই। সে অনেক আগাইয়াছে, আরও আগাইবে—আরও।

তথাপি সবিতা বিশ্বাস করিবে অহিংসায়, আত্মদানে। তাহা ভারতবর্ষের চিরকালের কথা। শুধু তাই বলিয়াও নয়—উহা সবিতার নিয়তির নির্দেশ। না হইলে বিধাতা তাহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই এমন রিক্ত করিলেন কেন? তাই সবিতা মানিয়া লইয়াছিল এই আত্ম-সংকোচনেই তাহার সার্থকতা। মন্নুকে সে ভালোবাসিয়াছে—নিজের অগোচরে ভালোবাসিয়াছে; আর মন্নুও তাহাকে ভালোবাসিয়াছে নিজের অজ্ঞাতে। সেই ভালো-বাসাকে সে আজ স্বীকার করিল; কিন্তু স্বীকার করিল এই পৃথিবীর কর্মো-দ্যোগের মাঝখানে। ইহাকে মহৎ জীবনের পাথেয়রূপে স্বীকার করিবে, সহজ জীবনের উপকরণরূপে কামনা করিবে না।...

অনেক সংগ্রামে সবিতা জয়ী; কিন্তু বিজয়িনীর বৈভব সে চাহে না। জয়ের উন্মাদনা তাহার নাই। পৃথিবীর বিরুদ্ধে তাহার নালিশ নাই, ভাগ্যের

বিরুদ্ধেও সে চাহে না নতুন অভিযান।...

অনেক আগাইয়াছে—কিন্তু সে যে আত্মোন্মোচন চাহে না। তার মান আছে, লজ্জা আছে, ভয় আছে। হয়তো তাহাও একটু একটু করিয়া খসিয়া যাইবে। কিন্তু তবু সবিতার মনে থাকিবে ভারতীয় ঐতিহ্যের সূক্ষ্ম-স্থূল, বাস্তব-কাল্পনিক, বহু বহু মানসিক-আধ্যাত্মিক বন্ধন।

সে ইন্দ্রাণী নয়—বিজয়িনীর অভিযান চাহে না।...সে ইন্দ্রাণী নয়—বিদ্রোহের মিথ্যায় তাই সে দিগ্‌ভ্রান্ত হইবে না। বহুজনহিতায় চ বহুজন-সুখায় চ তাহার জীবন—

আর তাহাই তো এই জনতার মহাপথ, না অমিত?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল।

সাত

জোতির্ময় সেন অমিতের কাছে আসিয়া বসিয়া ছিল। বলিল, শুনলাম কাউকে ছাড়ছে না ওরা—

জ্যোতির্ময় পুরাতন কর্মী, অমিতের স্নেহভাজন। দুইজনে একসঙ্গে জেলে ছিল অতীতে, একসঙ্গে চলিয়াছে এই পথে।

অমিত বলিল, অন্তত আপাতত।

জোতির্ময় বলিল, আপনার কী মনে হয়—এভাবে কতদিন রাখবে।

কেন, আমরা তো বলি, —'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড'। তাই যদি হয় তা হলে হয় আমরা ক্ষমতা অধিকার করব, নয় আমরা শক্তি হিসাবে নগণ্য হয়ে যাব।

জ্যোতির্ময় আপত্তি করে, সে তো দুই চরম অবস্থার কথা বললেন। মাঝ খানে কি কিছু হতে পারে না?

অমিত বলিল, পারে বৈকি। এবং পারাই স্বাভাবিক। কারণ ও 'শেষযুদ্ধ' আজ বাধে নি—অন্তত একশ বছর ধরে তা চলেছে। শেষ যুদ্ধ হলেও ডিসাই-সিভ্ অ্যাক্‌শান-এর দেরি হতে পারে। তবে ডিসাইসিভ্ অ্যাক্‌শান্‌ও পৃথিবীতে শুরু হয়েছে—১৯১৭ থেকে অবশ্য সকল ফ্রণ্টে সমান জোরে তা বাধে নি এখনো, পৃথিবীর সর্বত্র সমান অবস্থাও নয়। যুদ্ধও শুধু এক কায়দায় চলে না।

জ্যোতির্ময় সেন একটু চুপ করিয়া রহিল। বলিল, আপনার কি মনে হয়—জেলে বসে থাকাটা ঠিক হবে? বাইরে কাজ তত এগিয়েছে কি?

অমিত হাসিল।—পাগল! কাজের এখনো কি?

ওঁরা বলছিলেন—আমরা যারা পাকিস্তানে ছিলাম তাদের দরখাস্ত করে, মামলা করে বেরিয়ে যাওয়া দরকার—'আমরা পাকিস্তানের লোক, ইণ্ডিয়ান ডোমিনিয়ন আমাদের ধরে রাখবে কেন?' সেরূপ কাজ কি ঠিক হবে?

অমিত বুঝিতে পারে না—আপত্তি কি ?

কেমন 'আবেদন-নিবেদনের' ভাব আছে না কথাটায় ?

থাকলই বা ? সত্যই তো তুমি পাকিস্তানের মানুষ, তোমার কাজ সেখানেই।

জ্যোতির্ময় শুনিয়া খুশী হইল না, চুপ করিয়া রহিল। তারপর আবার বলিল—অনেকটা নিজের কাছেই বলিতেছে হয়তো,—ঠিক কথা। কিন্তু পাকিস্তানের হাতে ওরা আমাদের দিলে তো আরও বিপদ। তারা ছাড়বেই না।...ছাড়লেই বা আমি পাকিস্তানে যাই কি করে ? থাকি কোথায় ?... করব কি ?—জ্যোতির্ময় ধীরে ধীরে অমিতকে জানায়, মিনতি এখানে, তারও অসুখ। শেষ পর্যন্ত তা টি-বি-ও সাব্যস্ত হতে পারে। কোথায় রাখব ওকে জানি না। সুজাতা বলছিল—ইন্দ্রাণী চৌধুরীকে অমিতদা বললে ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মেয়ে দুটোও তো আছে। টাকাই বা কোথা ? একটা কাজকর্ম কিছু না করলে আর চলে না।...এতদিন ওখানে শ্যালা ছিলেন, শাশুড়ী ছিলেন।— শহরে ছিল শ্যালার সাইকেল ও ইলেকট্রিক গুড্‌সের দোকান। এক সময়ে রাজনৈতিক কাজ-কর্ম করতেন মিনতির দাদাও, কাজেই আমারও এতদিন ভাবতে হয় নি। মিনতি আমাদের বাড়িতে থাকত না, থাকত ওর দাদার কাছে ; সেখানেই পার্টির কাজকর্ম করত। আমাদের দেশের বাড়িতে তো আর যাবার উপায় নেই। দাঙ্গার পরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তা ছেড়ে এসেছে। মিনতি থাকবে কি করে একা মেয়ে দুটি নিয়ে ? ওর দাদার ব্যবসাও আর চলে না—ভদ্রলোকরা চলে এল, শহরের খরিদদাররা কমে গেল, মুসলমানরা নতুন আস্‌ছে পাড়ায়, এখান থেকেও মালপত্র যায় না ; কাজেই সেই ব্যবসা-পত্র বিক্রি করে মিনতির দাদা চলে এসেছেন। তাঁদের বাড়িও অমনি দখল করে নিয়েছে পাকিস্তান সরকার। নয়নগড়ের ওদিকে একটা কাঁচা বাড়িতে আপাতত দুটো ঘর নিয়ে তিনি আছেন। কি করবেন ঠিক নেই... টাকাকড়ি শেষ হয়ে আসছে—দুচার মাস আর চলবে হয়তো...

শত সহস্র পরিচিত কাহিনী আর বহুপরিচিত দৃশ্যের মতোই একটি কাহিনী

ইহা অমিতের পক্ষে। 'ভদ্রলোকের রাজনীতি' এক মুহূর্তে পূর্ব বাঙলায় মেরুদণ্ড ভাঙিয়া ধ্বসিয়া গিয়াছে। সে রাজনীতি শুধু বিদেশী-বিরোধের উপরই আপনাকে পুষ্ট করিয়াছিল। অথচ সাহসের অভাব ছিল না, ত্যাগের অভাব ছিল না; সত্যই বীর্যময় মহৎ প্রকাশের আশ্চর্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে এই পূর্ববাঙলার স্বদেশী বিপ্লবীরা। আজ পূর্ববাঙলার সেই নর-নারী দেশ ছাড়িয়া পলাতক, পথে পথে অন্নহীন বস্ত্রহীন অসহায় মেরুদণ্ড-ভাঙা। জ্যোতির্ময় সেন, মিনতি সেন পর্যন্ত আর আজন্মের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার মতো ঠাঁই পায় না।

জ্যোতির্ময় বলিতেছিল, মিনতির মা কিছুতেই পাকিস্তানে যাবেন না। মিনতি যেত,...আমাকেও যেতে দিতে আপত্তি করত না,—কিন্তু নিজের শরীরের এ অবস্থায় গিয়েই বা করবে কি সে? যে অবস্থায় পড়েছি আমিই বা গিয়ে করব কি পাকিস্তানে?—রোজগার করতে হলে কলকাতাতেই থাকতে হয়। পাকিস্তানে আন্দোলন করতাম, ঠিক। ওঁরা বলছেন, সেখানেই থাকো। কিন্তু ওঁরা বুঝছেন না সেখানে আমি যাই কি করে এখন? মেয়ে দুটো আছে, খাওয়াই কি? রোজগার না করলে আর চলে না। মিনতিকেই কি বুঝোতে পারি আবার ফিরে যাবার কথা?—

শুধু কর্মক্ষেত্রই হারায় নাই, জ্যোতির্ময়ের আর দাঁড়াইবার ভরসাও নাই। অমিত তাহাতে আশ্চর্য হয় না। তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপন হইয়া গেল—বহুযুগের পরাধীনতাকে দূর করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, ইহাই ছিল জ্যোতির্ময়ের ব্রত, অমিতের ব্রত। সে জন্য তাহারা দেশের একটা জেনারেশনকে বলি দিতে চাহিয়াছে—নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছে। আজ ব্রতশেষে আর তাহাদের কাজ নাই। সেইদিন নাই, আর একদিন আজ, আর এক ব্রত—পুরাতন কর্মীরা তাই আজ মনে হয় অবান্তর। জ্যোতির্ময় বলে, আসলে ওর টি-বি নাও হতে পারে। ওর কেমন বিশ্বাস—শক্ত কিছু একটা অসুখ ওর হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারও দেখাতে চায় না। আর আমি কাছে না থাকলেই গোলমাল বাধায়; কারো কোনো কথা শুনবে না। করি কি এখন?—এ অবস্থায় ওকে ফেলে পাকিস্তানে যাই কি করে? নেতারা এসব বুঝতে

চান না—বললেন, 'যাদের সঙ্গে কাজ করেছ তারা এখনো সেখানে—পূর্ববাঙলার কৃষক। আর তুমি থাকবে এখানে? এ তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতা।'

অমিত বুঝিতে পারে। হয়তো তপনের সেই সমস্যাও অন্য দিক হইতে আসিয়া জ্যোতির্ময়ের জীবনে দেখা দিতেছে। জীবিকাক্ষেত্রে তপন দাঁড়াইয়া গিয়াছে,--সংসারেও ক্রমে দাঁড়াইয়া যাইবে হয়তো। দেশলক্ষ্মীর মজুরের ভাগ্যের সঙ্গে তাহার জীবন মিশিয়া যাইতেছিল—কিন্তু কে বলিবে তাহা কত দিনের জন্য? জ্যোতির্ময় সেনের জীবনও তো পূর্ববাঙলার কৃষকদের জীবনের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। সেদিনে জ্যোতির্ময় বারবার জেল খাটিয়াছে, কাজে লাগিয়াছে আবার। এমন আন্দোলন নাই যাহাতে জ্যোতির্ময় দশ বৎসর ধরিয়া তাহার জেলায় অগ্রণী হয় নাই। মিনতিও ছিল তাহার সঙ্গীই! সেই উপলক্ষেই তাহাদের পরিচয়, আর পরে বিবাহ। তবু এই তো আজ মিনতি ভাঙিয়া পড়িতেছে, জ্যোতির্ময়ও মেরুদণ্ডে ঘা খাইয়াছে। আর পারে না যেন সে। স্বাধীনতা আসিয়াছে—এবার তাহাদের আর প্রয়োজন নাই। অথচ প্রয়োজন আছেও। দেশবিভাগে বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইতেছে। ...হোক বাঙলা দুইখণ্ড, বাঙালী জন-জীবন তাহাতে খণ্ডিত হইবে এমন কথা নাই। তাহাদের ভাষা এক, গান এক, প্রাণ এক, স্বার্থও এক। ওরা কাজ করে। জ্যোতির্ময় খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে...জন আন্দোলনের অভাবেই সে নিরাশ্রয়। মিনতিও তাহাকে আজ খণ্ডিত করিয়া ফেলিতেছে। ক্লান্ত, ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত! জ্যোতির্ময়ের চোখ, মুখ সমস্তর উপর যেন অমিত এই ক্লান্তি-কাতরতা দেখিতেছে। কি উত্তর দিবে অমিত জ্যোতির্ময়কে?

'আজ আর-একদিন' জ্যোতির্ময়। সার্থকব্রত আমরা, এইবার ছুটি। গ্রহণ করিব সাধারণ মানুষের সাধারণ ব্রত, সংসার-গড়া, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া পরিবার প্রতিপালন, সমাজ-সেবা।—এই কি? অথবা, 'আর একদিন আজ, জ্যোতির্ময়, আর এক ব্রত—স্বাধীনতা নয় আর এবার, মানুষ-গড়া, making of men. হয়তো আরও দুই এক জেনারেশনের আত্মদান—তারপর মানুষের

নবজন্ম। ইহারই নাম 'শেষ যুদ্ধ'—মানুষের নবজন্ম চাও তো সে ব্রত গ্রহণ করো তুমি,—বা অমিত!'

'মানুষের নবজন্ম?'—কিন্তু মিনতির, তাহার কন্যাদ্বয়ের? আর জ্যোতির্ময়ের?

একই সঙ্গে বহুকণ্ঠে হর্ষধ্বনি উঠিল। বুলকন্ চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাহাদুর ট্রাম কা মজদুর।'

বিজয় বলিল, সবিতা মাসী বলেছিলেন—'হেঁটেই যাব।' তখন বুঝি নি তাঁর কথার অর্থ—ট্রাম বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শোনো, অমিত,—শোনো জ্যোতির্ময়-মিনতি, শোনো নতুন ব্রতের আহ্বান শোনো।

বুলকন্ শেষ যুদ্ধের নব রূপ দেখিতেছে।

বিজয় বলিল, এ সময়টা কি জেলেই কাটাতে হবে বসে বসে?

বসে বসে কাটাতে হবে কেন? লিখবে, পড়বে। তোমার তো কথাই নেই—একটু হাসিয়া বলিল অমিত,—কাগজ আছে কলম আছে, গ্রো মোর সাহিত্যিক ফুড্, ইঞ্জিনীয়ার্স অব হিউম্যান্ সোল্।

পরিহাস-স্বচ্ছ কণ্ঠে বলিলেও অমিত পরিহাস করে নাই। বিজয়ও পরিহাস মনে করে না। লিখিতে হইবে। লিখিবে বলিয়াই তো সে খেলা, ফোটো তোলা ছাড়িয়া এই কর্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা না হইলে লিখিবে কী? সে জানে কী? ভদ্র অবস্থাপন্ন বাঙালী পাড়ার ভদ্রলোকের জীবনযাত্রা, কলেজে-ইউনিভার্সিটির কোলাহলমুখর ছাত্রছাত্রী, তাহাদের বামপন্থী তর্ক কিংবা সাধারণ নিরপরাধ প্রেম-গুঞ্জন,—ইহাই তো বিজয়ের অভিজ্ঞতার জগৎ। তাহার দৈহিক দুর্বিপাকের পরে বন্ধুদের নিকট হইতে সে একটু দূরে দূরে থাকে। বরং ভাবে, এই শিক্ষিত বাঙালী যুবকের জগৎ কতটুকু? আর কতখানি ইহার মূল্য? দূরে মানব-সমুদ্রের গর্জন বিজয় শুনিতে পায় —ইহার মধ্য হইতেও। মহাকালের মন্থন যে তাহার ঘরের বাহিরেই শুরু হইয়াছে। জীবনের তরঙ্গ তাহাদের বুকের কাছে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

আজ কলেজে ধর্মঘট, কাল ছাত্রদের গুলির সামনে দাঁড়াইয়া ভাগ্যের মোকাবিলা করা, পরশু উনত্রিশে জুলাইর জন-প্লাবনে অনুভব করা জীবনের জোয়ার,—আবার হিন্দু-মুসলমানের রক্তারক্তি, দেশবিভাগ, দানবতার আস্ফালন: বিজয় লিখিতে গিয়া লিখিতে পারে না।—কবিতাও যেন ইশ্‌তেহার হইয়া উঠিতেছে। এই বিরাট মন্থনের সত্যকে সে কি তবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই? না। সে বুঝি উহা প্রত্যক্ষও করিতে পারে নাই। উহাকে আপনার করিয়া লইতে হইলে আপনাকে উহার মধ্যে প্রথম মিলাইতে হইবে—পরে আবার নতুন করিয়া পাইতে হইবে। বিজয় সেই আত্ম-নিবেদনের পথেই এখন অগ্রসর হইতেছিল দৃঢ় মৌন আগ্রহে—কিন্তু জানিয়াছে কি সেই সত্যকে? এখনো যে এই অভিজ্ঞতা ছাপাইয়া তাহার অন্তরের তলে জাগে সুন্দরের স্বপ্ন, আনন্দের আমন্ত্রণ, আর প্রেমের স্পর্শ।...প্রেম আসিয়া হানা দেয় প্রাণে, প্রেমের কবিতা লিখিতে চাহে মন।

বিজয় তাই হাসিয়া বলিল, কি দেখেছি, কি জেনেছি যে লিখব? ইনিয়ে বিনিয়ে মধ্যবিত্তের প্রেমের কবিতা লিখব? তা আর লেখা চলে?

অমিত হাসিয়া বলিল, প্রেম কিন্তু বড়লোকেরও নয়, মধ্যবিত্তেরও নয়,—মানুষের। প্রেমের কবিতা লেখা চলবে সর্বকালেই। কারণ, প্রেম সর্বকালেই থাকবে। তবে প্রেমেরও প্রকাশ বদলায়, প্রেমের কবিতার রূপও বদলাচ্ছে। তবু তা প্রেম, হয়তো গতিমান্ মানুষের প্রেম।

বিজয় বলিল: তবু যুগটা মোটামুটি প্রেমের কবিতার নয়, তা তো ঠিক?

অমিত তাহা মানে না। এ যুগটা মানুষের কবিতার, তাই প্রেমের কবিতারও। এ যুগটা জীবনের নব-অভ্যুদয়ের, অর্থাৎ সৃষ্টির; তাই সাহিত্যসৃষ্টিরও। তার রসটা মানব-রস। কিন্তু সন্দেহ নাই, আসিতেছে singing to-morrows। বিজয় কবিতা লিখিবে, সাহিত্য লিখবে। তাই কবিতার প্রাণবস্তু ও সাহিত্যের প্রাণবস্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে। "জীবনে জীবন যোগ করা...না হইলে মিথ্যা হবে গানের পশরা..."

দুই জনায় কথা হইতেছিল। এদিকে কে বলিল: সকলকেই নাকি জেলে

পাঠাচ্ছে, থানা হাজতে কাউকে পাঠাবে না। অমিত শুনিল, বলিল, বাঁচা গেল। থানার হাজতগুলি নরককুণ্ড—

কিন্তু আমাদের জিনিসপত্র এল না যে?—মেয়েদের কে একজন বলিল। বোধ হয় মঞ্জু। একটা শাড়ি-ব্লাউজও সঙ্গে আনি নি,—বলিয়া মঞ্জু বিজয়ের কাছে আসিয়া বসিল।

বিজয় একটু সরিয়া বসিল, হাসিয়া বলিল, চাও তো আমার একখানি ধুতি দিতে পারি, আর একটা হাফশার্ট।

ফাজলামো পেয়েছ? মাসীকে দেখে এবার সাহস বেড়ে গিয়েছে।—কলহে প্রবৃত্ত হইল মঞ্জু।

বে-ইমান!—ওদিকে বুলকনের গলা শোনা গেল। হামলোগোঁসে ঠিকানা নিলে, লেকিন এক বহিন্‌কো, ভাইকো শাড়ি কাপড়া আনালে না। বে-ইমান্ ই লোগ্—মালিককা কুত্তা! আপ্‌লোগোঁসে ভালো ভালো বাত্ বোলে, আপলোগ বোলেন— 'ভদ্দরলোক'। বে-ইমান্ আউর দাগাবাজ, কুত্তা—

বুলকনের তাহারা শ্রেণীশত্রু। বুলকন্ তাহাদের মুখের কথায় ভুলিবে না, রাজাই প্রত্যাশা করে রাজার কাছে রাজার ন্যায় আচরণ-লাভ—পরাজিত পুরুও তাহা প্রত্যাশা করে বিজয়ী সিকান্দরের নিকট। আর পায়ও। অমিত ভদ্রলোক আমরা, সে প্রত্যাশা করে ভদ্র-আচরণ গোয়েন্দা অফিসারের কাছে, দেয়ও চা, পায়ও। কিন্তু মজদুর বুলকন্? সে ভদ্রতা চাহে না, পায় না, গ্রহণও করে না।

'কুত্তা! মালিককা কুত্তা!

কে কাছে আসিয়া বসিল—কখন বিজয়-মঞ্জু তর্ক করিতে করিতে উঠিয়া গিয়াছে। অমিতের নিকট আসিয়া বসিয়াছে সুজাতা সেন—শ্যামলের আত্মীয়া সুজাতা। বয়সে অবশ্য সে অনেক বড়, নিঃসন্তানা বিধবা বাঙলা দেশের সেই জীবিকার্জিনী মেয়ে।

অমিতই প্রথম কথা বলিল—কি হবে এবার আপনাদের নার্সদের ধর্মঘটের ?

মাসখানেক যাবৎ 'সেবিকা সংঘের' নার্সদের ছোট একটা ধর্মঘট চলিতেছে। সুজাতার উপর তাহা পরিচালনার দায়িত্ব। সুজাতা বলিল, কি হবে, তাই তো বুঝছি না। আজ সাতাশ দিন—

আপনিও তো জেলে চললেন—নতুন যাচ্ছেন বুঝি ?

হাঁ, নতুন; কিন্তু সত্যই কি জেলে নেবে ? নিলে, ক্ষতি তো আর কিছু নয়—ঠিক এ সময়টা আপনি বাইরে থাকলেও হত, অমিদা ?

আমি ? আমি কি করতাম, বলুন ? আমি তো বাতিল মানুষ। অম্লশূল, স্বাধীনতা, দেশ-বিভাগ আর রক্তারক্তির টাল সামলাতেই বেসামাল।

না, আপনি বাইরে থাকলে অন্তত আমাদের কাজ হত।

কেমনতর ?—অমিত উৎসুক হইল।

দিন তিনেক হয় ইন্দ্রাণীদি এসেছেন কলকাতায়। আমি গেছলাম, কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি দেখাও করবেন না। বোধ হয় ইন্দ্রাণীদি চান—আপনি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আপনি ধর্মঘটের একটা মীমাংসার কথা বললে নিশ্চয় তিনি তা রাখবেন। হয়তো তাই তিনি নিজেও চান—

অমিত হাসিল, বলিল, আপনার এখনো এরূপ বিশ্বাস ? 'সেবিকা সংঘ' থেকে ওঁর এখন এত লাভ—মাসে শ পাঁচেক টাকা নিশ্চয়ই মুনাফা তুলছেন।

তা তুলুন। আপনার কথা ইন্দ্রাণীদি ফেলবেন না।

ইন্দ্রাণী অমিতের কথা ফেলিবে না ? অমিত নিজেকেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি তাহাকে বলিবে কী !

সুজাতা নীরবে ছিল, পরে বলিল, তাছাড়া, লোকে যাই বলুক—ইন্দ্রাণীদির লোভ টাকার প্রতি নয়। তিনি ক্ষমতা-প্রিয়,—ক্ষ্যাপা-মেজাজের, খামখেয়ালি। কিন্তু আমি অন্তত বলতে পারব না ইন্দ্রাণীদি মন্দ মানুষ—লোকে যাই বলুক। ব্রজানন্দ পালিত তাকে দিয়ে একটা অন্যায় কাজও করাতে পারে নি। বরং অনেক মেয়েকে ইন্দ্রাণীদি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে

বাঁচিয়েছেন। আসল কথা, তিনি ক্ষমতা-প্রিয়। সকলেই তাঁকে কর্ত্রী বলে মেনে চলবে—এই তিনি চান।—ব্রজানন্দই হোক, আর যে-ই হোক। কিন্তু টাকার লোভী নন।—আর ভালোও বাসতেন আমাদের ;—অন্তত আমাকে। তাই আপনি একবার গেলেই এ ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে যায়। কাল আপিসে এই জন্য আমি বসে ছিলাম।

অদৃষ্টের লেখা—অমিত হাসিয়া বলিল। কাল আপিসে যাই-নি…

অমিত বলিল না—আরও পরিহাস অদৃষ্টের। এমনি সময়ে এমনি সন্ধ্যায় কাল ইন্দ্রাণীরই জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল অমিত ইন্দ্রাণীর গৃহেই। আর আজ এই সময়ে সেই ইন্দ্রাণী হয়তো হাওড়ায়, চলিয়াছে দিল্লী। হয়তো মানু তাহার মাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

·

দিলীপ দত্ত বলিত : মানব চৌধুরী ছাত্র-আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে এসেছে। কিন্তু ইন্দ্রাণী এই কথা অস্বীকার করিবে। মানব তাহার মাতৃ-জীবনেই পাইয়াছে প্রকৃত সাম্যবাদের দীক্ষা। তাহার দল বরং তাহাকে সেই সুমহৎ উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। আর সে এই পথে গিয়াছে অমিতেরই জন্য—ইন্দ্রাণীরই শিক্ষায়।

মহাযুদ্ধের সূচনা সেদিন। একদিনের জন্য অমিত পৃথিবীর সমস্ত পরিচয়-কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রাণীকে আশ্রয় করিয়াছিল। পৃথিবীতে ইন্দ্রাণী ছাড়া এত সাহস কাহার আছে তাহাকে এই সময়ে আশ্রয় দেয়? ইন্দ্রাণী কোনো দলে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে সমাজবিপ্লবে। বিপ্লবের সেই জলন্ত শিখাতেই কি সে নিজেকে পারশুদ্ধ করে নাই—তাহার তপ্ত জীবনের রাত্রিদিন? স্বামী ইন্দ্রাণীকে মর্যাদা দেয় নাই; ইন্দ্রাণীও আপন তেজে স্বামী ছাড়িয়াছে, গৃহ ছাড়িয়াছে, আরাম ছাড়িয়াছে, আলস্য ছাড়িয়াছে। ইন্দ্রাণী সেই তেজেই নার্সের জীবিকা গ্রহণ করিয়াছে।—জীবিকার্জনের স্বাধীনতা চাই,—ইন্দ্রাণীর জীবনাদর্শে নারী-জীবনের আত্মবিকাশের প্রথম সোপান এই আর্থিক স্বাধীনতা। সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণী লইয়াছে আপন সন্তানকে মানুষ করিবার

সাধনা,—ইন্দ্রাণীর চিন্তায় নারী-জীবনের আত্মাধিকারের চরম পরীক্ষা তাহাতে। পুরুষ-চালিত সভ্যতার সমস্ত প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া নারী আপন ভাগ্য আপনি জয় করিবে। তাই ইন্দ্রাণী আর জেল হইতে ফিরিয়া লয় নাই—লইতে পারে নাই—রাজনৈতিক আন্দোলনের কোনে কর্মভার ; লয় নাই—লইতে পারে নাই—অমিতের সঙ্গে বিপ্লবের সহকর্মিণী হইবার দৈনন্দিন দায়িত্ব ; লয় নাই—লইতে পারে নাই—পথে পথে অমিতের সহকারিণী হইবার স্বচ্ছন্দ অধিকার—একান্ত যে অধিকার ইন্দ্রাণীরই, আর কাহারও নয়,—জানে ইন্দ্রাণী। সে তাহাদের সহযাত্রিণী বা সহকর্মিণী নয়, সহধর্মিণী। আপনার গৃহে সে তাই অমিতের সহযোগিনীদের আশ্রয় দিয়াছে, ভাবী কর্মিণীদের সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, হাসপাতালে তাহাদের নানারূপে জীবিকা-শিক্ষার সুযোগ দান করিয়াছে, তারপর নিজ গৃহেই স্থাপন করিয়াছে আবার সেই নূতন শিক্ষিতা নার্সদের বাস-কেন্দ্র। এবং সেই সূত্রেই যুদ্ধমুখে অমিতেরই কথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' বা 'নার্সেস্ হোম্' এবং এই 'সংঘারাম'—'নার্সিং হোম্'।

সেদিন মহাযুদ্ধের প্রথম রাত্রি। 'স্টেট্‌স্‌ম্যানের' বিশেষ সংখ্যার বৃহদাকার 'দি ওয়ার' শব্দ দুইটি হাঁকিয়া হাঁকিয়া তখন চৌরঙ্গীর ফেরিওয়ালারা শ্রান্ত হইয়া নিজেদের বস্তির ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। রাত্রি সাড়ে বারোটায় অমিত ইন্দ্রাণীর 'সংঘারামে' অর্থাৎ তাহার ফ্লাটের দুয়ারে আসিয়া মৃদু করাঘাত করিল। একটু জোরে করাঘাত করিলে কেহ বুঝি দেখিয়া ফেলিবে। উত্তেজিত অমিত জানে — পৃথিবীর মহামুহূর্ত আসিতেছে—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুভলগ্ন। স্বগৃহে ফিরিলে হয়তো রাত্রিশেষে পুলিশেরই কবলে তাহাকে পড়িতে হইবে ; আর জীবনের সুমহৎ পরীক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। কাহার নিকট অমিত আজ এইরাত্রে বিশ্রামের সুযোগ চাহিতে পারে ? আর কাহার নিকট আজ বিশ্রাম না গ্রহণ করিলে অমিতের জীবনের নিগূঢ় লগ্নটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে ?

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইল না। সে যেন প্রতীক্ষা করিয়াই ছিল। মানু ঘুম

ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল ; চোখের নিদ্রা তখনি নিঃশেষ হইয়া গেল। কেহ আর ঘুমাইল না—অমিত নয়, ইন্দ্রাণী নয়, মানবও নয়। সারারাত্রি বসিয়া কিশোর মানব মায়ের আর 'অমিত কাকার' তর্ক শুনিল। ইন্দ্রাণী বোঝে না—কেন অমিতেরা নেতাদের পিছনে পিছনে চলিতেছে? উহারা তো বিপ্লবী নয়, বরং বিপ্লবের শত্রু—মানুষেরও শত্রু। মানুষকে ইহারা মানুষের অধিকার দিতে চাহে না, মানুষকে শিখায় শুধু বশ্যতা। মন্ত্র পড়ে, টিকি নাড়ে, ধর্মের নাম করিয়া মানুষকে আরও অমানুষ করিয়া রাখিতে চাহে। ইহাদের সঙ্গে কোনো কাজ একযোগে করা যায়, তাহাও ইন্দ্রাণী মানিবে না।

অমিত তর্ক করিয়াছে,—ভুল তর্কও করিয়াছে। 'কংগ্রেস শুধু নেতাদের জিনিস নয়, তোমার আমারও। কাজটাই আসল কথা, স্বাধীনতার জন্য সম্মিলিত অভিযানই চাই।' কিন্তু অমিত তখনি বুঝিয়াছে—কর্মক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া ইন্দ্রাণী আপনার তেজ ও সাহসের তীব্রতায় আপনি অধীর হইয়া উঠিতেছে মতাদর্শকে কাযে রূপান্তরিত করিবার মতো অবকাশ না থাকিলে মতাদর্শই শুধু কাঁচা থাকে না, মানুষটিও হয়তো কাঁচিয়া যায়—যদি সে মানুষ ইন্দ্রাণীর মতো তেজস্বিনী ও মনস্বিনী না হয়।

কিন্তু মানু সে তর্কের কি বুঝিল, বলিল, অমিকা ঠিক কথা বলেছেন।

ইন্দ্রাণী হাসিল। অমিতের বাহুস্পর্শ করিয়া সপরিহাসে বলিল, তবে আর কি, তোমারই জিত—তোমার দলে যখন আমার ছেলে। তারপর আবার হাসিল, বলিল, তবু, পরাজয় মানিবে না। কিন্তু ইন্দ্রাণী, সে তো শুধু মানুর মা নয়, সে ইন্দ্রাণী।

মানুই বা পরাজয় মানিবে কেন? সে তো ইন্দ্রাণীরই পুত্র। অতএব তোমাকে না পাই মানবকে পাব।—অমিত হাসিয়া বলে।

অপরাজিতা ইন্দ্রাণী তারপর যখন পার্শ্বের ঘরে আপনার বাক্স-পেটরা টুকি-টাকির মধ্যে মেজেয় শুইয়া পড়িল তখন এঘরে তাহাদের শয্যায় পাশাপাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে অমিত ও মানু; আর ওদিকে পূর্বের আকাশে মহাযুদ্ধের রক্তপ্রভাত ফুটিয়া উঠিতেছে।

সেই রাত্রি হইতে মানব ছিল অমিতের দূত। গোপন সঞ্চরণের দিন তখন সমাগত, অমিতের গুপ্ত আশ্রয় হইতে গোপন সংবাদ সে নানা ঘাঁটিতে বহন করিত।

তারপর মহাযুদ্ধ মোড় ঘুরিল। এবার ফাটল দেখা দিল অমিত-ইন্দ্রাণীর জীবনে। দুইজনে এবার যখন দেখা হইল তখন ভারতের বায়ুতে বায়ুতে কানাকানি : বিদ্রোহী দেশ রেল লাইন উপড়াইয়া দিয়াছে, টেলিগ্রামের তার কাটিয়া ফেলিয়াছে, আগুন জ্বলিয়াছে। ইন্দ্রাণীর চক্ষেও তখন একই সঙ্গে আগুন আর আবেগ। অমিতকে সে বলিল, নেতারা জেলে রুটি-মাখন ধ্বংস করুক, কিন্তু জনতা নিয়েছে বিপ্লবের ভার। তাকে আর কেউ এবার বাধা দেবার নেই—গান্ধীজী না, কংগ্রেস না। এসো, অমিত, এসো—তুমি আমার চিরসহযাত্রী জন্মে-মরণে—এসো এই বিপ্লবের পথে, আমাকে তুমি এগিয়ে নিয়ে যাও!

কিন্তু অমিত অটল—ফ্যাশিস্তদের ধ্বংস না হলে সভ্যতাই ধ্বংস হবে। সে বলে, বিপ্লবের পথ সরল রেখায় নয়, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর আবেগ দৃপ্ত আত্মাভিমানে পরিণত হইল : বিপ্লবের পথ ইন্দ্রাণীর অত অপরিচিত নয়, অমিত।—একবারের মতো তীব্র হইল তাহার কণ্ঠ, তার পর আবার তাহা আপনার সবল স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশিত হইল।—তোমার নাম করেই একথা বলতে পারে ইন্দ্রাণী—সে অমিতের সাথী।

এক মুহূর্তের মতো অমিতের স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাহার স্কন্ধে এলাইয়া পড়িতেছিল ইন্দ্রাণী।

মুখে হাসি ফুটিল, চোখে ফুটিল লীলা-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের কমনীয় জ্যোতি—ইন্দ্রাণী তোমাকে চায় বলেই বিপ্লবকে ভুলতে পারে না। ফিরে এল।—পরক্ষণেই সচেতন ব্যক্তিত্ব আপনাকে সজ্জিত করিল, সচেতন ভাবে বিজয়-অভিযানে আপনাকে নিয়োজিত করিল। ব্যক্তিত্বময়ী ইন্দ্রাণী আপনার ব্যক্তিত্বকে যেন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিল। সভ্যতাকে যে পুরুষ-স্বভাব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আপনার পরুষ-হস্তে [illegible] করিয়াছে আর

বিমর্দিত করিয়াছে চিরক্রন্দ্যমান নারীহৃদয়কে,—তাহার সমস্ত সুকুমার বৃত্তি, মায়া মমতা স্নেহ প্রেমকে সম্মান করিতে ভুলিয়া গিয়াছে,—ইন্দ্রাণী কঠিন জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়া সেই পুরুষ-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়াছে—আপন সত্তায়। কিন্তু জাগিলেও শুধু আপন সত্তায় সে স্থির হইতে পারে কই? চির-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই পুরুষকে টানিয়া আপনার কুক্ষিগত করিয়া না ফেলিতে পারিলে কোথায় ইন্দ্রাণীর নারীসত্তার স্বস্তি?—না, না, ভালোবাসায়ও ইন্দ্রাণী আত্ম-বিস্মৃতা নয়; ভালবাসিয়াও ইন্দ্রাণী তাই আত্মাভিমানিনী।

ইন্দ্রাণীর দেহের উদ্ভাসে, মুখের উল্লাসে, চোখের দীপ্তিতে যেন এই কথাই ফুটিতেছে: তুমি, অমিত, তুমি,—ইন্দ্রাণীকে যে স্বীকার করিয়াছ,—অর্থাৎ ইন্দ্রাণীই যাহার কাছ হইতে আপন শক্তিতে আদায় করিয়াছে নিজের স্বীকৃতি—সেই তুমি, এই তেজোময়ী দীপ্তিময়ী নারীসত্তার সঙ্গে আপন সত্তাকে মিলাইয়া দিয়া কি সার্থক না হইয়া পারিবে আজ?—আজ, বিয়াল্লিশের বিদ্রোহাগ্নির সম্মুখে, যখন ইন্দ্রাণী আপনার ঘর ও সংসার আবার বিপন্ন করিয়া তোমাকে ডাক দিতেছে সেই মহোৎসবে? তাহার সঙ্গে তুমি সেই অগ্নিদীক্ষা নিবে না, এই অগ্নিময়ী নারীসত্তার সম্মুখে অবনত না হইয়া থাকিতে পারিবে?

ইন্দ্রাণীর চোখের এই দৃষ্টিও অমিতের অচেনা নয়। এই তেজ, এই অগ্নিশুদ্ধ দীপ্তি, অমিতের চিরদিনের পরিচিত।—স্বাগত। এই অপরাজেয় নারীসত্তাকে স্বাগত করিয়া অমিত গর্বিত। তবু অমিতের নিকটে অগ্রাহ্য এই ক্ষমতামত্ত দৃষ্টি—এই মুহূর্তে; অগ্রাহ্য এই মুহূর্তে সেই আত্মসচেতনার আবেগময় আহ্বান; অগ্রাহ্য এখন ইন্দ্রাণীর পুরুষ-স্বভাব প্রতিদ্বন্দ্বী অহঙ্কারোদ্ধত সত্তার এই সমুদ্রোচ্ছ্বাস—অমিতের চির উদ্‌গ্রীব-সত্তার তটে।

নিয়তির মতোই অনিবার্য নিয়মে সে রাত্রির মিনিট, প্রহর বহিয়া গেল। অহঙ্কার কখন অভিমানে পরিণত হইল, তারপর আবার পরিণত হইল অনুনয়ে: অমিত, অমিত, তুমি তোমার দেশকে ভালোবাসো, ভালোবাসো তার স্বাধীনতা। আজ যখন তোমার দেশের মানুষ বিপ্লবের মুখে তখন তুমি রহিবে কোন্ 'অক্ষোর' চিন্তায় মগ্ন?

করিতে হইয়াছে,—অথচ আত্ম-গোপন তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু দায়িত্ব তাহাকে পালন করিতেই হইবে;—সাহস, শক্তি, চতুরতা দিয়া ইন্দ্রাণী আশ্রয়কামী গোপন কর্মীদের ঘিরিয়া রাখিয়াছে। পুলিশের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে রহিবে ইহাই তাহার স্পর্ধা; কিন্তু দৃপ্ত মস্তকে তাহা করিতে গেলে আর এই 'সংঘারামের' গোপন-আশ্রয়-কেন্দ্রটি অক্ষুণ্ন থাকিত না। তখন কোথায় যাইত তাহাদের ট্রান্সমিটার, কোথায় যাইত তাহাদের গোপন মুদ্রণশালা, গোপনে মুদ্রিত ইশ্‌তেহারের পাহাড়?—পুলিশের চোখে ধূলি দিবার জন্যই ইন্দ্রাণী তাই প্রথম দিকে যোগাইয়াছে—ডেস্টিটিউট্ হোমের হাসপাতালে সেবিকা। সেই সূত্রে গ্রহণ করিয়াছে ডেস্টিটিউট্ হোমের হতভাগিনীদের অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায়। তাহার ক্রোধ আর বিদ্রোহ নানা 'হোম'-পরিচালক সমাজ-নেতাদের ঘৃণিত বৃত্তিতে আকণ্ঠ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল। ব্রজানন্দ পালিত তখন দুইটি ডেস্টিটিউট্ হোমের ডিরেকটার, চারটা 'ফ্রি কিচেনের মালিক'। ক্ষমতা ও মুনাফা তাহার চার-চারটা বড় ব্যবসায়ের ডিরেকটারের অপেক্ষা কম নয়। কারণ, সে কংগ্রেসম্যান; সে বিপ্লবী, স্বদেশীর প্রচারক; সে কর্পোরেশনের বে-সরকারী মুরুব্বি—এবং আগস্ট বিপ্লবের গোপন অর্থ-সংগ্রাহক। ঘৃণায় ইন্দ্রাণী জ্বলিতে থাকে।

জেল হইতে ভুজঙ্গ সেন ইন্দ্রাণীকে জানাইয়াছে ব্রজানন্দের এই মন্বন্তরী ব্যবসাদারিটা বিদ্রোহেরই আবরণ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। ইন্দ্রাণী তাহা অস্বীকার করিল, নীরব রহিয়াছে। ইহাও এই পর্বের বিদ্রোহের নির্মম নিয়তি—তেতাল্লিশ আর পঁয়তাল্লিশের। সহিতে না পারিলেও এ ছলনা সহিতে হইবে। সেদিন ইন্দ্রাণীও নীরব রহিয়াছে—দর্পিতা, খড়্গের মত উদ্যতা ইন্দ্রাণী। ব্রজানন্দের মেয়ে-ব্যবসার তুলনায় বিশু চাটুজ্জের প্রণয়-প্রলাপ ইন্দ্রাণীর নিকটে তেমন কিছুই নয়—আর রাও-জীভাইর অজস্র প্রণয়-পত্র ইন্দ্রাণীর উদ্দেশ্যে। ইন্দ্রাণী তাহাতে আর কত জ্বলিবে ঘৃণায়? সে বুঝিল, নারীর একটা রূপই বুঝি উহারা চিনিয়াছে। নারীর সে রূপ মিথ্যা নয় ইন্দ্রাণী তাহা শতবার স্বীকার করিত। স্বীকার করিত নিজেরও

এ যেন অমিতের মনের একাংশেরও দাবি। কিন্তু ব্যর্থ সেই নিবেদনও। 'মস্কো' কেন, মানুষ তাহার স্বপ্ন।

স্থির মৃদু কণ্ঠে অমিত বলিল, জটিল এ জীবন, ইন্দ্রাণী। জটিল কর্তব্য-সংকটে তোমার অমিত দেখেছে স্বদেশাত্মাকে, দেখেছে বিশ্বাত্মাকেও। অমিত জানে মানুষের ইতিহাসের বক্র-তির্যক পথে আজকার মতো করতালি পাবে না এই অমিতেরা, তবু বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না অমিত।

ইন্দ্রাণীর ঠোঁট কাঁপিতেছিল, কথা ফুটিল না। কিন্তু কি যেন একটা বুকের মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সে চোখ বুজিয়া রহিল, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া রহিল। তারপর অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া হাসিল—যেন কিছুই ঘটে নাই। বলিল, অমিত, ইন্দ্রাণী চিরদিনই ইন্দ্রাণী—বিদ্রোহিনী। হোক্ এই বিদ্রোহ নির্বোধ স্বদেশীয়ানার, তবু যেই পথে বিদ্রোহ সেই পথে আমি। মনে রেখো এ কথা—যদি মনে পড়বার মতো হয় তা কোনোদিন।

একটা ছেদ পড়িয়া গেল সে রাত্রিতে ভাবে, কর্মে;—আর জীবনেও নহে কি?

অমিতের পরিচালনা হইতে চ্যুত হইয়া বালক মানব সেদিন ছাত্র-বন্ধুদের আশ্রয়-সন্ধানে অগ্রসর হইতে চাহিল। তাই তখন সে অগ্রসর হইল দিলীপদের দিকে। ইন্দ্রাণীর তাহা অগোচর রহিয়াছে।

উপায় ছিল না—বিদ্রোহিনী ইন্দ্রাণী তখন গোপন বিদ্রোহের সহায়তায় আত্মনিয়োগ করিল। সুজাতা তখন তাহার 'সেবিকা সংঘে' সদ্য-পাঠোত্তীর্ণা সহকর্মিণী। অমিতদেরই পরিচয়ে ইন্দ্রাণী তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে এখন তাহাকে আপনার সহযোগিনীর দায়িত্ব দিল। মিনাও থাকে দিদির সঙ্গে—দিদির ঘরেই 'সংঘারামে'। কিন্তু মিনা তখনি ছিল দিলীপদের ছাত্রী-সংঘের মেয়ে।

ইন্দ্রাণীকে কঠিন দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। নানা কর্মিচক্রের সে গোপন আশ্রয় হইয়াছে। তাই ইন্দ্রাণীকে কথায়-আচরণে আত্ম-গোপন

এই বিশিষ্ট রূপ—সে পুরুষ-হৃদয়-বিজয়িনী। স্বীকার করিত বলিয়াই শতবার সে দেখিয়াছে আরশিতে নিজের মুখ, নিজের চোখ, নিজের চিবুক, বাহু, কর। নাকের পার্শ্বেকার ক্রম-গভীর রেখাটিকে পর্যন্ত মসৃণ সযত্ন হস্তাবলেপে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছে;—চাহিয়াছে বুঝিতে, এখনো সে পুরুষ-হৃদয়-রঞ্জিনী। কিন্তু তবু ইন্দ্রাণী জানে আরও বড় সত্য সে—সে শুধু নারী নয়, সে মানুষ। সে শুধু নারী-মাংসের একটি মোহন মধুর স্তূপ নয়,—সে এক মানব-সত্তা,—সে এক সন্তানেরও মাতা। আর শুধু তাহাও নয়,—স্বতন্ত্র এক সত্তা সে, সে ইন্দ্রাণী।

তাহার পৃথিবীর চরম সত্য তো ইহাই—সে ইন্দ্রাণী, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। পুরুষের সহকারিকা সে নয়, সহকার-আশ্রিতা লতা নয় সে, সে স্বয়ংসম্পূর্ণা। ইহারা কি মানুষ—এই বিশু চাটুজ্জে আর রাওজীভাই—যে ইহাদের দিকে ইন্দ্রাণী ফিরিয়া তাকাইবে? আর, এই নিরন্ন নারীর দেহ-ব্যবসায়ী 'স্বদেশী' ব্রজানন্দ—সেও মানুষ?

মানুষ তবে কে?—ইন্দ্রাণী নিজেকে জিজ্ঞাসা করে? অমিত? তাহার অমিত—যে একটা মন্ত্রের উপাসক, বলিতে শিখিয়াছে 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ'।

সমস্ত পুরুষ জাতিরই উপর ইন্দ্রাণীর ঘৃণা ধরিয়া গেল। ইন্দ্রাণীর মন আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিল সেই ঘৃণায়। অথচ এই ব্রজানন্দ-রাওজীভাই প্রভৃতিদের সহায়তায় ইন্দ্রাণী ক্রমে যুদ্ধের দিনে তাহার 'সংঘারামে' দেশীয় ধনিক-গোষ্ঠীর রোগ-সেবার ভার লইয়াছে। অন্যদিকে তাহার 'সেবিকা-সংঘ' কলিকাতায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ফ্লাট ছাড়িয়া সমস্ত বাড়িটা ইন্দ্রাণী আয়ত্ত করিল, তাহার শাখা বিস্তার করিল মধ্য কলিকাতায়; সুজাতাকে দিল উহার ভার। দেশে নার্স নাই,—ফিরিঙ্গী নার্সরা যুদ্ধে গিয়াছে,—'সংঘারামই' দেশের ধনিকদের ভরসা—পীড়িত ও স্বচ্ছল এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর এখন 'নার্সিং হোম' না হইলে চিকিৎসা চলে না। অন্যদিকে সেই পুরুষ-কবলিত গলিত সভ্যতার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া ইন্দ্রাণী আরও বুঝিল—'মানুষ জন্মিয়াছিল মুক্ত স্বাধীন, মানুষ সর্বত্র আজ শৃঙ্খলিত।' সর্বত্র, সর্বত্র, সর্বত্র।

কি এ দেশে কি বিদেশে, কি আমেরিকায় কি সোভিয়েট দেশে,—সর্বত্র শৃঙ্খলিত মানুষ। এবং কোনো শৃঙ্খল মানে না ইন্দ্রাণী—সমাজের না, রাষ্ট্রের না, প্রেমেরও না।

না, কাহাকেও ইন্দ্রাণী শৃঙ্খল পরাইতেও চাহে না। স্বামীকে না, পুত্রকে না, প্রিয়কেও না।

যুদ্ধ শেষ হইল। বি-এস-সি ক্লাসের দুয়ার হইতে মানব বলিল, সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িবে, এবং কলেজ বোর্ডিং-এ থাকিবে। ইন্দ্রাণী বিস্ময়ে হতবাক্ হইল। কিন্তু বাধা দিল না—বাধা সে কেন দিবে ? স্বাধীন সত্তায় স্বতন্ত্র হইতে চাহে বুঝি মানব ? সে স্বতন্ত্র হইবে, এবার আপন জীবন রচনা করিবে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর জীবন হইতে কি তাহার মানু এইবার বিদায় লইবে ? এই কি ইন্দ্রাণীর মাতৃ-তপস্যার সার্থকতা ?—এত শূন্যময় কি সেই সার্থকতা ? এত নিশ্চল অন্তহীন একটা গহ্বরের মতো, এমন ছেদহীন একটা অন্ধকারের মতো ? শূন্যগৃহ যেন ইন্দ্রাণীরও হৃদয়ের শূন্যতাকে এই ভাবে অতলস্পর্শী ও অন্তহীন করিয়া তুলিল।

ইন্দ্রাণী তাই দিল্লী চলিল। শরণার্থীদের সেবার ভার গ্রহণ করিতে তখন তাহাকে যুদ্ধকালীন 'রোগী' বন্ধুরা ডাকিয়াছে। সেখানে বসিয়া সে জানিল মিনাকে কেন্দ্র করিতেছে মানুর জীবন—যে মিনা সুজাতার বোন, অতি সামান্য একটা আঠার-উনিশ বৎসরের মেয়ে—রূপে সামান্য, বিদ্যায় সামান্য, ব্যক্তিত্বে সামান্য। অথচ স্পর্ধা তাহার সে ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতে চাহে। সেই মেয়ে মানুকে মোহগ্রস্ত করিল —অসামান্যা ইন্দ্রাণীর অসামান্য পুত্র যে !

ইন্দ্রাণী অনেক কথা শুনিল। কিন্তু জানিল না তাহার মানু আপনাকে কিরূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে। কিছুতেই মানু মানিতে পারে নাই তাঁহার মাতা কোনো নারীরই নারীত্বের অপমান সহিতে পারে। তবু 'ছাত্রী-সংঘের' মেয়েদের কানাকানি সে জানিত—স্বাধীন, অবাধগতি ইন্দ্রাণী, ভাটিয়া মারো-য়াড়ীদের নার্স জোগাইবার ব্যবসায়ে ধনিকলালসা পরিতৃপ্ত করিয়া, ও ব্রজা-

নন্দের ডেস্টিটিউট্ হোমে হতভাগিনীদের আশ্রয় দিবার নামে ডেস্টিটিউট্ হোমের ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়াই আপনার 'সেবিকা সংঘকে' প্রসারিত করিয়াছে।

কোথায় কি ঘটিতেছে অমিত জানিত না। কলিকাতার ভ্রাতৃমেধে তাহার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। তারপর আসিল দেশবিভাগ। শুধু মন্ত্র পাঠের মতো বলিয়া লাভ কি সবই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত?—এ যে বহু বহু শতাব্দীর প্রতিশোধ—'এ আমার এ তোমার পাপ'। ইন্দ্রাণী দিল্লীতে—উচ্চ-কোটির কর্তৃমহলে তাহার পরিচয় কম নয়! শরণার্থী সেবায় সে যখন ভার লইল অমিত তখন বরং খুশীই হইয়াছে। অমিত সংবাদ পায় নাই দিল্লীতে মানুর জন্য একটা মার্কিনী বৃত্তিও ইন্দ্রাণী সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার "কংগ্রেসী-বিদ্রোহীদের" সহায়তায়। মানু তাহা বিনা প্রশ্নে বর্জন করিল। অজস্র মিথ্যায় অতিরঞ্জিত হইয়া ইন্দ্রাণীর কলঙ্ক অবশেষে ইন্দ্রাণীর 'সেবিকা-সংঘের' মধ্যে ধর্মঘটের আকারে দেখা দিয়াছে। সুজাতারা সেই ধর্মঘটের নেতৃত্ব লইয়াছে। আর সেই ভূমিকম্পে ভাঙিয়া চূর্ণ চূর্ণ হইতে বসিয়াছে এখন ইন্দ্রাণীর 'সংঘারাম'। অনেকদিন পরে হঠাৎ আবার সেই সুপরিচিত অক্ষরের নীল একখানা খাম অমিতের হাতে আসিয়া পড়িল—টেবিলের উপরে কাল রাত্রিতে তাহা পড়িয়াছিল। পত্রের ক্ষুদ্র অবয়বে সেই পুরাতন ইন্দ্রাণীর স্বাক্ষর: 'অমিত, ইন্দ্রাণীকে মনে পড়ে?—সে কিন্তু তোমাকে মনে করে বসে থাকবে এই দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যাটিতে···আসবে?'

হোলির আকাশে কাল লাল থালার মতো চাঁদ উঠিতেছে তখন,—ফিরিয়া আসিল ইন্দ্রাণী মিসেস সেন-চৌধুরীর বাড়ি হইতে।

দেরি করিয়ে দিলেন মিসেস সেন-চৌধুরী। ইন্দ্রাণী উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—যেন ওঁরই কেবল সময় নেই আর সময় আছে আমাদের সকলেরই।

তোমার সময়ের অভাব নাকি ইন্দ্রাণী? তা হলে কি উঠব?—অমিত পুরাতন স্বরে পরিহাস করিল।

ইন্দ্রাণীও ছাড়িল না।—সময়ের অভাব নিশ্চয়ই; কিন্তু সকলের সম্পর্কে নয়। অন্তত অভাব নাই অমিতের সম্পর্কে ইন্দ্রাণীর সময়ের।

অনেক কাল পরে অনেকদিন আগেকার মতো সেই পরিহাস। তেমনি কণ্ঠ, তেমনি দৃপ্ত; প্রস্ফুট চক্ষে তেমনি ঔজ্জ্বল্য আর মদির মাধুর্য। কিন্তু অমিতের কেমন হঠাৎ সংশয় হইল—বুঝি ইহা বিশেষ উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত। এই কণ্ঠস্বর, এই চাহনি, এই নুইয়া-পড়া হাতের শ্লথ সুন্দর স্পর্শটি স্কন্ধে—ইহার মধ্যে কি সেই একান্ত নির্ভরতা আছে? না,—ইহা বহু-বহু অভ্যস্ত প্রাণ-লেশহীন আপ্যায়নের একটা মামুলী ভূমিকা মাত্র?

অমিত স্মিত হাস্যে বলিল, অমিতের সময়ের মেয়াদ কিন্তু ফুরিয়ে এসেছে। তাকে যেতে হবে এবার দলের চাকরিতে।

সত্য কথা। কিন্তু সেই সত্য অমিত আজ রক্ষা করিবে না, ইহাও সত্য। তথাপি ইহাই সে ইচ্ছা করিয়া বলিল। আর ইন্দ্রাণীরও তাহাতে আঘাত লাগিল। একবার তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিল, খেয়ে যাবে না, অমিত? আমি যে তোমাকে খাওয়াতে-খাওয়াতে গল্প করব আজ।

সংশয় যেন টিঁকে না—এই তো সেই ইন্দ্রাণী! কিন্তু অমিত নিঃসংশয় হইতে পারিল না। অথচ সাধ্য হইল না বলিবে, 'না'। বরং বলিল, তবে বহুদিনের মতো তোমার হাতের রান্নাই আবার হোক অমিতের কাজের তাড়নার উপর জয়ী।

ইন্দ্রাণী হাসিল; কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিল না। পরিহাস তো নয়, ইন্দ্রাণীকে অমিত উপহাস করিতেছে কি?

ইন্দ্রাণীই একটু পরে কথাটা তুলিল: মিনা সেনকে চেনো তুমি অমিত?

না।—সত্যই অমিত চিনিত না।

সুজাতা সেনের বোন—তোমাদের সুজাতা সেন। যাকে আমি মানুষ করেছিলাম তোমার কথায়। আর যাকে আমি করেছিলাম—আমার দক্ষিণ হস্ত।

অমিতও তৎক্ষণাৎ সরাসরি বলিল, আর আজ যে এখন নার্সদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়াক!—সংক্ষেপে তীব্র কণ্ঠে বলিল ইন্দ্রাণী।—শক্তি থাকে দাঁড়াক। শক্তি ছিল বলে আমি আপন রক্ত দিয়ে গড়েছি এই 'সেবিকা-সংঘ' ;—সে কাহিনী তুমি জানো, অমিত। ইন্দ্রাণী প্যারাসাইট নয়, আপন শক্তিতে আপন ভাগ্যকে সে জয় করেছে; আপন হাতে গড়েছে সে এই সেবিকা-সংঘ। ভাঙুক তা ওরা যদি পারে ধর্মঘট করে – যাদের নিজ হস্তে আমি এই গৃহে দিয়েছি বাসস্থান, অন্নজল।—কিন্তু এই চোরাগোপ্তা আঘাত কেন? এই গুপ্ত হত্যা?

অমিত বুঝিল না। বলিল, গুপ্ত হত্যা?

ইন্দ্রাণী উত্তর না দিয়া বলিল: মিনা সেনকে চেনো? চেনো না? তোমাদেরই দলের মেয়ে সেও। এইখানে—এই ছাদের তলায় বসে – তাকে দিয়ে মান্নুকে ধরার জন্য ফাঁদ পেতেছিল তোমাদের সুজাতা সেন।

অমিত এবার কথাটা বুঝিল, বলিল, বেশ। তারপর?

তাদেরই পরামর্শে সেবার মান্নু বোর্ডিং-এ চলে গেল। মান্নুর মা তাতে আপত্তি করে নি। মান্নু চায় মিনাকে—তাতেও বাধা দিত না মান্নুর মা। ব্যক্তিগত মতামতকে শ্রদ্ধা করতে জানি আমি; আর পারব না শ্রদ্ধা করতে মান্নুর ব্যক্তিত্বকে? কিন্তু সে চাপটা এমন স্থূল হাতে দিতে গেল কেন সুজাতা সেন? একটা ধর্মঘট বাধিয়ে দিলেই ইন্দ্রাণী চৌধুরী জব্দ হবে— আর মিনা ও মান্নুর বিবাহবন্ধনে সম্মতি দেবে, এমনি মানুষ নাকি ইন্দ্রাণী?

অমিত বলিল, কিন্তু সম্মতির জন্য এরূপ চাপের প্রয়োজন ছিল কি? তুমি তো সম্মতই ছিলে ওদের বিবাহে।

'বিবাহে?' কারো বিবাহেই আমার সম্মত হবার প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষ করে অবিশ্বাস করি তোমাদের "পবিত্র বিবাহ-বন্ধন"—যা আমি ভালো করেই জানি।

স্বররই সেই অভিজ্ঞতা! কিন্তু ইন্দ্রাণী স্বর নয়—বিদ্রোহিণী। বিক্ষোভে বিদ্রোহে সে বিভ্রান্তা।

অমিত হাসিয়া উঠিল।

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ হইল।—হাসলে যে অমিত? বিবাহের তুমি কি জানো।

বিশেষ না। তবে তোমার এ ক্রোধ দেখলে হাসি পায় না কি?

তা পেতে পারে তোমার। ঘটকালিই যখন তোমাদের দলের প্রোগ্রাম।

অমিত আবার হাসিল।—সেই ভরসাতেই তো এ দলটা আঁকড়ে আছি। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়।…জানো তো অমিতের নিয়তি।

'নিয়তি'!

—দশ বৎসরের পার হইতে অবিস্মরণীয় একটা কথা আবার ইন্দ্রাণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এই কলিকাতা শহরের এক সন্ধ্যায় ফুটপাতের উপরে পথ-প্রদীপের আলোতে সেদিন ইন্দ্রাণী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিল। আর অনেক অনেক অবিস্মৃত বৎসরের সমস্ত স্মৃতি মন্থন করিয়া অপ্রত্যাশিত একটি কণ্ঠস্বর বাজিয়া উঠিয়াছিল সদ্য-কারামুক্ত অমিতের কর্ণে —'অমিত'! তারপর সেই জন্ম-জন্মান্তরের পারের ডাকের মতো ওই ডাক মূর্তি ধরিয়া ওঠে একটি গানবীতে—'ইন্দ্রাণী'!—অমিত সেই মুহূর্তে জানিল—ইন্দ্রাণী তাহার নিয়তি। আজ দশ বৎসর পরে সেই কথা অমিতের মুখে? কিন্তু তাহার মুখে সেই চিন্তা-সংহত আবেগ-আগ্রহ কোথায়? অমিতের মুখে আজ ইন্দ্রাণী দেখিতেছে একটা পরিহাস-তরল হাস্য!

অমিত হাসিয়া বলিল, নিয়তি বৈ কি—নিয়তির অভিশাপ!

অভিশাপ, অমিত?—ক্ষোভে বেদনায় এবার ইন্দ্রাণীর বুক মথিত হইল। আবার তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল।—তোমার জীবনে ইন্দ্রাণী অভিশাপ বহন করে এনেছে!

অমিত বলিল, ইন্দ্রাণী নয়;—নিয়তি। ইন্দ্রাণী যা এনেছে, ইন্দ্রাণী তা জানে। কিন্তু ইন্দ্রাণী যা গ্রহণ করতে পারে নি, তা জানে না ইন্দ্রাণী।

কি গ্রহণ করতে পারে নি ইন্দ্রাণী?

মানুষকে। মানুষকে সে গ্রহণ করতে পারে নি। সে নিজেকে দান করতে পারে নি আপন সত্তার বাইরে। আর তাই সে অমিতকেও গ্রহণ করতে পারে নি—তার আপন সত্তার মধ্যে।

ইন্দ্রাণী স্তব্ধ, বিমূঢ়। অমিতের চোখের দিকে সে তাকাইয়া রহিল। অনেকক্ষণ,—অনেকক্ষণ। তারপর স্থির, গর্বিত কণ্ঠে বলিল,—এবং হাসিল,—

শোনো, অমিত,—ইন্দ্রাণী দানের বস্তু নয়। সে আপনার সত্তায় আপনি সম্পূর্ণ। আর মানুষকেও সে নিজ-নিজ সত্তায় সম্পূর্ণ দেখতে চায়—নইলে মানুষ মানুষই নয়।

অমিত বলিল, মানুষ নিজ-নিজ সত্তায় অসম্পূর্ণ, ইন্দ্রাণী। মানুষের সম্পূর্ণতা মানুষের সম্পর্কে, আত্মদানে আর সমগ্রকে গ্রহণে। 'তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে'। Only in collective living do we reach plenitude.

ইন্দ্রাণী সব্যঙ্গ হাসি হাসিল। বলিল, জানি, অমিত, জানি তোমার মতবাদ। ওই তো তোমাদের মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্রে ইন্দ্রাণী ভুলবে না। এ মন্ত্রেই হিটলার-স্তালিন মানুষকে কামান-বন্দুক করেছে—কর্তারা গড়েছে যত মানুষ-মারা রাষ্ট্রযন্ত্র।

অমিত বলিল, আমিও জানি, ইন্দ্রাণী, তোমার পথ—তুমি চাও সমাজ-দ্রোহ, 'জাঙ্গল ল' বা শ্বাপদ-নীতি।

ইন্দ্রাণী ক্ষুব্ধ হইল। এই ইন্দ্রাণীর পথ? হায় অমিত, ভুলে গেছ বলেই আজ তুমি এমন ভুল করছ। তোমারই আলোকে ইন্দ্রাণীর পথ আবিষ্কৃত—তা স্বাধীনতার পথ, মানুষের আত্মমর্যাদার পথ—Only in freedom do we reach plenitude.

অমিত এবার বিদ্রূপের সহিত হাসিল: 'ফ্রীডম' বোল না, বরং ফ্রী-এনটার প্রাইজই বলো। চাই কি, তাতে পেতেও পার তোমার 'সেবিকা-সংঘের' জন্য একটা মার্কিনী 'এড'—ধর্মঘটের বিরুদ্ধে অভিযানের পুরস্কার।

কথাটার খোঁচা যথেষ্ট। ইন্দ্রাণী জ্বলিয়া উঠিল, ধর্মঘট!—কেন, অমিত, এই ধর্মঘট? সুজাতার ব্যক্তিগত আক্রোশ বলে তো—

অমিত আত্মসংযম করিল—ইন্দ্রাণীকে সে এমন রূঢ় ভাবে আঘাত করিল কেন? বলিল, না হয় মানলাম তা'ই। যদিও জানি—মিনা আর মানবের প্রেম-পরিণয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক সম্পূর্ণ তোমার উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা,—হয়তো বা ওদের প্রেমটাও তোমার কল্পনা। না, থাক, প্রমাণ তুমি না দিলে; আমি তোমার খাতিরে আপাতত মেনে নিচ্ছি—মান্থ আর মিনা প্রেমেই পড়েছে। কিন্তু সুজাতা সেনের ব্যক্তিগত স্বার্থে এতগুলি 'সেবিকা সংঘের' মেয়ে ধর্মঘট করবে কেন? তাদের 'ব্যক্তিগত স্বার্থটা' তাতে কি?

কাজ করতে চায় না বলে, কাজে ফাঁকি দিলে আমি কাউকে ক্ষমা করি না বলে, বিনা কাজে দক্ষিণা চায় বলে।

সত্য বলছ ইন্দ্রাণী?—তুমি তাদের প্রত্যেকের কাজের বাবদে রোগীদের থেকে আদায় করো দিনে ষোল টাকা, আর রাত্রিতে বিশ টাকা। কিন্তু তারা প্রত্যেকে পায় কি?—দিনের কাজে আট টাকা, রাত্রের কাজে দশ টাকা—

তীক্ষ্ণ স্বরে ইন্দ্রাণী বলিল···মিথ্যা কথা। তারা পায় আমার এখানে বাস-স্থান, পায় এদিনেও পুষ্টিকর আহার্য, পায় কার্যকালেও আমার ব্যবস্থা-করা চা, টিফিন্। সবচেয়ে বড় কথা, পায় সপ্তাহে সপ্তাহে স্থির কাজ—জানে না বেকারের দুর্দশা কাকে বলে।

আর তুমি পাও কি—এ কাজ করে? কিংবা কাজ না করে দিল্লীতে বসে?

আমার শ্রম-মূল্য,—যেমন ওরা পায় ওদের শ্রম-মূল্য। আমার শ্রম-মূল্য—যে শ্রমের বলে আমি একাকী গড়েছি এই প্রতিষ্ঠান। বোঝো কি, তার অর্থ? তার অর্থ—ইন্দ্রাণীর জীবন-যৌবন, তেজ, শক্তি, দীপ্তি সমস্ত।—তার মূল্য কত জানো, অমিত?

অমূল্য—আমার কাছে। কিন্তু পৃথিবীতে তুমি আদায় করো কী মূল্য?—অন্তদের দাও দিনে দশ ঘণ্টায় আট টাকা, আর রাত্রি-জাগা দশ ঘণ্টায় দশ টাকা।—ইন্দ্রাণীর শক্তি, দীপ্তি, তেজ—এ সবের মূল্য হল গুটি পঞ্চাশ মেয়ের সপরিবারে অনাহার;—তাদের পুত্র আর ভ্রাতাদের তেজোহীনতা, দীপ্তি-হীনতা, শক্তিহীনতা, আয়ুহীনতা।

এইরূপ যুক্তিতর্কের জন্য ইন্দ্রাণী সম্ভবত প্রস্তুত ছিল। সে পরাজয় মানিল না। বলিল, শোনো, অমিত, এ বাঁধিবুলি না আউড়ে খোঁজ নাও ওরা সত্যই কতটা কাজ করে, কতটা কাজ শিখেছে, আর কতটা শিখেছে কুঁড়েমি, কাজ ফাঁকি দিতে। শিখেছে কি শ্রমের মর্যাদা, না শিখেছে শুধু তোমাদের বাঁধিবুলি?

অমিত হাসিল। বলিল, ইন্দ্রাণী, এও তো বাঁধিবুলি—তবে শোষিতের নয়, শোষকের বাঁধিবুলি।

ইন্দ্রাণী ইহা মানিবে না। অমিত তাহাও জানিত তবু ভাবিল—এই সরল সত্য ইন্দ্রাণী বুঝিবে। সে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণীর শূন্য দৃষ্টি জানালা দিয়া প্রসারিত—দূর হইতে দূরান্তরে। এই দৃষ্টিও অমিত চিনে—বিদ্রোহিণীর দৃষ্টি নয়, ইহা জীবন-বেদনায় মর্মবিদ্ধা ইন্দ্রাণীর দৃষ্টি।

অমিতের চোখের উপর ইন্দ্রাণী চোখ রাখিল। তারপর বলিল, বেশ, তোমার উপরই সকল ভার দিচ্ছি—তোমার ব্যক্তিগত দায়িত্বে দিচ্ছি—কোনো দলের বা কমিটির জন্য নয়। আর তুমি তোমার ব্যক্তিগত কর্তব্য-বোধ নিয়ে নিজের শর্তে এই মেয়েদের তাদের কর্তব্যে নিযুক্ত করো—নার্সের দায়িত্ব পালনে তাদের প্রবৃত্ত করো—কিছু চাইব না আমি।

অমিত হাসিল, আমার ব্যক্তিত্বে তোমার যত আস্থা, ওদেরও দায়িত্বে তত আস্থা রেখে দেখো না কেন?

না।

ইন্দ্রাণী বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছে—চমৎকার পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদ আর আকাশ। দেখিতে-দেখিতে ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে হাসি ফুটিল একটু-একটু করিয়া। কিন্তু ইহা তো পূর্ণিমা রাত্রির হাসি নয়; ইন্দ্রাণীর সেই প্লাবন নয়। ইন্দ্রাণী বলিল, এ মেয়েগুলোকে তোমরা কাজ ফাঁকি দিতে শিখিয়ে সমাজকে শোষণ করতে শেখাচ্ছ; আর ওদেরকে তোমরাই মানুষ হতে দিলে না।

অমিত বলিল, জন-সংগ্রামের সৈনিক যে মানুষ, সে সবচেয়ে সচেতন মানুষ, সবচেয়ে সচেতন ব্যক্তিত্বেরও সে-ই অধিকারী।

'জন-সংগ্রাম'! 'সচেতন মানুষ'!—

এবার ইন্দ্রাণীর চোখে অশ্রদ্ধা জলিয়া উঠিল।—কোথায় ছিল তোমাদের সে 'সচেতন ব্যক্তিত্ব' তখন, অমিত, যখন পথে পথে মানুষ না খেয়ে মরল হাজার হাজার, মেয়ে-পুরুষ মর্যাদা হারাল—তোমারা জন-সংগ্রামের সৈনিকেরা একবার অভাগাদের বলতে পারলে না—'বাঁচো, বাঁচো, মানুষের মতো বাঁচো'। ...ইন্দ্রাণী কথা শেষ করিল না—একবার হাসিল। তারপর কথাটার আক্রোশ কমাইয়া বলিল, হাঁ, মানুষের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন—লেনিনের সোবিয়েত। তার সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্নে পরিণত আজ তার সেই সোবিয়েত। তাই তো আমার এত রাগ তোমাদের উপর।—তোমার উপরও, অমিত। তুমিই না মানুষের স্বাধীনতা আর মানুষের মর্যাদায়, মহিমায় ছিলে প্রাণে-মনে বিশ্বাসী?

তা না হলে আজ এ দশা কেন অমিতের—কিংবা তোমার?

'আমার'।—ইন্দ্রাণী চমকিয়া উঠে, মাথা নত করে, তাহার বক্ষ আন্দোলিত হইতে থাকে।

অমিত জানায়, মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের মহিমা...এ চেতনা, এ বোধ, এ লক্ষ্য নিয়েই তো এগিয়ে এসেছি এখানে। এ দেশের স্বাধীনতা, এ দেশের মানুষের আত্ম-প্রকাশ—এ স্বপ্ন নিয়ে একদা পা বাড়িয়েছিলাম পথে। একা নই, তুমিও তা জানো। দেখতে দেখতে সে পথ বিস্তৃত হয়ে গেল; পথই আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। এল অন্যদিন। দেখলাম দেশবিদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার সাধনা, মানুষের জয়যাত্রা। বুঝলাম তার ঐতিহাসিক রূপ, তার স্বরূপ... মানুষের জীবন-সংগ্রামের পর্বে পর্বে তার স্বাধীনতার ক্রম-সিদ্ধি, তার মানবতার ক্রম-বিকাশ,—শ্রেণী সংগ্রামের পথে পথে ইতিহাসের ক্রম বিবর্তন...

ইন্দ্রাণী এইসব জানে। যে মূল্য আর কাহাকেও দিতে হয় নাই সেই মূল্য দিয়াই এই সত্যকে ইন্দ্রাণী জীবনে গ্রহণ করিয়াছে—তাহা কি অমিত বিস্মৃত হইল?

স্বাধীনতার অর্থ কি তবে, ইন্দ্রাণী?—অমিত কথাটা এবার পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

ইন্দ্রাণী অবশ্যই জানে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, না, বিশৃঙ্খলাও নয়। কিন্তু ইন্দ্রাণী জানে না, শুধু শৃঙ্খলমোচনই স্বাধীনতা নয়,—স্বাধীনতা সৃষ্টির সাধনা।

অমিত বুঝাইয়া বলিল, ইতিহাসের অন্তর্নিহিত অর্থের খোঁজ নিলে দেখি—স্বাধীনতা শুধু নেতি-বাচক কথা নয়। সত্য বটে, বন্ধনমোচনেই তার পরিচয় আমাদের চক্ষে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু বন্ধন-মোচনও আসলে স্বাধীনতার বাহ্য-রূপ। স্বাধীনতার মূল সত্য হল 'প্রয়োজনের স্বীকৃতি'—সৃষ্টির দাবিকে অঙ্গীকার। ইতিহাসের পর্বে পর্বে অভ্যাসের ও ব্যবস্থার গ্রন্থিতে সৃষ্টির দাবি বাধা পড়ে। সেই গ্রন্থি মুক্ত করে দিতে হয়।—সৃষ্টির প্রয়োজনকে স্বীকার করার জন্যই চাই গ্রন্থিচ্ছেদ। তাই শুধু মুক্তির সাধনা নয়, আসলে সৃষ্টির সাধনাই স্বাধীনতা। সৃষ্টির সেই দাবি নিয়েই ইতিহাসে এসেছে আজ আর-একদিন, ইন্দ্রাণী, সৃষ্টির আমন্ত্রণ।

মুহূর্তেকের জন্য ইন্দ্রাণীর চোখে সন্দেহ জাগিল কি?—মুহূর্তেকের, শুধু মুহূর্তেকের। কিন্তু না, ইন্দ্রাণী ইহা মানিবে না। বলিল, সভ্যতার শ্রেষ্ঠকীর্তি—মানুষ; শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব্যক্তিত্বের বিকাশ,—এ কথা কি ইন্দ্রাণীর বলতে হবে তোমাকে?

অমিত তথাপি আবার বলিল, ব্যক্তি-স্বাধীনতার এই মন্ত্র রুশো ভল্‌তেয়ারের যুগেও অর্ধসত্য ছিল। গত পঞ্চাশ বছরে মরে মরে সে ভূত হয়ে গিয়েছে। তার এ যুগের পরিচয় মার্কিন 'ফ্রি এণ্টারপ্রাইজ' ও এটম বোমায়। আজ আর-একদিন, সম্মিলিত আয়োজনে সৃষ্টির নূতন অধ্যায় শুরু হচ্ছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নামে বিদ্রোহেও তাই আজ মিথ্যারই বলবৃদ্ধি হয়। কারণ, বিদ্রোহ আর বিপ্লব এক কথা নয়। বিদ্রোহ শুধু চলতি ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে, বিপ্লব করে চলতি ব্যবস্থার রূপান্তর—নূতন সত্যের সৃষ্টি। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—তা না হলে তুমি স্বাধীন নও, স্বাধীনতা চাও না; তুমি বিচ্ছিন্ন মাত্র। আপনাকেই তুমি বিচ্ছিন্ন করেছ, ইন্দ্রাণী, আপনাকে সংযুক্ত করতে পার নি সৃষ্টির প্রয়োজনে, একালের সার্ব-

জনীন সৃষ্টিশক্তির আয়োজনের সঙ্গে, জন-সমাজের জীবনের সঙ্গে, only in collective living do we reach plenitude.

আবার সেই কথা! ইন্দ্রাণী ইহা শুনিতে চাহে না—

না, অমিত, আমার পথ স্বতন্ত্র—

কঠিন উদাস তাহার দৃষ্টি। অনেক অনেক দূরে মরুভূমির পার হইতে ইন্দ্রাণী দেখিতেছে যেন অনেক অনেক যুগের পুরাতন বন্ধুকে—আবেগহীন নিষ্পলক সেই দৃষ্টি।...

অমিতও সব বুঝিল। জীবনের যে দুই পথ একদিন এক পথ হইয়া গিয়াছিল,—অমিত জানে বিয়াল্লিশেই তাহা ভিন্ন হইয়াছিল;—বারে বারে পরস্পরকে তবু ছুঁইয়া গিয়াছে সেই দুই পথ আমবাগানের আড়াল হইতে, চষা-মাঠের মধ্য দিয়া, হাট-বাজারের আহ্বানে। সে দুই পথকে অমিত কাল তখন দেখিল বিভক্ত—কোথায় পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে তাহারা, —শুধু দুই দিকে নয়—একেবারে বিপরীত-মুখী পথে—ইন্দ্রাণী আর অমিত।...

দুই ভিন্নমুখী পথের বাঁক হইতে এই শেষ সম্ভাষণ। আর সেই সম্বর্ধনা শেষ হইল—সন্ধ্যার চা ও খাবারে, রাত্রির লুচিতে আর মাংসে-মিষ্টান্নে। আহারান্তে ইন্দ্রাণী জানাইল, কাল দিল্লী মেলে আমি যাচ্ছি। কবে দেখা হবে আবার তোমার সঙ্গে, জানি না। হাঁ, অমিত, এবার অনেক দিনের মতো চলেছি দিল্লী। বোঝা তাই চাপিয়ে যেতে একটু, এই নাও—

ইন্দ্রাণীর সদ্য লিখিত পত্র :— তাহার সংঘারাম ও সেবিকা-সংঘের সমস্ত দায়িত্ব, স্বত্ব ও স্বামিত্ব আজ থেকে অমিতের—ইন্দ্রাণী কোনো অধিকার চাহে না।

অমিতের চোখ একবারের মতো ঝাপসা হইয়া আসিল। সে জানে—ইহা ইন্দ্রাণীরই স্বরূপ। অমিত আবেগভরে কহিল, না, ইন্দ্রাণী।

স্থিরকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলিল, আমি তোমাকে স্বীকার করেছি বরাবর; স্বীকার করব তোমার জীবনকে, কিন্তু ইন্দ্রাণী প্রাণ গেলেও স্বীকার করবে না তোমার মতবাদকে, তোমার সত্তার এই আত্মঘাতকে।...স্নিগ্ধ হাসির সঙ্গে

জানাইল সুদৃঢ় কঠিন বিজ্ঞপ্তি,—এবার ইন্দ্রাণীর বিদায়, অমিত—। ইন্দ্রাণী এবার শুধুই ইন্দ্রাণী, তাই না?

অমিত উত্তর দিয়াছে, আমার মতবাদ, ইন্দ্রাণী, আমার জীবন ছাড়া নয়।

ইন্দ্রাণী পূর্বেও তাহা মানে নাই, এখনো মানিল না, ভবিষ্যতেও মানিবে না এই টোটেলেটেরিয়ান নীতি—সর্বগ্রাসী সাম্যবাদ।

আমি মনুষ্যবাদী, ইন্দ্রাণী, আর এ যুগের মনুষ্যবাদই সাম্যবাদ, কর্ম-যোগ-শাস্ত্র।

তুমি মানুষ, অমিত। মতবাদের থেকে মানুষ বড়। মানুষকে অশ্রদ্ধা করব না, কিন্তু মতবাদের মানুষকে আমি শ্রদ্ধা করি না।

যাকে শ্রদ্ধা করতে পার না, তাকে বিশ্বাস করার নামে অপমানিত করো না। বিদায় ইন্দ্রাণী।

কাগজ ও চিঠি পড়িয়া রহিল। ইন্দ্রাণী একপদও প্রত্যুদ্গমন করিল না।

বিদ্রোহিনী ইন্দ্রাণী কাঁদে নাই···বিজয়িনী ইন্দ্রাণী দুঃখও করে নাই ;—ইহাই তো তাহার বিদ্রোহের ট্র্যাজিডি, তাহার মিথ্যাবিজয়ের সর্বনাশিতা···।

অশ্রুহীন চোখে অমিত এই ট্র্যাজিডিকে কাল রাত্রিতে ছাড়াইয়া আসিয়াছে। জীবনের এই সম্ভাবিত পরাজয়ের কথা সে বুঝি বিয়াল্লিশেই বুঝিয়াছিল।—অথবা আরও পূর্বে,—হয়তো বা প্রথম সেই ইন্দ্রাণী-অমিতের জীবন-সংঘাতেই বিশ বৎসর পূর্বে,—না, পঁচিশ বৎসর পূর্বে--ইন্দ্রাণী তাহার জীবনগতির আত্মহারা আনন্দে যখন অমিতের মনের আত্মীয়া হইয়া উঠিতেছে; অমিত অবুঝ ভাবে তখনো ইহা বুঝিয়াছে। তবু কালই প্রত্যক্ষ করিয়াছে,—ইন্দ্রাণী আত্মভ্রষ্টা আপনার গর্বিত গতিতে। অথবা, ভুল হইল কালই, সে জানিল, কালই—এই পরিণতিই ইন্দ্রাণীর পক্ষে অনিবার্য—বিচিত্র নিষ্ঠুর তাহার পরিবার-পরিবেশের জন্য, একান্ত আত্মনির্ভরতার গর্বে আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য; এবং একালের জন-জীবনের বিপুল সৃষ্টিশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকার জন্য, আত্ম-মর্যাদা-সম্পন্না এ-দেশের মেয়ের এ-দেশের নিষ্ঠুর

কদর্য শাসন-বিচারের বিরুদ্ধে একাকিনী বিদ্রোহের জন্য। ইন্দ্রাণীর মতবাদও তাই তাহার জীবন-ছাড়া নয়। পৃথিবী তাহার জীবনকে বাঁকিয়া-চুরিয়া দিয়াছে, তাহার মতবাদ সেই বাঁকা-চোরা জীবনেরই প্রতিলিপি...।

অমিত ভাবিতে ভাবিতে আর ভাবিয়া শেষ পায় না—

কবে শেষ হইবে এদেশের মানুষের জীবনের এই ট্র্যাজিডি?—এ দেশের মেয়ে-জীবনের এই ট্রাজিডি? শেষ হইবে বিদ্রোহিণী ইন্দ্রাণীর জীবনের ট্রাজিডি—বিদ্রোহিণী মংগলীর জীবনের ট্রাজিডি! শেষ হইবে ঐতিহ্য-মুগ্ধ সবিতার আত্মসংযমের ট্রাজিডি, স্বরর আত্মসংহরণের ট্রাজিডি। কবেই বা শেষ হইবে ঐতিহ্যহীনা মিসেস সেন-চৌধুরীর জীবনের প্রহসন, আর চঞ্চলা লঘু-সঞ্চারিণী মঞ্জুর জীবনের এই কৌতুকনাট্য।...

অমিত সুজাতা সেনকে বলিল: আপনার কি মনে হয় আপনাদের ধর্মঘট আর বেশি দিন টিঁকবে না?

কত টিঁকবে আর? সাতাশ দিন তো হল। নার্সরাও বলছিল, 'আর পারি না দিদি। একটা মীমাংসা করো।' আর ওরা তেমন প্রস্তুত নয়—সবারই ঘরে আত্মীয়-পরিজন অনাহারে রয়েছে।

অমিত তাহা জানে। ধর্মঘট তো শেষ কথা নয়, মীমাংসা একটা চাই। সে বলিল, আপনারও তো বোন আছে একটি। মিনা। কলেজে পড়ে বুঝি। কি পড়ে সে?

কলেজে নয়, মেডিকেল স্কুলে পড়ে। ইন্দ্রাণীদিই ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি চটে গিয়েছেন মিনার উপর।

কেন?

মান্নুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। ওঁর বিশ্বাস মিনাই মন্নুকে বাগিয়ে দলে টানছে।

ওরা বিয়ে করবে নাকি?

বিয়ে করবে কি? ওদের বয়স এখনো উনিশ-কুড়ি। তা ছাড়া, মান্নুও তার মায়ের মতো। আমেরিকা তো গেলই না; এখন মায়ের থেকে টাকা

নিয়েও আর পড়বে না। বলে, নিজের জীবিকা অর্জন করে নিজে পড়বে।

অমিত বুঝিল—কোথায় ইন্দ্রাণী আঘাত পাইয়াছে। তাহার জীবনের সাধনা—তাহার পুত্র। সেই পুত্র আজ মায়ের সাহায্য অস্বীকার করিয়াছে—মায়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।

সুজাতা আবার বলিল, মিনাই কি কম? বিয়ের কথা বললে সে বলে—পাশ করবে, ডাক্তার হবে, উপার্জনক্ষম হবে; তারপর যদি করতে হয় বিয়ে করবে নিজের জোরে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে।

তা হলে তো মিনাই সিস্টার ইন্দ্রাণীর উপযুক্ত পুত্রবধূ হতে পারে। তবে ইন্দ্রাণীর আপত্তি কেন?

আপত্তিও তা'ই—তেজী মানুষ তো তিনি। তিনি চান সকলে তাঁকেই মানবে, তাঁকেই স্বীকার করবে, বড় বলবে। কিন্তু মিনাও বড় জেদী। ছেলেবেলায় সেজন্য মিনাকে ইন্দ্রাণীদির পসন্দও ছিল বেশি; আর বড় হতেই মিনাকে তিনি একটুও সহ্য করতে পারেন না। মনে করেন মিনা যেন ওঁরই প্রতিদ্বন্দ্বিনী।...

অমিতের নিকট ইন্দ্রাণীর অলক্ষিত জীবন-তল আলোকিত হইয়া গেল। মিনা ইন্দ্রাণীরই প্রতিদ্বন্দ্বিনী—আর সে দ্বন্দ্ব পুত্রকে লইয়া—ইন্দ্রাণীর উপরে জয়ী হইতেছে মিনা—মায়ের উপরে প্রিয়া!

চিরদিনই তাহা হইয়াছে, চিরদিনই হয়,—ইহাও নিয়ম।

হাওড়া স্টেশন বুঝি এতক্ষণে আজ পিছনে পড়িয়া গেল। প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখ ও মাথার মধ্যে মানবের মুখ মিলাইয়া গিয়াছে। একটা কথাও হয় নাই—এই আধ ঘণ্টা মাতা-পুত্রে। এবার ইন্দ্রাণী আপন আসনে আসিয়া বসিয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, মাথা পিছনের গদীতে এলানো।...মানু তাহার মায়ের সহায়তাও এইবার ত্যাগ করিতেছে। মানু মাকে ত্যাগ করিল—কোথায় চলিল ইন্দ্রাণী? কোথায়? কোথায়? কোথায়?...

দিল্লী? কেন? কি কাজ আর তাহার কাজে? কিছু না, কিছু না।

কোথায় তবে যাইবে সে ? ইন্দ্রাণী সেই ঠিকানা আর জানে না।...

আপনার পার্শ্বস্থ কাগজখানার উপরে ইন্দ্রাণীর হাত পড়িল। সন্ধ্যার বিশেষাঙ্ক সংবাদপত্র বুঝি। এতক্ষণ খুলিয়া দেখিবার সময় হয় নাই, এইবার বরং তাহা ইন্দ্রাণী পড়িবে। টান হইয়া চোখ মেলিয়া বসিয়াছে ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণীর চোখ বড় হইয়া উঠিল ; মাথা কাগজের উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। দৃষ্টি সতেজ হইল, সুতীব্র হইল ;—আগ্রহ আশঙ্কায় তাহা দ্রুত ঠেলিয়া চলিয়াছে শব্দ, পংক্তি, প্যারা, স্তম্ভ...তারপর আর চলে না। চলে না, চলে না। চোখে কিছুই দেখে না ইন্দ্রাণী !...

আবার মাথা এলাইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়াছে ইন্দ্রাণী। কাল অমিতকে সে বিদায় দিয়াছে—বিদায় লইয়াছে অমিতের নিকট হইতে...আজ অমিত আবার ফিরিয়া গেল জেলে। সেই অমিত, তাহার অমিত, তাহার বিদায়-দেওয়া অমিত।

...ইন্দ্রাণীর ভবিষ্যৎ হইতে মানু চলিয়া যাইতেছে ; ইন্দ্রাণীর অতীত হইতে অমিত চলিয়া যাইতেছে...অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—কি আছে তোমার ইন্দ্রাণী ? কী আছে তোমার এইবার ? কী তোমার ঠিকানা, কী তোমার পরিচয় ?

ইন্দ্রাণী আর ভাবিতে পারে না, ভাবিতে পারে না—তবু ভাবনা তাহাকে ছাড়ে না—

...এ জীবনে তুমি আত্মদান করিতে পার নাই ; এ জীবনে তুমি কাহাকেও আপনার মধ্যে গ্রহণ করিতে পার নাই—মানুকে নয়, অমিতকে নয় ; পুত্রকে নয়, প্রিয়কে নয়। আপনারই জন্য শুধু তাহাদের চাহিয়াছ,—পুত্রের জন্য পুত্রকে চাও নাই, প্রিয়র জন্য চাও নাই প্রিয়কে। আর তাই পুত্র আর পুত্র নাই, প্রিয় নাই প্রিয়—আর তুমিও বুঝি নাই তোমার আপনার।—তোমার অতীত অর্থহীন হইয়া গেল, তোমার ভবিষ্যৎ শূন্য হইয়া গেল...তোমার তুমি হইয়া গেলে খণ্ডিত, নিরর্থক, শূন্যময়।...

ইন্দ্রাণীর চোখের কোণ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে চাহিল ;

ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রাণী, ভাঙিয়া পড়িবে নাকি তুমি ?···

না। না। ইন্দ্রাণী টান হইয়া বসিল—অতীত অর্থহীন হোক, অর্থহীন হোক ভবিষ্যৎ—ইন্দ্রাণীর বর্তমান আছে, আর ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রাণী,—বিদ্রোহিনী সে, অপরাজিতা সে। কাহার সাধ্য ইন্দ্রাণীকে পরাহত করিবে ?—অমিত ? মানব ?—

নিষ্ঠুর দৃপ্ত চিত্তে ইন্দ্রাণী ভাবনাকে বিতাড়িত করিল—

ইন্দ্রাণী আপনার সত্তায় আপনার দীপ্তিতে অনবনত। আর তাই তোমার সত্তায়, মানব, তোমার জীবনে অমিত, ইন্দ্রাণী রহিবে চির-স্বীকৃত। না থাকুক ইন্দ্রাণীর অতীত, না থাকুক ভবিষ্যৎ,—ইন্দ্রাণী ইন্দ্রাণী—মহাশূন্যের কক্ষশূন্য ঠিকানাহীন ধাবমান জ্যোতিষ্ক···

ইন্দ্রাণী বাহিরে তাকাইল—অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে দিল্লী মেল···

কাল রাত্রিতে অমিত যখন গৃহে ফিরিয়াছে তখন রাত্রি অনেক—আকাশ পূর্ণিমালোকে উদ্ভাসিত। উৎসবের কোলাহলে পৃথিবী মুখরিত। আর অমিতের মনে হইয়াছে এই আলোর মধ্যে, উৎসবের মধ্যে, যেন কি হারাইয়া গিয়াছে। কিসের যেন প্রয়োজন শেষ হইয়াছে—পূর্ণিমা রাত্রির এই ল্যাম্প পোস্টের মতই তাহা আজ নিষ্প্রয়োজন! কে সে, ইন্দ্রাণী? কেমন ঐ ইন্দ্রাণী? সে বুঝি কোন্ কক্ষচ্যুত মৃত নক্ষত্র। কখন নিবিয়াছে তাহাও সে জানে না। এখন শুধু সে টুকরা-টুকরা হইয়া যাইতেছে। খসিয়া যাইতেছে তাহার সংঘ, তাহার প্রাণ, তাহার প্রেম, তাহার সৃষ্টি— অমিত, মানবও···

অমিতের চক্ষু একবার বাষ্পাচ্ছন্ন হয়।···কী অপচয়! কী ট্র্যাজিডি!

কাল রাত্রিতে পূর্ণিমার আকাশের তলায় বাড়ি ফিরিতে ফিরিতে অমিতের তবু মনে হইয়াছে বুঝি সেও অন্তবিহীন পথ পার হইয়া আসিল···

'বাকি আছে শুধু আর-এক অতিথি আসিবার
তারি সাথে শেষ চেনা'

আজ প্রভাতে রাত্রি পোহাইতে না-পোহাইতে অমিত নিমন্ত্রণ পাইল—মহাশূন্যের এপারে এই সূর্যের সভায় জনতার নবজন্মের সাধনায়। তপন, বুল্‌কন, কানাই হাজরা, বিজয়, মঞ্জু, সুজাতা,—তাহাকে টানিয়া লইতেছে সৃষ্টির সেই আগামী যুগে।

ইন্দ্রাণী,—দিল্লী মেলে সেই কল্পনামূর্তিকে যেন অমিত দেখিতেছে—ছেঁড়া-পাল, ভাঙা-হাল অমিতের জীবন-তরণী আজও ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে—এই কক্ষে বসিয়া—মহামানবের সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে। মানুষের তীর্থযাত্রায় আজও সে যাত্রী—আজও সে সঙ্গী ঝড় আর বিদ্যুতের, সঙ্গী সে মানুষের ও ইতিহাসের।...

'গাড়ি এসেছে, এবার আপনারা চলুন। দুবারে নিয়ে যাবে।'—একখণ্ড কাগজ হাতে করিয়া একজন গোয়েন্দা কর্মচারী আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় নেবে?

জেল কাস্টোডিতে।

কি ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে আমাদের কাপড়-চোপড়ের? ওবেলা আমরা নাই নি, খাই নি—

জেলে সব পাবেন—কর্মচারী অসংকোচে জানায়।

মোতাহের বলিল,—বাজে কথা। জেলে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় বিকাল পাঁচটায়! আর এখন রাত্রি আটটা।—কিছু পাওয়া যাবে না।

গোয়েন্দা কর্মচারী বলিল, আমরা জেলে ফোন করে রেখেছি, তারা সব তৈরী করে রেখেছে।

অমিত বিশ্বাস করিল না। বুলকন্ স্পষ্টই জানায়—বেইমানের ঝুটা-বাত। অন্যরাও তাহাই সন্দেহ করে। খাবার, স্নানের কাপড় চোপড়ের কিছুই ব্যবস্থা সেখানে হইবে না। কিন্তু এই আপিসের এই ঘরে সকাল হইতে এরূপ ভাবে বন্ধ থাকিয়া সকলেই শ্রান্ত ও অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। একটা কর্মচারীও কেহ নাই যে, তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়া কিছু জানিবে। থানার

হাজতগুলি আরও জঘন্য। বরং জেলেও তাহার অপেক্ষা ভালো।

ব্ল্যাক মেরিয়ার যাত্রীদের নাম কর্মচারীটি পড়িতে লাগিলেন।

সুরথ ভট্টাচার্য, বিনোদ ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় সেন, কান্তিলাল চতুর্বেদী ......এক-একটা নাম পড়া হইতেই উৎফুল্ল পরিহাস কোলাহল জাগিয়া উঠে,—অমিতের চোখে চিত্রে-গড়া ইতিহাসের এক-একটা খণ্ড ভাসিয়া উঠে।

ব্ল্যাক মেরিয়া গর্জিয়া বাহির হয়। একটা অবসাদ নামিয়া আসে বাক্য-মুখর ঘরটায়।

'আপনাদের ট্যাক্সি এসেছে'—মেয়েদের উদ্দেশে কর্মচারীটি আবার জানাইতে আসে।

ট্যাক্সি ?—সুজাতা প্রশ্ন করে।

হাঁ, আপনাদের ট্যাক্সিতেই নেবার নির্দেশ।

হইবেই তো।—মঞ্জু হাসিয়া বিজয়কে বলিল,—আমরা তো আর তোমাদের মতো বাজে প্রিজনার নই।

দিলীপ বলিল, কিন্তু যাবে আর কোথায়—শুনলাম তো জেলখানাতেই যাচ্ছ। দেখবে—একেবারে জেনানায় ঢোকাবে।

মঞ্জু শঙ্কিত অবিশ্বাসে বলে, সত্যি অমিমামা ?

অমিত বলিল, তা সত্য কথা।

আপনাদের সঙ্গে তা হলে জেলে দেখা হবে না আর ?

সম্ভাবনা নেই। জেলে তোমাদের পক্ষে আমরা সকলেই পরপুরুষ—বাদে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট ও গোয়েন্দা কর্মচারীরা।

মঞ্জু সজোরে আপত্তি করিল, কিছুতেই তা হবে না। একটা উপায় করতেই হবে। আপনি আমার মামা একথা বললেও দেখা হবে না।

ইয়ার্কিবাজ দিলীপ বলিল, মামা ছেড়ে বাবা হলেও হবে না।

তা হলে ? কিন্তু আমি এ ভাবে থাকতে পারব না—

দিলীপ বলিল, এক কাজ করতে পার—ক্লেম করে বসতে পার আমাদের

কাউকে হ্যাজব্যাণ্ড বলে—অবশ্য এমন বেকুফ কে, যে তোমার দাবি স্বীকার করে নেবে।

মঞ্জুর চক্ষে হাসি ঝিলিক দিয়া উঠিল।—মন্দ কি ? দেখি তোমাদের মধ্যে কে গল্পসল্প করতে পার—

দিলীপ বলিল। তার চেয়ে দেখ না কেন কে ঝগড়া করতে পারে। না হলে তোমার জুড়ি হবে কে ?

ওঃ, তোমার দরখাস্ত পেশ করছ বুঝি ?—রিজেক্টেড, এখনি বলে দিচ্ছি।

তা হলে একজন ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব নাও—তোমার কথা যার কানে যাবে না—অথচ তুমি অজস্র বকতে পারবে।

দরখাস্ত করো তো আগে।

অ্যাপ্লিকেশন্‌স্ আর ইনভাইটেড্ ফর্ এ ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব টু অ্যাক্ট অ্যাজ হ্যাজব্যণ্ড অন্ প্রোবেশন ফর এ চ্যাটারবক্‌স?···দিলীপ আবার বলিল।

কিন্তু ট্যাক্‌সি দাঁড়াইয়া।

অমিতদেরও গাড়ি দাঁড়াইয়া।

একের পর এক আবার নাম পড়িয়া যাইতে লাগিল কর্মচারী—কেহই বাদ যাইবে না, জানা কথা।

কিন্তু শুধু নাম নয়, চিত্র নয়, একটা নতুন অধ্যায়ের ইঙ্গিতও সঙ্গে সঙ্গে···

'মোতাহের'...অমিতের বহু দিনের বন্ধু, শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসের অজ্ঞাত পর্ব হইতে আজ যে এই প্রবল শক্তিমান গতিমান বিপ্লবমুখী পর্বে আসিয়া পৌছিয়াছে···।

'বুলকন্' : 'ট্রামকা বাহাদুর মজদুর'···

'মাস্টার সাহেব'···

একবারের মতো থামিয়া গেল সেই কর্মচারী ; সকলের কণ্ঠও নীরব। তারপর—

'দিলীপ দত্ত' : মঞ্জু করতালি দিয়া উঠিল !

'তপন ভট্টাচার্য' : গৌরীর স্বামী যে···

'বিজয় চ্যাটুজ্জে' :

'অমিত'...তবে সত্যই তোমার আর একদিনের যাত্রা শুরু হইল...

গান ধরিয়াছে সবাই...গান ধরিয়াছে...গাড়ি তৈয়ারি।

অমিতের সঙ্গে কী কথা বলিবে, মঞ্জু অমিতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অমি মামা, সকাল থেকে তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।—একটু স্থির হাসি মঞ্জুর মুখে এবার।

আর এতক্ষণে বলছ তা? কি এমন কথা মঞ্জু?

কিন্তু এই মাত্র ঠিক করেছি যে—অবশ্য আর কাউকে জানাই নি এখনো। জানাব এর পরে,—আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অমিত একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। পরে বলিল : হঠাৎ,—এখানে—তোমার বিয়ে ঠিক হল?

সে জন্যই তো এখানে এসেছিলাম—বর খুঁজতে এসেছি, বলেছি আপনাকে সকালবেলা।—আবার মঞ্জুর পরিহাস। সেই দুষ্টু ইয়াকির হাসি।

সকাল বেলা এখানে পৌছিয়াই মঞ্জু দেখিল বিজয়ও আসিয়াছে। এবার আর বিজয়ের উপায় নাই। মঞ্জু বলিল, 'এখন কথা দাও। আর 'না' বললেও শুনব না, তা তো জানোই'। কথাটা নূতন নয়—হয়তো বিজয়েরও এক সময়ে আপত্তি হইত না। কিন্তু বিজয় আপনার সংকল্প তারপরে সুস্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। আর যাহাই হউক, সে কাহারও প্রেম প্রত্যাশা করিবে না। সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের প্রাণোচ্ছল সমাদরের পাত্র সেই বিজয় আর সে নাই। তাহার হস্ত প্রায় বিনষ্ট, একটি পদ প্রায় খঞ্জ! তাহাকে কেহ স্বেচ্ছায় আত্মদান করিতে আসিবে না। এমনি তাহাদের বিরাগ থাকিবার কথা বিকলাঙ্গ মানুষের প্রতি। আর যদি জানে ইহার উপরে বিজয়ের আহার কত সামান্য, ভবিষ্যৎ আর্থিকজীবন অনিশ্চিত, তাহা হইলে অবজ্ঞা ছাড়া কোনো তরুণীর নিকট কিছুই বিজয় লাভ করিতে পারে না।

কাজের পথে পূর্বেই তাহার মঞ্জুর সঙ্গে পরিচয় হয়। তখনো মঞ্জু ছিল

আরও অন্যান্যের মতো হাস্যময়ী বন্ধু। কিন্তু দৈহিক দুর্বিপাকের পরেই মঞ্জু তাহার নিকটতর হইয়া উঠিতে লাগিল। অন্তরের তটে আসিতে চাহিল। বিজয় তখন আপনার সীমানার মধ্যে আরও আপনাকে সুদৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল। তাহার অন্তর্লোকে মঞ্জু কিছুতেই প্রবেশ-পথ পাইবে না। বিপ্লবের মুখে আজ পৃথিবী, পৃথিবীর মানুষ সে—ইহার বেশি কোনো পরিচয়কে সত্য বলিয়া মানিতে বিজয় স্বীকৃত নয়। ইহার পরে সত্য—কবিতা।

কিন্তু মঞ্জুকে কি ঠেকাইয়া রাখা যায়? বিজয়কে সে কিছুতেই দূরে সরিয়া থাকিতে দিবে না। পৃথিবীর মানুষ ও কবিতার প্রাকার ডিঙাইয়া এই চঞ্চলা মঞ্জু কেমন করিয়া বিজয়ের অন্তর্লোকে আসিয়া হানা দেয়। কিছুতেই বিজয় আত্মগোপন করিতে পারে না।

তারপরে আজ এই কয় ঘণ্টার যুক্তিতর্ক, চিন্তা, শেষে সবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে—বিজয় মঞ্জুকে স্বীকার করিয়া লইল।

মঞ্জু জানাইল, বিজয় বলে কি না ওর এক হাত নেই, একখানা পাও প্রায় অচল। আমি বলি, বেশ তো, গিয়েছে যা মাত্র একটা করে, পাবে তা দ্বিগুণ করে। নাও আমার দুটো হাত, আমার এই দুটো পা।—আর জানো তো আমার হাতপায়ের মূল্য—উম্যানস্ 'ভলি বলে' আমি সেণ্টার। আমার সঙ্গে দৌড়ে-ঝাঁপে পারবে তোমাদের কটা ছেলে? বাঃ; খেলাই বা ছাড়ব কেন? জর্জিয়ার মেয়ে যদি ঢাল ছুঁড়তে পারেন, তার জন্য ত্বিলিশের সোভিয়েটের সদস্যা হতে পারেন, জনসাধারণের হাজার কাজ করতে পারেন, আবার পালন করতে পারেন তাঁর দু-তিনটে ছেলেমেয়ে,—তা হলে মঞ্জুও পারবে অন্তত বিজয়কে নিয়েও সব কাজ করতে—মিটিং করতে, মিছিল করতে, তাকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, তার কবিতা শুনতে, আর নিজে 'ভলিবল' খেলতে।

অর্থাৎ ঠিক হইয়াছে—মঞ্জু পথে চলিবে বিজয়কে বহিয়া লইয়া, আর বিজয় আকাশে চলিবে মঞ্জুকে বহিয়া লইয়া—অবশ্য যদি ইহার পরে, জেলের ফাঁকে ফাঁকে মিলে তাহাদের সেই অবকাশ—পথ ও আকাশ।

জেলের গাড়িতে অমিতের উঠিতে হইবে। তাড়াতাড়ি আপনার স্যুটকেশ খুলিয়া কী সে খুঁজিল। তারপর বাহির করিল সেই পুরাতন বহুদিনের সহচর শেক্‌সপীয়ার। খুলিয়া মঞ্জুর হাতে দিয়া বলিল,—আর এই আমার আশীর্বাদ। মঞ্জু, তোমাকে বিজয়কে।

কিন্তু আপনি তা হলে জেলে পড়বেন কি অমিমামা?

জেলে এবার পড়ব না, মঞ্জু, দেখব—দেখব মানুষ।

অমিত মঞ্জুকে বলিল: না হয় পড়ব—বিজয়ের লেখা প্রেমের কবিতা।—বিজয় এবার প্রেমের কবিতা লিখবে জেলে। তোমার হয়ে আমি তোমার স্তুতি পড়ব—বলিয়া অমিত মঞ্জুর শির চুম্বন করিল।

মঞ্জু অমিতকে প্রণাম করিতে নত হইয়া পড়িল।—

চপলা সেই মঞ্জু হঠাৎ যেন পলকের জন্য স্থির হইয়া গেল।

আশ্চর্য সুন্দর চন্দ্রালোকিত এই পৃথিবী। বাহিরে যে কৃষ্ণ-প্রতিপদের আকাশ এতক্ষণ এত জ্যোৎস্না ঢালিতেছিল কে জানিত? দেবদারুর পত্রান্তরাল হইতে আকাশের আলোক ছক কাটিয়া দিয়াছে গোয়েন্দা আপিসের প্রাঙ্গণের পথে, ঘাসে, গৃহপ্রাচীরের গায়ে। চৈত্রের হাওয়া নব-পত্রে রোমাঞ্চিত বৃক্ষরাজির ডালে ডালে মাতলামি করিতেছে। আর ইহারই মধ্যে বসন্তের কোকিলও ডাকিতেছে—এই গোয়েন্দা অপিসের ছায়াঘন গাছের শাখায়।…—সত্যই পৃথিবী পরমা সুন্দরী? কে না বলিবে—The poetry of earth is never dead.

ব্ল্যাক মেরিয়া আহ্বান করিতেছে? চলো অমিত, চলো।

কেমন একটা আনন্দ ও বেদনায় অমিতের মন দুলিয়া উঠিল:—এ দেশের মানুষও জীবনকে আজ স্বীকার করিতে জানে।…এদেশের মেয়েও বুঝি শুধু ট্রাজিডির শিকার নয়। অভিনন্দন করি, অভিনন্দন করি তোমাকে, মঞ্জু! তুমি 'মস্তিষ্ক-বিহীনা চপলা বালিকা' তুমি—'সীরিয়াস' নও সবিতার মতো? হয়তো তাই পৃথিবীতে তোমরা হালকা চরণে চলিতে

শিখিয়াছ, আর হয়তো স্বচ্ছন্দ হাতে গ্রহণ করিতে শিখিয়াছ জীবনের পরম দান—জন্ম, মৃত্যু, প্রেম।···আর ইতিহাসের চরম দায়িত্ব—বিপ্লব। তাই বলিয়া কে বলিবে তোমরা অসার? গম্ভীর না হইলেই কি মানুষ গভীর হয় না? জীবন এমন কি দুর্বহ, বিপ্লব এমন কি দুঃসহ, প্রেম এমন কি দুর্ভার—তোমরা হালকা হাসিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না?··· মস্তিষ্ক-বিহীনা, দায়িত্ব-বিহীনা, চপলা, মঞ্জু; তুমিও বুঝি নতুন নারী এ দেশের,—পার্বতীর মতো, নারায়ণীর মায়ের মতো, সুজাতার মতো,—আর হয়তো বা দায়িত্বময়ী, কর্তব্যময়ী অনুর মতোও।···

অমিতের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল হয়তো অনুর সঙ্গে তাহার আর দেখা হইবে না।···কঠোর গোপনতায় অনুর দিন যাইবে···তাহার যাত্রা গভীরতর বাধা-বিঘ্নের পথে। মঞ্জুর মতো হাস্যময়ী নয় অনু, সে মমতাময়ী কিন্তু কর্তব্যময়ী। মাতৃহীন গৃহে সে সহজ চিত্তে গুরু দায়িত্ব লইয়াছে, মনুকে দিয়াছে স্নেহ, বার্ধক্যগ্রস্ত পিতাকে সেবা করিয়াছে তৃপ্ত অন্তরে; আপন শক্তিতে ইন্দ্রাণীর মতোই সে আপনাকে গঠন করিয়াছে, সুস্থির বুদ্ধি দিয়া আপনার পথ নির্বাচন করিয়াছে; আপন দায়িত্বে গ্রহণ করিয়াছে জীবনের সঙ্গীকে। দুইজনে তাহারা স্থির পদে আগাইয়া চলিয়াছে এই কঠিন পথে—বাহুল্য নাই, চাপল্যও নাই। অনু হয়তো পিতৃ-স্বভাব পাইয়াছে, পাইয়াছে সেই ব্যক্তিত্ব।···তবু কত বড় রূপান্তর—ভাবো, অমিত,—কত বড় রূপান্তর সুর থেকে মঞ্জু; সেই সবিতা থেকে এই সবিতা, তোমার পিতা থেকে মনু ও অনু,—আর তুমি! সেদিনের উদার মানবতাবোধ আজ উদ্বুদ্ধ সৃষ্টিময় মানবতাবাদে···কোথায় এখন তোমার 'সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস', কোথায় তোমার ঊনবিংশ শতকের বাঙালী জাগরণের বিশ্লেষণ, অতীত ভারতের ইতিহাসে জন-জীবনের অনুসন্ধান, অধ্যয়ন, গবেষণা, জ্ঞানতপস্যা?···

'কোথায় তোমার পরিচয়, অমিত?' জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। সে পরিচয় আর লেখায় ফুটিল না, কথায় ফুটিল না, ফুটিল না প্রেম-

মণ্ডিত গৃহ-রচনায়; ধ্যান-সুন্দর, প্রীতি-সুন্দর গোষ্ঠী-রচনায়; একান্তে বসিয়া আত্ম-রচনায়। মানুষের এই মহদভিযানের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াই তুমি সম্পূর্ণ। মানুষের এই মহাস্রোতে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াই পাইয়াছ কৌতুকে আনন্দে মানব-মহারসের আস্বাদন।

ইঞ্জিন স্টার্ট লইতেছে। সমবেত কণ্ঠে সবল ধ্বনির মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ শোনা যায় না…'মিলাবে মানব-জাত'।

অমিতের মনের পটে সারা দিনের মানুষের মুখচ্ছবি চমকিয়া উঠিতেছিল :

অমু আর মনু, মঞ্জু আর বিজয়, তপন আর বুলকন্; কানাই আর মোতাহের, সৈয়দ আলী আর মাস্টার সাহেব, সুবীর আর সুরেশ—তারপর, বাঙালী পার্বতী আর বিলাসপুরীয়া মংগলী…আবার অমু আর শ্যামল, এবং আরও যাহারা চলিয়াছে দুর্গম অন্ধকারে, ভবিষ্যতের মহাশিল্পী…কত বিচিত্র এই সহযাত্রী দল!…শ্রমিকের পথ, বুদ্ধিজীবীর পথ, কর্মজীবীর পথ; কবিতার পথ, বিজ্ঞানের পথ, স্বাধীনতার পথ, মানবতার পথ,—জীবনের পথ, সৃষ্টির পথ,—সকল যাত্রীর সকল পথ কোথায় চলিয়াছে আজ?—ইন্দ্রাণী না মানুক, অমিত সেই পথের শেষে দেখিতে পাইতেছে এ মুহূর্তে :

মিলিত মানব-জাত।

সকল পথ পৌঁছিয়াছে মানব-মহাতীর্থে।

এক-একটি মানুষের মধ্যে—প্রতিটি সাধারণ এই মানুষের মুখেও—আজ সেই বিচিত্র বিরাট ভাবী মানুষের মুখচ্ছবি—সৃষ্টির সুমহৎ স্বাক্ষর : Man the Maker।

এক-একটি দিনের মধ্যে—প্রতিটি এই সাধারণ দিনের মধ্যেও—রূপায়িত ইতিহাসের সেই আর একদিন—বিঘোষিত তাহার মহদাশ্বাস : "অয়মহং ভো!"

সমাপ্ত